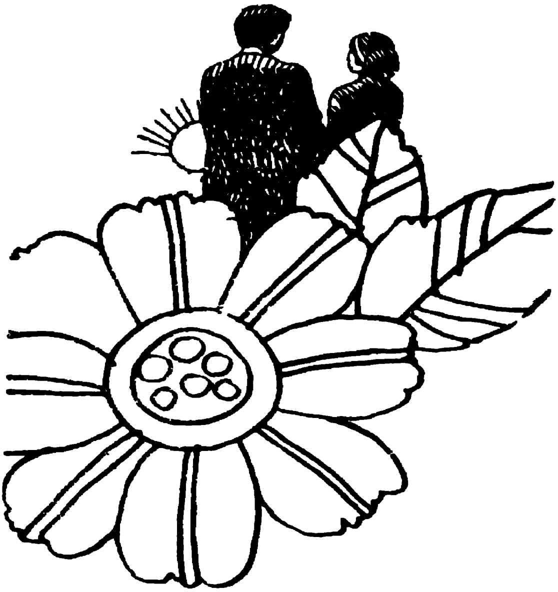


সুখ দুঃখের ছবি

দুলেন্দ্র ভৌমিক

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

□ প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৭১ / জুলাই ১৯৬৪

□ প্রকাশিকা : লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম

১০/২ এ, টেমার লেন কলকাতা-৭০০০০৯

□ মুদ্রাকর : নিমাই চন্দ্র ঘোষ। দি রঘুনাথ প্রিন্টার্স

৪ ১ ই বিডন রো, কলকাতা-৭০০০০৬

□ প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী

সবিনয় নিবেদন

আমার যে কটি লেখা এখন পর্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে তার অধিকাংশগুলিতেই আমি কোন ভূমিকা লিখিনি। কিন্তু এই গ্রন্থটির বেলায় কিঞ্চিৎ ভূমিকা লেখবার প্রয়োজন অনুভব করছি। এটি এক অর্থে একটি সংকলন মাত্র। আমার বিভিন্ন বয়সে এবং বিভিন্ন সময়ে লেখা নিয়ে এই বই। এখানে যেমন ছিয়াশি সালে লেখা গল্প আছে তেমনই ষাট দশকের শেষ ও সত্তর দশকের গোড়ার দিকে লেখা কিছু রচনাও রয়েছে। প্রথমে মনে হয়েছিল আগের লেখাগুলো আবার সংশোধন করে এবং আরও ঘষামাজা করে লিখে দেব। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, সেটা ঠিক নয়। তাহলে সব লেখাতেই কম-বেশি আজকের আমাকে পাওয়া যাবে। কম বয়সের কিছু লেখা থাকলে পাঠকদের বুঝতে সুবিধে হবে আমি কী ছিলাম এবং কী হয়েছি অথবা আদৌ কিছু হয়েছি কিনা। সময় এবং বয়সের সঙ্গে আমার লেখার মধ্যে কোন পরিবর্তন বা পরিণতি এসেছে কিনা সেটাও সম্ভবত জানা যাবে আমার আগের লেখাগুলি নতুন করে পরিমার্জনা না করার ফলে। এখানে 'ঘরের মানুষ' 'আততায়ী' এবং 'বেওয়ারিস' লেখা হয়েছে তিরাশি থেকে ছিয়াশি সালের মধ্যে আবার 'বধ্যভূমি' বহু আগের লেখা। 'দিব্যেন্দু দিনরাত্রি' আশির গোড়ার দিকের লেখা। যদিও 'বধ্যভূমি' লেখা হওয়ার পর ছাপার অক্ষরে প্রকাশের অপেক্ষায় পড়েছিল কয়েক বছর, মাঝখানে পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায় এবং দীর্ঘদিন বাদে সেটি উদ্ধার হয়। অর্থাৎ এখানের গল্পগুলির রচনাকাল আনুমানিক ষাট দশকের শেষভাগ থেকে তিরাশি পর্যন্ত। এইসব লেখায় আমার যোগ্যতা এবং ক্ষমতার পরিচয় আদৌ হয়তো নেই, কিন্তু অক্ষমতার পরিচয় যথেষ্টই আছে। অতএব, ভরসা শুধু সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের অনুরাগ।

এই লেখকের অন্যান্য বই

উলুখাগড়া

সওদা

নীলকণ্ঠ

ঠিকানা

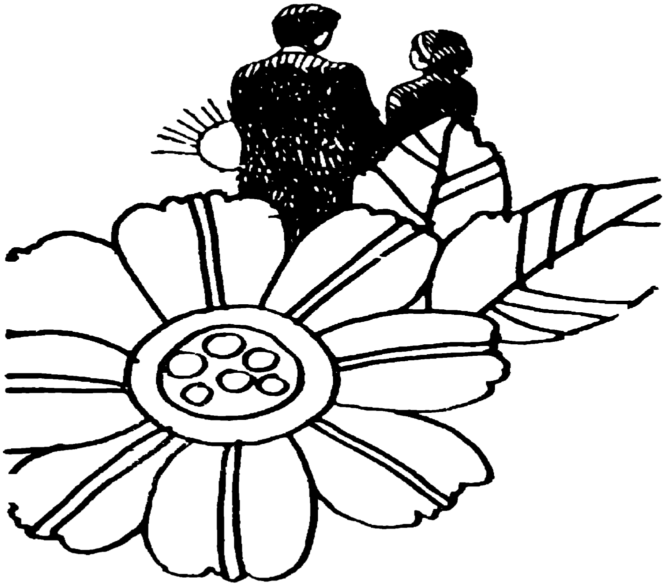
নিরাশ্রয়

দুই মেরু

আবিষ্কার

শ্রীযুক্ত দিব্যেন্দু পালিত

শ্রদ্ধাস্পদেষু



বড় গল্প

দিব্যেন্দু ভেবেছিল নতুন ফ্ল্যাটে এসে গুছিয়ে বসতে দিন সাতেক সময় লাগবে। সেই রকম ভেবেই অফিস থেকে আগাম এক হপ্তার ছুটিও নিয়ে রেখেছিল। পাঁচ বছরের ভাড়া বাড়ির আশ্রয় ছেড়ে নতুন ফ্ল্যাটে এসে, নতুন করে সংসার সাজানো খুব সহজ ব্যাপার নয়। সালকিয়া থেকে কাঁকুড়গাছি, দিব্যেন্দুর কাছে অনেকটা পথ। পাঁচ বছর আগে যেদিন চন্দননগর থেকে বাড়ি বদলে সালকিয়ায় এসেছিল সেদিন মনে হয়েছিল কলকাতা যেন নাকের ডগায়। গঙ্গা পেরুলেই ডালহৌসী। কিন্তু গত পাঁচ বছরে অন্তত কয়েকশো বার গঙ্গা পেরুতেই তার অফিসে দেরি হয়ে গেছে॥ মাঝ গঙ্গায় আটকে থেকেছে অসংখ্যবার। অনড় মিনিবাসের মধ্যে বসে গঙ্গা দেখতে দেখতে সে বার বার হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়েছে। ঘড়ির কাঁটা কখনও জ্যামে পড়ে না। চারপাশের অচলাবস্থার মধ্যে শুধু ঘড়ির কাঁটাটাই সচল। দিব্যেন্দুর মনে হতো প্রয়োজনের চাইতে বেশি দ্রুতগামী হয়ে কাঁটাটা এগিয়ে যাচ্ছে দশটার দিকে।

কাঁকুড়গাছির ঝকঝকে ফ্ল্যাটটা যেদিন প্রথম দেখল সেদিনই মনে মনে এই ভেবে স্বস্তি পেয়েছিল দিব্যেন্দু যাক, আর হাওড়া ব্রিজ পেরোবার ঝামেলা নেই। সালকিয়ার গুমোট সাঁসস্যাঁতে ঘরের বিচিত্র পরিবেশ থেকে এবার শান্তি। কিন্তু পাঁচ বছরের সংসার আর তার যাবতীয় উপকরণ টেনে এনে এই ফ্ল্যাটের কামরায় ঢোকানো বোধহয় দু' এক দিনের কাজ নয়। কিন্তু কাজে হাত পড়াতেই মালুম হল, ব্যাপারটা যতখানি ঝামেলা আর ঝঞ্ঝাটের মনে হয়েছিল আসলে ততখানি নয়। একখানা ফুল পাঞ্জাব লরি আর একটা ম্যাটাডোরেই সব এনে ফেলা গিয়েছিল। মাত্র দু দিনেই নতুন ফ্ল্যাটটা নিজের মতো করে সাজিয়ে ফেলেছিল রুমা। এই দুদিন শুধু হোটেলে খাওয়া। না খেলেও চলতো, রান্নার জন্য তোলা উনুন, গ্যাস, হিটার সবই ছিল কিন্তু রান্না করবার সময় ছিল না রুমার।

আসলে রান্নায় ওর একটা আলস্য আছে। সালকিয়াতে থাকতেও মাঝে মাঝে বলত, দোকান থেকে খাবার নিয়ে এসো। আজ রাঁধতে ভাল লাগছে না।

দিব্যেন্দু জানে দুবেলা রান্না করতে ভালবাসে না রুমা। দুপুরের ডাল,তরকারি রোজ রাত্রে গরম করে নিয়ে দিব্যেন্দুকে খেতে দেয়। বাসি রান্নায় দিব্যেন্দু কোন স্বাদ পায় না। ফ্রিজে রাখা দু দিনের মাংস কিংবা দেড়বেলার বাসি মাছের ঝোলে সে কোন তৃপ্তি খুঁজে পায় না। ব্যাপারটা রুমার অজানা নয়। রুমা জানে বলেই দিব্যেন্দু নিজে থেকে কিছু বলতে চায় নি। নিজের খাওয়া নিয়ে, শুধুমাত্র একটু ভাল স্বাদের জন্যে এসব প্রসঙ্গ তুলে রুমাকে বিব্রত করতে তার খারাপ লাগে। রুমার চোখ ভাল নয়। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই নাকি চোখে চশমা নিতে হয়েছে। বাপের বাড়িতে এই চোখের জন্যেই ওকে কখনও রান্না করতে দেওয়া হয় নি। আগুনের তাপে ওর মাথা ধরে, চোখ লাল হতে থাকে। দিব্যেন্দু একজন রান্নার লোকের কথাও ভেবেছিল। নিজের খাওয়া নিয়ে ওর কতকগুলো সংস্কার আছে। সে কারণেই পছন্দমতো লোক আজও জোটাতে পারে নি।

সালকিয়ার বাড়িতে পর পর দুজন লোককে জুটিয়েছিল রুমা। কিন্তু দিব্যেন্দুর পছন্দ হয়নি। প্রথমজন মহিলা। মহিলার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই দিব্যেন্দু বুঝে গিয়েছিল ওকে দিয়ে চলবে না। রুমা আহত গলায় বলেছিল, 'মুখ দেখেই নাকচ করলে যে বড়। ওকি ফিলমের হিরোইন হবে? মুখ দেখে রান্নার ভাল-মন্দ বোঝা যায়?'

দিব্যেন্দু প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করতে করতে জবাব দিয়েছিল, 'রান্নার নয়, মহিলার মুখ দেখে বোঝা গেল ও নিজেকে পরিষ্কার রাখতে শেখেনি।'

বড় বড় চোখ তুলে রুমা জিজ্ঞেস করেছিল 'তার মানে?'

সিগারেট ঠোঁটে তুলে দিব্যেন্দু বলেছিল, 'ওর দু চোখে পিচুটি,

বোধহয় ওটা মহিলার রোগ। ওর হাতের রান্না খেতে পারব না।'

পরের সপ্তাহেই রুমা এনে হাজির করেছিল এক রাঁধুনী বামুনকে। লোকটা নাকি বাজি ধরে বিয়ে বাড়িতে রাঁধতো। দিব্যেন্দু মিনিট পাঁচেক কথা বলার পর সেই বামুনকেও নাকচ করে দিয়েছিল। লোকটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার পর রুমা সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জানতে চেয়েছিল, 'এর দোষটা কোথায়? চোখে না কানে?'

দিব্যেন্দু নির্বিকারভাবে সোফায় হেলান দিয়ে বসে বলেছিল, 'কিছুই তো খুঁটিয়ে লক্ষ করো না তাই দেখতে পাও না।'

রুমা নিজেকে শান্ত রেখে ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল, 'তুমি কী দেখতে পেলে তাই তো জানতে চাইছি।'

দিব্যেন্দু আগের মতোই সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'লোকটার খুব পান খাওয়ার অভ্যাস। অবিরত পান খায় আর অনর্গল কথা বলে। কথা বললেই মুখ থেকে চিবুনো পান-সুপুরির দানা তুবড়ির মতো ছিটকে বেরোয়। রোজকার ডাল-তরকারিতে ওর উচ্ছিষ্ঠ আমি খেতে পারব না।

রান্নার লোক খোঁজার সেখানেই সাময়িক ইতি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বায়নাটা রুমা ছাড়েনি। নতুন ফ্ল্যাটে আসবার আগেও বলেছে। কিন্তু বললে কী হবে। দিব্যেন্দু রুমাকে বোঝাতে পারেনি, কলকাতায় ট্যাক্সি আর কাজের লোক পাওয়া কত দুর্লভ। এম. পি, এম. এল এ হবার জন্যে দেদার লোক পাওয়া যায় কিন্তু ঘরের কাজের জন্যে লোক জোটানো ভীষণ মুশকিল।

কিন্তু নতুন ফ্ল্যাটে এসে রুমা সব ভুলে গেল। সালকিয়ার দু'খানা ঘরের মধ্যে আশ্রয় ছিল কিন্তু স্বস্তি ছিল না। সে তুলনায় দোতলার ওপরে দক্ষিণখোলা বড় বড় দুখানা ঘরের এই ফ্ল্যাট যেন স্বর্গের সুখ ভরে রেখেছে। কাঁচের জানালায় চোখ রাখলে সামনের সবুজ পার্ক, টলটলে জলে-ভরা পুকুর, ওপাশে একটু দূরে রেল চলার ঝমঝম শব্দ আর দোতলার ব্যালকনি পর্যন্ত উঠে আসা কৃষ্ণচূড়া গাছ। যেন হাত

বাড়ালেই গাছের পাতার নরম স্পর্শ পাওয়া যায়। বিকেলে জানালা খুলে দিলে দামাল ছেলের মতো হুড়মুড় করে ছুটে আসে দক্ষিণের বাতাস। ঘরে পাখা চালাবার কোন দরকারই হয় না। জানালায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যের পর পার্কের পাশে পুকুরটাকে দেখে রুমা। পার্কের আলোতে পুকুরের ছোট ছোট ঢেউগুলো মাথায় আলো নিয়ে তিরতির করে নাচতে থাকে। রুমা কখনও কখনও ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে অনেকক্ষণ ধরে সেই ঢেউ দেখে। দক্ষিণের হাওয়া যখন মাতাল হয় তখন সেই হাওয়ায় আঁচল উড়িয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে দাঁড়ায়। ওর খোলা চুলে বাইরের আলো শিশিরের মতো লেগে থাকে। সোফায় বসে অবাক হয়ে দিব্যেন্দু রুমাকে দেখে। সালকিয়ার দুখানা গুমোট ঘরে রুমাকে কোনদিন এভাবে দেখবার সুযোগ পায়নি দিব্যেন্দু। ওর মনে হয়, তার নতুন ঘরে স্বর্গের সুখ ময়ূরের মতো আস্তে আস্তে পাখা মেলে ধরতে চাইছে। সুখের ছোঁয়া তাকে ভেতরে ভেতরে আচ্ছন্ন করে। এখানে আপাতত একটাই অসুবিধে রুমার। দোতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাট; যেটা ওদের দরজার মুখোমুখি সেটা এখনও ফাঁকা পড়ে আছে। গোটা দুপুর একটা থমথমে নির্জনতা আর শব্দহীনতা দোতলার ওপর থেমে থাকে। দিব্যেন্দু অফিস চলে যাবার পর রুমার ভয় করতে থাকে। দুপুরগুলো এখানে আসার পর একদম ভাল কাটছে না রুমার। সালকিয়াতে এ জিনিস ছিল না। ধানবাদে বাপের বাড়িতেও রুমাকে কোনদিন নির্জনতার এই চাপা কষ্ট সহ্য করতে হয়নি। দিব্যেন্দু রুমার কষ্ট বুঝতে পারে কিন্তু বউকে পাহারা দেবার জন্যে অফিস থেকে নতুন করে আবার ছুটি নিতে তার খারাপ লাগবে। সদ্য সদ্য প্রমোশন পেয়েই কাজের দায়িত্ব বেড়ে গেছে। সুখ সুবিধেও কিছু বেড়েছে। এখন ছুটি চাইতে তার মন সায় দেয় না। ভেতরে ভেতরে রুমার মতো দিব্যেন্দুও অপেক্ষা করে করে তিন নম্বর ফ্ল্যাটে লোক আসবে। কবে রুমার দুপুরগুলো ক্লান্তিকর বিষণ্ণ নির্জনতার হাত থেকে মুক্তি পাবে।

অবশেষে ঠিক এক মাসের মাথায় পাশের ফ্ল্যাটে লোক এসে গেল। অর্থাৎ দিব্যেন্দুর নতুন প্রতিবেশী দিব্যেন্দু গাড়ি থেকে নেমেই দেখতে পেয়েছিল দোতলার তিন নম্বর ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। জানালা খোলা। আলো জ্বলা আর জানালা খোলা দেখে অবশ্য তার নতুন কিছু মনে হয়নি। কেন না, গত হুদিন থেকে মালপত্র আসছিল। একটা লোক রাত্রে থাকতো সেই সব মালপত্র পাহারা দেবার জন্যে। লোক আসার কথাটা রুমা জানালো। দিব্যেন্দু জামা খুলতে খুলতে বলল, 'কখন এল?'

রুমা চাপা গলায় জবার দিল, 'এই ধরো বারোটা নাগাদ।'

দিব্যেন্দু জামাটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রেখে বলল, 'আলাপ হয়েছে?'

রুমা জানালার পর্দা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই। ওরাই যেচে এসে আলাপ করল।'

জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে দিব্যেন্দু বলল, ভদ্রলোক কী করেন, চাকরি?'

রুমা উল্টো দিকের চেয়ারে বসে পড়ে বলল, 'ভদ্রলোক কী বলছ, দেখলে তো একটা কলেজে পড়া ছোকরা মনে হয়। কী করেন তা জিজ্ঞেস করিনি। প্রথম আলাপেই ওসব জিজ্ঞেস করা যায় নাকি!'

মোজা খুলে জুতোর মধ্যে ঢুকিয়ে জুতো জোড়া আলমারির তলায় পা দিয়ে ঠেলে দিতে দিতে দিব্যেন্দু উঠে দাঁড়াল। রুমা মুখ তুলে দিব্যেন্দুকে দেখছিল। দিব্যেন্দু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কলেজে পড়া ছোকরা হলে কি সে ভদ্রলোক হতে পারে না?'

রুমা নিজের ভুলটা শুধরে নেবার জন্যে বলে উঠল, 'না, তা নয়, মানে "ভদ্রলোক" শব্দটা শুনলেই কেমন একটা বয়স্ক, ভারিক্কি-ভারিক্কি চেহারা বোঝায়, অনেকটা তোমার মতো। ইনি সে রকম নয়।'

দিব্যেন্দু তোয়ালে নিয়ে স্নানঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, 'ইনি তাহলে কী রকম?'

রুমা চেয়ারের গায়ে শরীর এলিয়ে দিয়ে জবাব দিল, 'ইনি খুব

ইয়াং আর হ্যাণ্ডসাম—যেন সভ্য পাস-টাস করে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন।'

স্নানঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কথাটা শুনল দিব্যেন্দু।

আস্তে করে দরজা বন্ধ করল। মুখে জল দেবার আগে আয়নায় নিজের মুখটাকে দেখল। নতুন করে কিছুই দেখার ছিল না তবু আয়নার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে।

নিজের ঘরে এসে জানালার সামনে দাঁড়াল। পাশের ফ্ল্যাট থেকে গোলাম আলীর গজলের সুর ভেসে আসছিল। গানের বাণীটা খুব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। বন্ধ দরজার ফাঁক গলে শুধু চেনা সুরটা থেকে থেকে ভেসে আসছে। রুমা চায়ের পেয়ালা নিয়ে এল। দিব্যেন্দু কিছু বলবার আগেই বলে উঠল, 'ওরা খুব গান ভালবাসে। অনেক রেকর্ড আর ক্যাসেট। মহিলাও গান-টান গান।'

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে দিব্যেন্দু হালকা গলায় বলল, 'তোমায় শোনাল বুঝি?'

রুমা নাক ফুলিয়ে বাগের ভঙ্গি করে বলল, 'এসেই আমাকে গান শোনাবার দায় পড়েছে বুঝি। তানপুরা আর হারমোনিয়ম দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখনই শুনলাম উনি গান করেন।'

চা শেষ করে পেয়ালাটা সামনে ঠেলে দিয়ে দিব্যেন্দু সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই দরজার বেল বেজে উঠল। এ-বাড়িতে আসার পর দিব্যেন্দু নিজে ছাড়া আর কেউ কখনও ওই বেল এখন পর্যন্ত ব্যবহার করেনি। রুমা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলছিল। দিব্যেন্দু সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে না ধরিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। দরজা খুলেই রুমা অভ্যর্থনা করার ভঙ্গিতে ডাকল, 'আসুন. আসুন, উনি এইমাত্র এলেন।'

দিব্যেন্দু মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে দেখল রুমা খুব একটা বাড়িয়ে বলেনি। দেখলে তিরিশ-বত্রিশ মনে হতে পারে এমনই চেহারা ভদ্রলোকের। সাদা প্যাণ্টের ওপর পাতলা খদ্দরের

পাঞ্জাবি। নিখুঁত করে দাড়ি কামানো। মাথার চুল এখনও চকচকে কালো। ভদ্রলোক হাসছিল। দিব্যেন্দু দেখল ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি। দিব্যেন্দু ভদ্রতাবশে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক হাত তুলে নমস্কার করতে করতে বলল, 'না, না, উঠছেন কেন, বসুন। আমি একটু আলাপ করতে এলাম। আপনার মিসেসের সঙ্গে আগেই আলাপ হয়ে গেছে। আমার নাম অঞ্জন সেন।'

দিব্যেন্দু সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে নিজের নাম বলল। অঞ্জন প্যাকেটটা ফিরিয়ে দিয়ে হাসল। দিব্যেন্দু বলল, 'আপনি খান না?'

অঞ্জন নিঃশব্দে হাসছিল। মুখের হাসি মিলিয়ে যেতে দিল না অঞ্জন। বলল, 'আগে খেতাম। বিয়ের পর একদম ছেড়ে দিয়েছি।'

রসিকতা করার ভঙ্গিতে দিব্যেন্দু বলল, 'আপনার মিসেস বুঝি পছন্দ করেন না?'

অঞ্জন আগের মতোই হাসতে হাসতে জবাব দিল, 'একদম না। ওর জন্যেই নেশাটা ছাড়তে হল। আমারও এই ব্র্যাণ্ড ছিল।'

দিব্যেন্দু মনে মনে হাসল। অঞ্জন সেন নামক যুবকটির জন্য তার করুণা হচ্ছিল। দিব্যেন্দু সিগারেট ধরাল। অঞ্জন হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে রুমাকে দেখল। রুমা দরজা খুলে দিয়ে সোফার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। দিব্যেন্দু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে প্রশ্ন করল, 'আপনি কি আমারই মতো চাকুরে নাকি…'

কথা শেষ হবার আগে অঞ্জন বলল, 'চাকরী একটা ছিল সেটা বছর তিনেক আগে ছেড়ে দিয়ে নিজে অফিস করেছি। আমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, নিজেই অডিট ফার্ম খুলে কয়েকটা পার্টি ধরে কোন রকম চালিয়ে যাচ্ছি।'

দিব্যেন্দু চোখ তুলে অঞ্জনকে আবার দেখল। অঞ্জনের ফ্ল্যাট থেকে গোলাম আলীর গজলের সুর আরও স্পষ্ট হয়ে ভেসে আসছিল

এ-ঘরে। দিব্যেন্দু ভেবে পাচ্ছিল না নতুন আলাপে আর কী কী ধরনের কথা হতে পারে। কিংবা আর কোন প্রশ্ন করে আলাপটাকে আরও খানিকক্ষণ জিইয়ে রাখা যায়। অঞ্জন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এখন আপনি বিশ্রাম করুন। পরে একদিন এসে আড্ডা মারা যাবে।'

যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে ছিল বলেই দিব্যেন্দুকেও দাঁড়াতে হল। অঞ্জন দরজা পেরিয়ে সামনের দরজা ঠেলে নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে যাবার আগে পেছন ফিরে ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল। রুমা দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, 'ওরা খুব মিশুকে। বউটিও খুব ভাল।'

দিব্যেন্দু জানালার বাইরে কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখ না সরিয়ে বলল, 'তোমার পক্ষে ভালই হল। আর একা-একা লাগবে না।'

পরদিন অফিস বেরুবার সময় সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে যাবার আগে তিন নম্বর ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজাটার দিকে দিব্যেন্দু তাকাল। এখনও নেমপ্লেট বসায়নি। এখানে দরজার গায়ে নেমপ্লেট বসানোটাই রেওয়াজ। হয়তো কাল-পরশু বসিয়ে ফেলবে। দিব্যেন্দু গাড়ির দরজা খোলবার আগে দোতালার ব্যালকনির দিকে তাকালো। রোজ যেমন তাকায়। ব্যালকনিতে রুমা দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিল। দিব্যেন্দু দরজা খুলে গাড়ির ভেতরে বসল। গাড়ির ভেতর থেকেও ব্যালকনিতে দাঁড়ানো রুমাকে দেখা যায়। গাড়িটা চলে যাওয়া পর্যন্ত রুমা অপেক্ষা করে থাকে। আজও ছিল। কিন্তু চোখ তুলে রুমাকে আরেকবার দেখতে যাওয়ার আগে তিন নম্বর ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে তার চোখ চলে গেল। ড্রাইভার ততক্ষণে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। শুধু এক লহমার জন্য তার চোখ হঠাৎ করে পিছলে চলে গিয়েছিল পাশের ব্যালকনিতে। ভাল করে দেখবার আগেই ব্যালকনিতে দাঁড়ানো মহিলার শরীরটা চোখের আড়াল হয়ে গেল। চোখে চশমা থাকলে মুখটা আরও স্পষ্ট করে

দেখে নেওয়া যেত। হঠাৎ এভাবে তাকিয়ে দেখাটা ওই মহিলা ভাল চোখে নাও নিতে পারে। ছোট খাটো তুচ্ছ এই ব্যাপারগুলো মাঝে মধ্যেই দিব্যেন্দুকে খুব বিব্রত করে। অফিসের কাজের মধ্যে ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটার ভাল-মন্দ নিয়ে দিব্যেন্দু ভেবে চলল।

রাত্রে খেতে বসে রুমা বলল, 'তোমায় একটা নতুন জিনিস খাওয়াবো! খেয়ে বলতে হবে কেমন হয়েছে।'

দিব্যেন্দু নানারকম জিনিস খেতে ভালবাসে; তবুও রুমার কথায় তার মধ্যে কোন উৎসাহ এল না। সে জানে বই দেখে হঠাৎ ভাল রাঁধতে গিয়ে নির্ঘাত ভয়ংকর কিছু তৈরি করে ফেলেছে। রুমার রান্নার হাত একেবারেই ভাল না। রুমা কাঁচের প্লেটে করে জিনিসটা টেবিলে আনল। দিব্যেন্দু মুখে দিয়েই অবাক চোখ তুলে রুমার দিকে তাকালো। রুমা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে মিটমিট করে হাসছিল। দিব্যেন্দু বলল, 'তুমি মোচার ঘণ্ট রাঁধতে পারো।'

রুমা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, 'কেমন হয়েছে?'

জবাব দিতে গিয়ে দিব্যেন্দুকে থামতে হল। জিভের স্বাদটা তাকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে আনমনা করে রাখল। রুমা আবার তাগাদা দিল। ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে যাবার আগে দিব্যেন্দু বলল, 'দারুণ!'

নিজের থালায় ভাত নিতে নিতে রুমা বলল, 'আজ তাহলে নিশ্চয়ই বেশি ভাত খাবে?'

দিব্যেন্দু রুমার দিকে তাকাল। ওর মুখে রহস্যের হাসি। ও যে এত ভাল রাঁধতে পারে সে কথা এর আগে দিব্যেন্দু কখনও বুঝতে পারেনি। দিব্যেন্দু খেতে খেতে বলল, 'তুমি এত ভাল রাঁধো, অথচ আমি ভাবতাম তুমি বুঝি…'

দিব্যেন্দুকে কথা শেষ করতে দিল না রুমা। হাসতে হাসতে বলল, 'আমি জীবনে কখনো মোচা রাঁধিনি। ও জিনিস কুটতেও পারি না। এটা পাশের ফ্ল্যাটের দিদি রেঁধে দিয়ে গেল।'

গলায় ভাত আটকে যাচ্ছিল দিব্যেন্দুর। অবাক চোখে রুমাকে দেখে নিয়ে কাঁচের প্লেটটার দিকে তাকাল। এবার খেতে গিয়ে সে ধরতে পারল এই স্বাদ অতুলনীয় সন্দেহ নেই, তবুও জিভের এই তৃপ্তি তাকে ভেতরে ভেতরে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে। নিজেকে সামলে নেবার তাগিদে দিব্যেন্দু বলল, 'প্লেটটা খালি ফেরত দিও না তুমি কিছু রেঁধে দিও। খালি দিতে নেই।'

রুমা অসহায় ভাব দেখিয়ে বলল, 'দূর ছাই, আমি কি রাঁধব আমার চেয়ে ঢের ভালো রাঁধেন উনি। ভাবছি ফ্রিজ থেকে আইসক্রীম বানিয়ে দেব।'

সকালে অফিস যাওয়ার সময় দিব্যেন্দু ভাত খায় না। রুমা টোস্ট আর ডিমের পোচ বানিয়ে দেয়। আজ খেতে বসে তাকে আবার অবাক হতে হল। রুমা খাবার টেবিলে রোজ তাকে চমকে দিচ্ছে। চিনে মাটির ডিশে ছোট-ছোট তিনটে উচ্ছে সেদ্ধ পাশে গোলমরিচের গুঁড়ো। দিব্যেন্দু আঙুল তুলে জিনিসটা দেখাল রুমা রুটি সাজিয়ে দিয়ে বলল, 'এখন থেকে রোজ খাবে। তাতে কখনও সুগার বাড়বে না।'

দিব্যেন্দু তীক্ষ্ণ চোখে রুমাকে দেখতে দেখতে বলল, 'আমার তো সুগার নেই।'

রুমা হিটারে পোচ তৈরি করছিল। মুখ না ঘুরিয়ে জবাব দিল, 'তোমার বংশের অনেকেরই তো ছিল! আগে থেকে সাবধান হতে দোষ কি?'

দিব্যেন্দু ফস করে বলে ফেলল, 'তেতো খেতে আমার ভাল লাগে না।'

রুমার যেন জবাবটা মুখস্থ করা ছিল, সেইভাবে এগিয়ে এসে বলল, 'তুমি আমার দিকে তাকিয়ে থাকো আমি তোমার মুখে টপাটপ পুরে দি, দেখবে রসগোল্লার মতো স্বাদ পাবে।'

বুকের মধ্যে রক্তের ঘূর্ণি পাক দিয়ে উঠল দিব্যেন্দুর। তার

শরীরের মধ্যে কোথাও যেন এই মুহূর্তে কিছু একটা ঘটে গেল। সেটা কী জিনিস সে জানে না। তলপেটের ভেতর থেকে একটা সিরসির অনুভব আর্তনাদের মতো গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দিব্যেন্দু দু'হাতের ওপর মাথা সঁপে দিয়ে চোখ বুজল। তার কানের পাশের চুড়ির শব্দ, পিঠের ওপর একটা হাতের স্পর্শ। ঘরের হাওয়া তার নাকে বয়ে নিয়ে এল চন্দনের গন্ধ। ধূপের ধোঁয়ার মতো সেই গন্ধ তার নাকের সামনে থেমে রইল কয়েক মুহূর্ত। অথচ চোখ না খুলেই দিব্যেন্দু বুঝতে পারল এই গন্ধ রুমার নয়। রুমা কখনও চন্দন সাবান মাখে না। এখনও ওর স্নান সারা হয়নি। ভিজে চুলের রাশি থেকে কোন শীতল সুবাস কিংবা ওর ঠাণ্ডা শরীর থেকে সাবানের গন্ধ আসার সময় এটা নয়। রাত্রে রুমা শোবার আগে বিদেশী পারফিউম ব্যবহার করে। ওর সারা শরীর থেকে, বুকের খাঁজ আর বগল থেকে সারারাত সেই সৌরভ বিছানাময় ছড়াতে থাকে।

দিব্যেন্দু চোখ তুলে তাকাল। পোচ তৈরি করে রুমা তাতে নুন ছিটিয়ে দিচ্ছে। ওর হাতে চুড়ির বাহুল্য নেই। ডান হাতে রুপোর বালা, বাঁ হাতে সোনায় মোড়া নোয়া। চুড়ির শব্দ ওর হাত থেকে শোনা যায় না। গাড়িতে ওঠবার আগে আজ ইচ্ছে করেই চোখ তুলে দোতালার পাশের ফ্ল্যাটে তাকিয়েছিল দিব্যেন্দু। আজও ভাল করে দেখবার আগে মহিলা সরে গেল ব্যালকনিতে শুকোতে দেওয়া শাড়ির আড়ালে। যেন ওই মহিলার জানা ছিল দিব্যেন্দু কখন ওপরে চোখ তুলে তাকাবে। দিব্যেন্দু গাড়িতে উঠতে একটু সময় নিল। রুমার দিক থেকে চোখ নামিয়ে আনার সময় ইচ্ছে করেই এবারও পাশের ব্যালকনিতে চোখ রেখেছিল। কিন্তু শাড়ির আড়াল ভেদ করে কিছুই দেখতে পেল না দিব্যেন্দু। অথচ আড়াল থেকে প্রতিদিন ওই মহিলা অর্থাৎ মিসেস সেন তার কৌতূহলকে বাড়িয়ে যাচ্ছিল। খাবার টেবিলে বসলে কৌতূহলটা যেন চাবুকের চেহারা নেয়। জিভের স্বাদ তার বুকের মধ্যে জ্বালা ধরাতে থাকে।

আজ খেতে বসে সেই কৌতূহল অদম্য চেহারা নিয়ে ফেলল। রুমা স্টিলের বাটি থেকে প্লেটে খাবার তুলছিল। প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দিদি পাঠিয়েছেন। ডালের বড়ি দিয়ে পাবদা মাছের ঝোল।'

দিব্যেন্দু অন্য খাবার সরিয়ে মাছের ঝোলটা টেনে নিল। ভাত মুখে তুলতেই জিভের স্বাদ তাকে আবার অন্যমনস্ক করে দিল। মনে পড়ল বহুদিন পরে সে এই জিনিস খাচ্ছে। পুরনো স্মৃতির মতো পুরনো স্বাদও বুঝি এক ধরনের বিষণ্ণতা দেয়। দিব্যেন্দু নিঃশব্দে খেয়ে উঠে গেল। খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে সামনের ছোট ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। তিন নম্বর ফ্ল্যাটে তখন ক্যাসেটে দেবব্রত বিশ্বাসের রবীন্দ্রসঙ্গীত বেজে যাচ্ছিল। বাইরের বিষণ্ণ আকাশের নিচে সেই সুর একটা মাতাল হাওয়ার মতো দিব্যেন্দুর চারপাশে পাক খেতে আরম্ভ করেছে। সেই সঙ্গে একটা অদম্য কৌতূহল। অথচ ব্যাপারটা রুমাকে বুঝিয়ে বলা যাবে না। পরস্ত্রী নিয়ে স্বামীর কৌতূহলকে কোন মেয়েই ভাল চোখে দেখে না, রুমাও দেখবে না। চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে রুমা ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। ট্রেনের শব্দে গানের সুর ততক্ষণে ঢাকা পড়ে গেছে। ওভারহেডের তারে চলমান ট্রেনের গতি আগুন ছিটকে দিচ্ছিল। অনেকটা উড়ন্ত হাউইয়ের ফুলকির মতো। দিব্যেন্দু সামনে তাকিয়ে ছিল। তার চোখে কোন দৃশ্যই স্পষ্ট করে ধরা পড়ছিল না। শুধু অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নিজেকে একটু একলা করে নিচ্ছিল। রুমার কথায় ঘুরে দাঁড়াতে হল।

রুমা চুলে চিরুনি গেঁথে নিয়ে বলল, 'কাল একটু সকাল-সকাল আসতে পারবে?'

দিব্যেন্দু ব্যালকনি থেকে ভেতরে এল। সোফায় বসে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে নিয়ে বলল, 'কেন?'

রুমা আবার চিরুনি চালাতে চালাতে বলল, 'কাল একটা নেমন্তন্ন আছে।'

দিব্যেন্দুর এবার অবাক হওয়ার পালা। নতুন জায়গায় হঠাৎ কে নেমন্তন্ন করবে। রুমার বাপের বাড়ি ধানবাদে। এক মেসো অবশ্য সল্ট লেকে থাকেন। সালকিয়া থাকতে মাত্র একবারই সেখানে গিয়েছিল। বহুদিন তাঁদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। দিব্যেন্দু সিগারেটটা ছাইদানিতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'কে আবার নেমন্তন্ন করল ?'

রুমা ফিতে দিয়ে চুলের গোড়া বাঁধছিল। দড়িটা শক্ত করে বেঁধে নিয়ে বলল, 'বেশি দূরে নয়, পাশের ফ্ল্যাটে।'

দিব্যেন্দু প্যাকেট থেকে আরেকটা সিগারেট বার করতে করতে বলল, 'উপলক্ষ্যটা কি ?'

রুমা চুলের বেণী করতে কবতে হাসল। হেসে নিয়ে বলল 'কাল ওঁদের বিবাহ বার্ষিকী। শুধু আমাদের বলেছে। আর নিচের ওরা।'

নতুন সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে দিব্যেন্দু সোফায় হেলান দিল। রুমা তাগাদা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'তাড়াতাড়ি আসবে তো ?'

দিব্যেন্দু একইভাবে বসে উত্তর দিল, 'নিশ্চয়ই। মহিলাকে দেখবার বড্ড কৌতূহল। কাল অন্তত দেখা যাবে।'

বুকের ওপর থেকে বেণীটা পিঠের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে রুমা বলল, ওঁর খুব লজ্জা। বাইরে বিশেষ বেরোন না। তুমি আসার আগে এ:ঘরে বসে গল্প করছিলেন। নিচে গাড়ির আওয়াজ হতেই ছুটে চলে গেলেন নিজের ঘরে।'

দিব্যেন্দু কৌতুকের সুরে বলল, 'মিসেস সেন বোধ হয় খুব সুন্দরী ?'

রুমা ভ্রূ তুলে প্রশ্ন করল, 'কিসে বুঝলে ? তুমি দেখেছো ?'

দিব্যেন্দু সোজা হয়ে বসল। পা দুটো সামনের টেবিলে তুলে দিয়ে বলল, 'এখনও দেখি নি। তবে জানি এরকম লজ্জা দু-ধরনের মেয়েদের থাকে। এক খুব সুন্দরী হলে আরেক খুব কুৎসিত হলে। উনি কোন দলে ?'

রুমা চোখ নাচিয়ে উত্তর দিল, 'কালই নিজে চোখে দেখে বলো।'

অথচ তিন নম্বর ফ্ল্যাটে এসে একবারের বেশি চোখ তুলে তাকাতে পারল না দিব্যেন্দু। নিজের চোখকেই তার শত্রু মনে হচ্ছিল। ঊর্মি শুধু এক ঝলক হেসে সামনে থেকে সরে গেছে। ওর হাসি আগুনের ফুলকির মতো দিব্যেন্দুর সারা শরীর ঘিরে জ্বলছে। দিব্যেন্দু চোখ সরিয়ে নিয়েও স্বস্তি পাচ্ছিল না। রুমার সঙ্গে ঊর্মি কী একটা কথা নিয়ে হাসাহাসি করছিল। দিব্যেন্দু ইচ্ছে করেই সেদিকে তাকাল না। ন' বছরে মেয়েরা অনেক বদলে যায়। ঊর্মি কি তাদের চাইতে আলাদা? ভিলাই থেকে ওরা কবে ফিরে এল কোলকাতায়? এলোই যদি তাহলে কলকাতার মতো এত বড় শহরে কাঁকুড়গাছি ছাড়া আর কোথাও ফ্ল্যাট কিনলো না কেন?

দিব্যেন্দুর মধ্যে অস্বস্তিটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে। এরকম অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম। নিজেকে সামলাবার, সহজ করে তোলবার কোন উপায় সে খুঁজে পাচ্ছে না। ঊর্মির মধ্যেও কি তার মতো কোন অস্বস্তি কাজ করে চলেছে? দিব্যেন্দু ঠিক বুঝতে পারল না। ঊর্মিকে মুহূর্তের জন্যেও আড়ষ্ট মনে হচ্ছে না। জীবনের অনেক মুহূর্তেই মেয়েদের সে চিনতে পারে না। ওদের চরিত্রে, আচরণে, ভালবাসায় একটা রহস্য থেকেই যায়। দিব্যেন্দু নিজেকে ব্যস্ত রাখার তাগিদে সিগারেট ধরালো। এ-সময় এখান থেকে চলে গিয়ে নিজের ঘরের ব্যালকনিতে দাঁড়ালে হয়তো ভাল লাগত। কিন্তু এখন এখান থেকে চলে যেতে হলেও একটা অজুহাত চাই। রুমা এবং ঊর্মি দুজনকে সেই অজুহাত বিশ্বাস করানো শক্ত। রুমা তার স্বামীকে জানে সাত বছর ধরে। ঊর্মির জানাটা বোধ হয় আরও গভীরে। সময়ের হিসেব ধরে সেটা মাপা যায় না। 'অনুভবের কোন বয়স নেই'—ঊর্মির কথাটাই মনে পড়ে যাচ্ছে দিব্যেন্দুর।

নিচের তলার দম্পতিরা এসে যেতেই ঘরটা ভরে উঠল। ওরা হাতে করে ফুলের বোকে এনেছে। রুমা বোধ হয় শাড়ি কিনেছে। এতগুলো মানুষের মধ্যে নিজেকে আড়াল করা সহজ। অঞ্জন ওদের

সঙ্গে ইংরেজি আর হিন্দিতে কথা বলতে ব্যস্ত। মেয়েরা পাশের ঘরে। দিব্যেন্দু আস্তে আস্তে সরে এল। পর্দা সরালেই নিজের দরজা দেখা যায়। কিন্তু চাবিটা রুমার কাছে। দিব্যেন্দু অগত্যা ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। আকাশে থিক থিক করছে তারার ফুল। কৃষ্ণপক্ষের আকাশে অন্ধকারের গাঢ় প্রলেপ। রেলপাড়ের দিক থেকে ছুটে আসছে ঠাণ্ডা বাতাস। অথচ আজকের বাতাসে কোন সুখ নেই। দূরের কোন রাস্তা দিয়ে দমকলের ঘণ্টা বাজিয়ে গাড়ি ছুটে গেল। সেই চলমান ঘণ্টাধ্বনি মিলিয়ে যেতেই দিব্যেন্দুর মনে হল শব্দটা বুঝি তার বুকের মধ্যে উঠে এসেছে। হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটা শব্দ ক্রমাগত বেজে যাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে ক্লান্ত আর বিষন্ন বোধ করছিল দিব্যেন্দু। ঊর্মিকে শুধু একবারই দেখেছে। ন'বছর কয়েক মাস পরে মাত্র একবার এক ঝলকের দেখা। দিব্যেন্দু বুঝতে পারে, তার মন সহস্র চক্ষু হয়ে এখন শুধু ঊর্মিকেই দেখতে চাইছে। অথচ পারছে না। নিজেকে ঊর্মির মতো সহজ করতে পারলে ঊর্মির মতো সেও হাসতে হাসতে হাত তুলে নমস্কার করে বলতে পারত, যেমন ঊর্মি বলেছে, 'আসুন, বসুন।' অতিথি আপ্যায়নের নিখুঁত ভঙ্গি। দিব্যেন্দু কথা বলতে পারেনি। একটা স্তম্ভিত বিস্ময় তাকে বোবা করে রেখেছিল। নিজেকে ঊর্মির মতো সহজ করে তোলা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যদি হতো তাহলে সেও বলতে পারতো, 'কেমন আছো?'

ঊর্মির কাছ থেকে এই তুচ্ছ, আর গতানুগতিক মামুলী প্রশ্নটার জবাব জানতে বড় সাধ হচ্ছে দিব্যেন্দুর। ব্যালকনির কোণের দিকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দিব্যেন্দু দাঁড়াল। এ জায়গায় আলো কম। অন্ধকারকেই এখন তার বন্ধু বলে মনে হচ্ছে। হাতের সিগারেট শেষ হতেই দিব্যেন্দু আবার সিগারেট ধরাল। তার চোখ দূরের রাস্তার দিকে ছড়ানো। হাত থেকে একটা ছবির প্যাকেট আচমকা রাস্তায় পড়ে গেলে সমস্ত ছবিগুলো যেমন এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে যায়, হাওয়া লেগে একটু একটু উড়ন্তে

থাকে তেমনই দিব্যেন্দুর ভেতরেও কয়েকটা ছবি এলোমেলো হয়ে উড়ছিল। এক-একটা ছবি যেন জীবনের এক-একটা মুহূর্তের সংবাদ। দিব্যেন্দু টের পেল ঘরের মধ্যে জোর আড্ডা জমেছে। বোধ হয় কেউ রেকর্ড প্লেয়ার চালিয়ে দিল। শব্দ সহ্য হচ্ছিল না দিব্যেন্দুর। নিজেকে একলা রাখার চেষ্টাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। বিরক্ত চোখে ঘরের দিকে মুখ ফেরাতেই সে আবার বোবা হয়ে গেল। তার এক হাত দূরত্বে উর্মি দাঁড়িয়ে। মুখে খানিক আগের সেই হাসি নেই। অতিথি আপ্যায়নের সেই নিখুঁত ভঙ্গিটিও অদৃশ্য। উর্মি আরও এক পা এগোল। গা সিরসির করা কষ্ট দিব্যেন্দুর। উর্মি চাপা গলায় ডাকল, 'বাইরে কেন। ভেতরে এসো।'

দিব্যেন্দু চোখ তুললো, চোখ তুলে উর্মির মুখের দিকে তাকাতে সঙ্কোচ বোধ করছিল। মনের এই অবস্থাটাকে কী বলে তা দিব্যেন্দু জানে না। উর্মি আঙুল দিয়ে দিব্যেন্দুর কব্জির কাছে স্পর্শ করল। বলল, 'চলো, এখন খেতে দেব।'

দিব্যেন্দু সিগারেট নিবিয়ে ফেলে বলল, 'আমার খিদে পাচ্ছে না।'

উর্মি নিঃশব্দে হাসল, ঠিক আগের মতো। হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, 'মিথ্যে কথা। বল, খেতে ইচ্ছে করছে না।'

দিব্যেন্দু উর্মির মুখের ওপর চোখ রাখল। সূচের মতো তীক্ষ্ণ চোখে উর্মি এখন তাকে বিদ্ধ করছে। ঠোঁটের ওপর একটু হাসি জাগল উর্মির। বলল, 'ন' বছরে অনেক বুড়িয়ে গেছ।'

দিব্যেন্দু হাসল না। উর্মির ঠোঁটের হাসিটুকু দেখতে দেখতে বলল, 'তুমি তো বুড়িয়ে যাওনি।'

উর্মি ওর বিশাল খোঁপায় গোঁজা ফুলের মালাটা আলতো হাতে ঠিক করে নিয়ে বলল, 'অঞ্জন আমায় বুড়িয়ে যেতে দেয় নি।'

উর্মি চলে যাবার আগে পেছন ফিরে তাকাল। ওর আশ্চর্য চোখে সেই আগের মতো ইশারা। ইশারায় ঘরের ভেতরে ডাকল

দিব্যেন্দুকে। ঘরে এসেই দিব্যেন্দু দেখল ঊর্মি আবার নিজেকে বদলে ফেলেছে। অন্য অতিথিদের চাইতে দিব্যেন্দুকে আলাদা করে দেখছে না। কোন সঙ্গত কারণ ছিল না, তবু দিব্যেন্দুর সারা শরীর আর মন জুড়ে একটা কষ্ট উত্তাল হতে থাকল।

বিছানায় এসেও শান্তি খুঁজে পাচ্ছিল না সে। দু'চোখের পাতায় কোন ঘুম ছিল না, ভেতরের ক্লান্তিটাকে সে জানে, ভাল করে চেনে। এই ক্লান্তি তার চোখে ঘুম না এনে বরং বিনিদ্র রাখবে। দিব্যেন্দু বালিশে মুখ গুঁজে দু' চোখ অন্ধকার করল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। পাশ ফিরে শুয়ে হাতের পাতা দিয়ে চোখ ঢেকে রাখল। বিছানায় সেই গন্ধটা ভেসে আসছে। ন' বছর পর যে গন্ধটা আজই সন্ধ্যায় ব্যালকনিতে পাওয়া গেছে। মন কেমন করা বিষণ্ণ এবং নিষ্ঠুর সেই গন্ধ তার মশারির মধ্যে কেমন করে চলে এলো! বিপন্ন বিস্ময়ে চোখ খুলে দিব্যেন্দু দেখল রুমা তার শরীর থেকে নাইটি খুলে ফেলছে। খোঁপায় ফুলের মালা। সেই মালা খোঁপা থেকে ঝুলে আছে রুমার কাঁধ পর্যন্ত। রুমা কি জুঁই ছাড়া অন্য কোন ফুলের মালা খোঁপায় জড়াতে পারল না? দিব্যেন্দুর মুখের ওপর রুমার শরীর ঝুঁকে আসছিল। দিব্যেন্দুর বুকের ওপর জুঁইয়ের পাপড়ি খসে খসে পড়ছে। জুঁইয়ের মাতাল গন্ধ সেই সঙ্গে রুমার বুক, গলা আর বগল থেকে উঠে আসা ন' বছর আগের মুন ড্রপ-এর গন্ধ দিব্যেন্দুর চেতনার ওপর আততায়ীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। রুমার মুখটা দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে ক্লান্ত গলায় দিব্যেন্দু জিজ্ঞেস করল, 'আজ গায়ে কী মেখেছো?'

রুমা কানের কাছে মুখ। নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'আমি মাখিনি, ঊর্মিদি মাখিয়ে দিয়েছে।'

অন্ধকার বিছানা জুড়ে একটা চেনা গন্ধ থইথই করছিল। দিব্যেন্দু হাত বাড়িয়ে রুমার শরীর স্পর্শ করতে গিয়ে টের পেল তার চেতনার ভেতরে যে কষ্টটা সন্ধ্যের পর থেকে লুকিয়ে ছিল এখন সেটা সারা শরীরে নদীর ঢেউয়ের মতো গড়িয়ে যাচ্ছে।

অন্ধকারে রুমাকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু অনুভব করা যাচ্ছে দিব্যেন্দুর বুকের কাছে কেউ একজন আছে। তার নিঃশ্বাস দিব্যেন্দুর বুকে লাগছে। দিব্যেন্দু হাত বাড়িয়ে রুমাকে আরও কাছে টানল চেনা গন্ধটা হঠাৎ তীব্র হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দিব্যেন্দুর নাকে। যেন এক ঝাঁক বোলতার হুলের মতো। অথচ এই গন্ধের মধ্যে দিয়ে এখন, এই মুহূর্তে উর্মিকে পাওয়া যাচ্ছে না—হয়তো বাকী জীবনে আর কখনও পাওয়া যাবে না। দিব্যেন্দুর হাত শিথিল হয়ে এল। নিজেকে সরিয়ে নিতে নিতে টের পেল অন্ধকারেও রুমার নিঃশ্বাস ঝড়ের মতো ফুঁসছে।

সপ্তাহ গড়াবার আগেই দিব্যেন্দু ভেতরে ভেতরে পাগল হয়ে উঠল। ন' বছর আগে যে সম্পর্ক কাগজে-কলমে শেষ হয়ে গেছে তাকে ফিরিয়ে আনার প্রশ্ন ওঠে না। অথচ দিব্যেন্দু বুঝতে পারে না, কেন কিসের তাগিদে উর্মি তাকে ক্রমাগত কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে। অফিস যাবার সময় উর্মি কেন ব্যালকনিতে দাঁড়ায়। কেন বার বার সন্ধ্যের পর সেই পুরনো গানের রেকর্ডগুলো একের পর এক বাজাতে থাকে, যেগুলো ন' বছর আগেই চন্দননগরের বাড়িতে শোনা হয়ে গিয়েছিল। অঞ্জনের বউ হবার পরও কি উর্মি মনে রেখেছে দিব্যেন্দু কী খেতে ভালবাসে, কেমন করে রাঁধলে বেশি ভাত খায়, কেমন করে চুল বাঁধলে খুশি হয়। শাড়ির কোন রঙ দিব্যেন্দুর বেশি পছন্দের—সেকথা কি তবে আজও ভোলেনি উর্মি? ওর সব রান্না, সব সাজ, সব গান আজও কি দিব্যেন্দুর জন্যে?

নিজের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। বেল টিপতে যাবার আগেই বুঝে গেল ঘরে রুমা নেই। দরজার বাইরে পেতলের তালা ঝুলছে। পাশের দরজার দিকে তাকাল দিব্যেন্দু। বেল টিপতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। হয়তো নিজের ঘরে উর্মি একা আছে। আজ অফিস থেকে অসময়ে চলে এসেছে দিব্যেন্দু। দু'টো বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ভাবল। নিচে নেমে যাওয়াই

ঠিক হবে বিবেচনা করে দিব্যেন্দু পা বাড়িয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ শব্দ করে তিন নম্বর ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গেল। দিব্যেন্দু দেখল খোলা দরজায় পর্দা ধরে ঊর্মি দাঁড়িয়ে। ওর চোখ স্থির এবং শান্ত। দিব্যেন্দু হাসবার চেষ্টা করল। নিজেই বুঝল সে হাসতে পারছে না। যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনই দাঁড়িয়ে থেকে প্রশ্ন করল 'রুমা নেই ?'

ঊর্মি একটু হাসল! বলল, 'রুমা মারকেটে গেছে তোমার জন্যে উল কিনতে।'

দিব্যেন্দু অবাক হল, 'এখন উল !'

ঊর্মি নরম গলায় বলল, 'ক্ষতি কি! এখন দামও সস্তা আর ধীরে সুস্থে করে ফেললে এই শীতেই পরতে পারবে।'

দিব্যেন্দু হাতের অ্যাটাচিটা নিচে নামাল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে বলল, 'এত তাড়া কিসের ?'

ঊর্মি দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল! বলল, 'একটু তাড়া আছে। আমি ওকে একটা নতুন ডিজাইন শেখাবো।'

দিব্যেন্দু সিগারেট ধরাল। কাঠিটা নিবিয়ে ছুঁড়ে দিল সিঁড়ির দিকে। ঊর্মির নরম কণ্ঠস্বরে একটু ঝাঁজ মিশল, 'বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবে, নাকি পরস্ত্রীর ঘরে আসতে সঙ্কোচ হচ্ছে।'

খোঁচাটা তীরের মতো লাগল দিব্যেন্দুর গায়ে। হাতের ব্যাগটা তুলে নিয়ে বলল, 'না ডাকলে ভেতরে যাই কেমন করে।'

ঊর্মির ঠোঁটে বাসী ফুলের মতো শুকনো হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। দরজা ছেড়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'ডাকবার অধিকার তো খুইয়ে বসে আছি।'

দিব্যেন্দু ঘরে এসে ডিভানে বসল। টি ভি'র ওপরে ঊর্মি আর অঞ্জনের ফটো। বোধ হয় বিয়ের পরে তোলা। দিব্যেন্দু আঙুল তুলে ফটোটা দেখিয়ে বলল, 'তোমাদের বিয়ের পর তোলা নিশ্চয়ই।'

উর্মি ফটোর দিকে না তাকিয়ে চোখ রাখল দিব্যেন্দুর মুখের ওপর। বলল, 'কী খাবে? চা না সরবত?'

দিব্যেন্দু উদাস গলায় জবাব দিল, 'যা খুশি। কিছু না খেলেও চলবে।'

উর্মি ভেতরের ঘরে গেল। ফিরে এল খানিক বাদেই। হাতে সরবতের গ্লাস। দিব্যেন্দু হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিয়ে চুমুক দিল। উর্মি জানালার পর্দা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার প্রথম বিয়ের ফটোটাও আছে, সেটাও কনের সাজ।'

দিব্যেন্দু বিষম খেতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল। বাঁ হাত দিয়ে ঠোঁটের কোন্ থেকে জল মুছে নিয়ে বলল, 'অঞ্জন দেখেছে সেই ছবি?'

উর্মি ভরাট গলায় জবাব দিল, 'দেখাবার দরকার মনে করিনি।'

দিব্যেন্দু ডিভানের ওপর সোজা হয়ে বসল। সরবতের গ্লাস তার হাতে ধরা। হাতের তালুতে ঠাণ্ডা স্পর্শ দিচ্ছে এই গ্লাসটা। দিব্যেন্দু গ্লাসটা তুলে নিজের কপালে ছোঁয়াল। ঠাণ্ডা স্পর্শটা আরাম দিচ্ছে তাকে। সে নিস্তেজ গলায় বলল, 'অঞ্জন আমার পুরো পরিচয় জানে?'

উর্মি ঘুরে দাঁড়াল। পাখার হাওয়ায় ওর খোলা চুল পিঠময় উড়ে উড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। উর্মির মুখে অদ্ভুত হাসি। উর্মি পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আমার পুরো পরিচয় রুমা জানে?'

সরবতের গ্লাস নামিয়ে রেখে দিব্যেন্দু বলল, 'ওকে ইচ্ছে করেই জানাইনি। জানালে আমাদের পাশাপাশি ফ্ল্যাটে বাস করা সুখের হবে না। তোমার নামটা শুনে রুমা হেসেছিল।'

উর্মি দিব্যেন্দুর মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

দিব্যেন্দু ডিভান ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ও জানে আমার আগের বউয়ের নাম উর্মি। শুধু নামটাই জানে।'

জানালার কাছে সরে যেতে যেতে উর্মি নরম গলায় বলল, ‘সেটাই তো স্বাভাবিক। তোমার মতো সাবধানী স্বামীরা অতীতের কোন স্মৃতিকেই চিহ্ন হিসেবে রাখতে চায় না। তুমিও নিশ্চয়ই রাখোনি।’

দিব্যেন্দু জবাব দিল না। উর্মির নরম গলার কথাগুলো তার কানে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। উর্মির মুখ তার দিকে ফেরানো। চোখ না তুললেও টের পাওয়া যায় উর্মির চোখ মাছির মতো তার মুখের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ অবস্থায় জবাব দেওয়ার দায়টা থেকেই যায়। অতএব, মুখ তুলে তাকাল দিব্যেন্দু। উর্মির চোখ বৃষ্টি ভেজা পদ্মের মতো। ওই চোখের দিকে তাকাতে ইচ্ছে হয় অথচ বেশিক্ষণ তাকাবার সাহস হয় না দিব্যেন্দুর। নিজের চোখকে সরিয়ে নেবার আগে বলল, ‘হয়তো রাখা যেত। কিন্তু রাখিনি, রাখতে পারিনি।’

উর্মি দিব্যেন্দুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ‘রাখতে চাওনি একথাটা বলতে আটকাচ্ছে কেন?’

দিব্যেন্দু উঠে দাঁড়িয়েছিল। এবার মেঝে থেকে অ্যাটাচিটা তুলে নিয়ে বলল, ‘এখন ওসব প্রশ্নোত্তরের কোন অর্থ হয় না। তোমার কিংবা আমার দু’জনের দায় এখন আলাদা। আমি রুমাকে কষ্ট দিতে চাই না।’

দিব্যেন্দু চলে যাচ্ছিল। উর্মি দরজার কাছে এগিয়ে এসে বলল, ‘তাহলে ন’ বছর আগে আমাকে কষ্ট দিয়েছিলে কেন? কেন ছেড়ে দিলে আমাকে?’

দিব্যেন্দু দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল। উর্মির চোখ এখন অপমানের ছোঁয়া পেয়ে কঠোর হয়েছে।

দিব্যেন্দু বলল, ‘আমরা এক সঙ্গে থাকতে পারিনি। হয়তো ভালবাসার অভাব ছিল, হয়তো পরস্পরকে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল, হয়তো আর এক সঙ্গে থাকা যাচ্ছিল না তাই দুজনে মিলে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তার দায় একা আমার ঘাড়ে ফেলতে

চাইছো কেন ?'

ঊর্মির গলা তীক্ষ্ণ হল। চোখের দৃষ্টি আরও খর করে বলল, 'সিদ্ধান্তটা তোমার। তুমি সেটা আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছ। আমি মেনে নিয়েছিলাম শুধু এই ভেবে যে, না মানলেও তুমি তোমার সিদ্ধান্ত বদলাবে না। তোমার অনুগ্রহে বেঁচে থাকাব চাইতে তোমাকে ছেড়ে আসা আমার কাছে সম্মানের মনে হয়েছিল।'

দিব্যেন্দু আর দাঁড়াতে পারছিল না। অথচ তার ভেতরে কিসের যেন অদৃশ্য টান সে অনুভব করছিল। বিচিত্র এক অলৌকিক ক্রিয়া তার মধ্যে কাজ করছে। ন' বছর পরে সে আজ হঠাৎ ধরতে পারল উর্মির সমস্ত চিহ্ন চোখের আড়াল করে ফেললেও ঊর্মিকে সে আড়ালে রাখতে পারেনি। তার নিয়তি আবার তাকে ঊর্মিব মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। দিব্যেন্দু হাতের ব্যাগ ডিভানে ছুঁড়ে দিয়ে ঊর্মির কাছে সরে এল। উর্মি দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। ওর ঠোঁট কাঁপছে। চোখেব দৃষ্টি ঘরের মধ্যে ছড়ানো। একটা আহত অভিমান গোধূলির মতো ম্লান এবং করুণ করে রেখেছে ঊর্মির মুখকে। দিব্যেন্দু গাঢ় গলায় ডাকল 'ঊর্মি।'

সেই ডাক ভেতরে ভেতরে কাঁপিয়ে দিল ঊর্মিকে। ঊর্মি চোখ তুলে বলল, 'বল।'

এবার চোখে চোখ রাখতে গিয়ে দিব্যেন্দুর বুকের মধ্যে সহসা ঝড় উঠল। তার মনে পড়ল ন' বছর ধরে অন্ধকার বিছানায়, খাবার টেবিলে, পূর্ণিমার রাতে, জীবনের সমস্ত আলো-অন্ধকারে, সুখে-অসুখে রুমার মধ্যে এই মুখটাকেই সে খুঁজে বেড়িয়েছে। ঠিক এই রকম একটা মুখের ছবি সে কিছুতেই নিজের ভেতর থেকে সরাতে পারেনি। দিব্যেন্দুর মধ্যে আস্তে আস্তে ফুলে ওঠা আবেগ তাকে মরিয়া করে তুলল। সে টের পেল তিরিশ বছর বয়সের কষ্ট আর অনুভবগুলো তাজা চেহারা নিয়ে তার মধ্যে ফিরে আসছে। সে ছুঁ

হাতে উর্মিকে ধরতে চাইল।

উর্মি যেন তৈরি হয়েই ছিল। নিজেকে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে বলল, 'আমিও অঞ্জনকে ঠকাতে চাই না। অঞ্জন আমাকে বিশ্বাস করে। আমি ডিভোর্সি জেনেও আমার প্রতি ওর ভালবাসা আজও একবিন্দু কমেনি। এমন কি তুমি এত কাছে আছো জেনেও।'

দিব্যেন্দুর শরীর মুহূর্তে অবশ হয়ে গেল। নিজেকে সরিয়ে আনতে আনতে উর্মির দিকে তাকাল। তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। ডিভান থেকে ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, 'অঞ্জন আমার পরিচয় জানে?'

উর্মি কোন উত্তর দিল না। দিব্যেন্দু বাঁ হাত দিয়ে দরজা খুলে ফেলল। বাইরে যেতে না পারলে তার শান্তি নেই। উর্মি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল, 'রুমা তো আমার পরিচয় জানে না, সুতরাং নির্ভয়ে তুমি আমার ঘরে থাকতে পারতে।'

দিব্যেন্দু সিঁড়ির দিকে চোখ রেখে বলল, 'অঞ্জন তো আসতে পারে। ভয়তো শুধু আমার একার নয়।'

উর্মি এবার শব্দ করে হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, 'অঞ্জনের হারাবার ভয় নেই, ও ভালবাসতে জানে।'

দিব্যেন্দু ঘুরে দাঁড়াল। ওর চোখ উর্মির মুখের ওপর। চাপা অহঙ্কারে ছেয়ে আছে উর্মির মুখ। নিজের বুকের মধ্যে অপমানের ধাক্কাটা টের পেয়েছে দিব্যেন্দু। তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল, 'কতটা ভালবাসতে জানে?'

উর্মির গলায় অহঙ্কার প্রবল হল। গর্বিত কণ্ঠে বলল, 'অন্তত তোমার চাইতে ঢের বেশি জানে। ও তোমার মতো অবিশ্বাসী নয়।'

দিব্যেন্দুর মধ্যে অপমানের জ্বালাটা নতুন করে জ্বলে উঠল। হাতের ব্যাগটা আবার ছুঁড়ে দিল ডিভানের ওপর। তার ভেতরে একটা আদিম আক্রোশ প্রবল হয়ে উঠতে চাইছে। বাঁ হাতে দরজা বন্ধ করে উর্মির দিকে এগোল। উর্মির চোখে কোন ভয় নেই। ওর

অহঙ্কারী মুখ যেন আরও বেশি গর্বিত দেখাচ্ছে। দিব্যেন্দু ওর দুই কাঁধে থাবা দিয়ে ধরে কাছে টানল। উর্মি বাধা দিল না। দিব্যেন্দু বলল, 'অঞ্জনের বিশ্বাস আর ভালবাসার গর্ব আমি এই মুহূর্তে যাচাই করে দেখতে চাই। তুমি আমায় আটকাতে পারবে না।'

উর্মি নিজের দুই হাতে দিব্যেন্দুর হাত সরিয়ে দিয়ে হাসল। ওর দুই চোখে বিদ্রুপ আর শ্লেষ ঝকঝক করছে। ডিভানের কাছে এসে বলল, 'এর বেশি কিছু বুঝি তোমার ভাবনায় এল না। তুমি আজ তস্করের মতো যা ছিনিয়ে নিতে চাইছো তাই তো একদিন অনায়াসে ফিরিয়ে দিয়ে সুখী হতে চেয়েছিল। যা জোর করে আদায় করছিলে তাতো রুমাও তোমাকে দিতে পারে।'

দিব্যেন্দু দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে উর্মিকে দেখল। ওর মুখের ওপর থেকে অহঙ্কারের পর্দাটা সরাতে পারছে না দিব্যেন্দু। বলতে পারছে না, সুখ নয়, শুধু এক বিন্দু শান্তি চাই উর্মি। শুধু বুঝতে চাই তুমি আমার চাইতে কতখানি সুখী। ন' বছর আগের সুখ আর আজকের সুখে কতটুকু ফারাক। শুধু একটিবার জানতে চাই, অন্ধকার বিছানায় অঞ্জনের বুকে মুখ রেখে তোমার কখনও দিব্যেন্দুকে মনে পড়ে কিনা।

দিব্যেন্দু সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে বুঝতে পারল যে-কথা আজ উর্মিকে বলা গেল না, সে-কথা হয়তো আর কোনদিনও ওকে বলা যাবে না। শুধু দিব্যেন্দু মনে মনে জানবে তার পাশের ফ্ল্যাটে এক নিষ্ঠুর ব্যাধ সব সময়ের জন্যে রুমার আড়ালে ওত পেতে আছে। সকালে, সন্ধ্যায়, স্বাদে, গন্ধে আর গানের মধ্যে দিয়ে তার অব্যর্থ শর নিক্ষেপ করে যাবে দিব্যেন্দুর ওপর। নির্বোধ নাবালিকা রুমা জানে না ওর উর্মিদি ওকে যা বোঝায়, যা শেখায়, খাবার টেবিলে আদর করে যে রান্না নিজে রেঁধে পাঠায় তাতে এক ধরনের জ্বালা থাকে। অফিস যাবার আগে রুমা ইদানীং পকেটে বেলফুল রেখে দেয়। বলে, 'অফিসে এই গন্ধ আমাকে মনে করাবে।' রুমাকে নয়, এই গন্ধ উর্মিকে মনে করায়। দিব্যেন্দুর মন এলোমেলো হয়ে যায়।

সে জানে না, বুঝতে পারে না, কেন, কিসের তাগিদে ঊর্মি বারবার তার স্মৃতিকে জ্বালিয়ে রাখতে চায়।

ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে রুমা বিছানার ওপর এল। ও আজ নাইটি পরেনি। ওর জন্মদিনে ঊর্মি ওকে সাজিয়ে দিয়েছে। রুমা কি একবারও আয়নায় নিজের মুখ দেখেনি! গাঢ় সবুজ রঙের বেনারসী, কপালের সবুজ টিপ আর খোঁপায় জড়িয়ে রাখা জুঁইয়ের মালা এই সাজ রুমার কবে থেকে পছন্দ? ওর শরীরের ভাঁজ থেকে উঠে আসছে ন' বছর আগের গন্ধ। ফিরিয়ে আনছে এক সুবাসিত স্মৃতি যা ধারালো অস্ত্রের মতো বিঁধে যাচ্ছে তার মগজে। দিব্যেন্দু আচ্ছন্নের মতো উঠল। তার পা টলছিল। সন্ধ্যের পর বীয়ার খেয়েছিল। সেই নেশা এখন ফিরে আসবার কথা নয়। তবু এলো। দিব্যেন্দু দেখল আধো অন্ধকারে একটা সবুজ দ্বীপের মতো রুমা দাঁড়িয়ে। ওর শরীর থেকে খসে পড়ছে বেনারসীর আঁচল। নিজেকে নিজেই উন্মুক্ত করছে রুমা।

সহসা কোমরের ওপর থেকে শাড়ি সরিয়ে রুমা এগিয়ে এল। আবছা অন্ধকারেও চকচক করে উঠল জিনিসটা। দিব্যেন্দু হাত বাড়িয়ে রুমার কোমরে জড়ানো জিনিসটা স্পর্শ করল। ভেতরে ভেতরে কাঁপছিল দিব্যেন্দু। এ জিনিস রুমা কোথায় পেল?

অন্ধকারে রুমার গাঢ় গলা দিব্যেন্দুর কানে গমগম করে বলল, 'নতুন বানালাম। তোমায় আগে বলিনি, হঠাৎ চমকে দিতে চেয়েছিলাম।'

দিব্যেন্দু হাত সরিয়ে নিল। তার হাত সিরসির করছিল। সাপের গায়ে হাত রাখার মতো অনুভূতি। এবার ছোবল তুলছে সেই সাপ। রুমা ওর চিবুকটা দিব্যেন্দুর বুকে চেপে ধরে বলল, 'ঊর্মিদি ডিজাইনটা পছন্দ করে দিয়েছে। ওরও ঠিক এই রকম একটা রুপোর কোমরবন্ধ আছে।'

ন' বছর আগের কষ্টটা আবার ফিরে আসছে। ছড়িয়ে যাচ্ছে

সারা শরীরে। রুমার দিকে চোখ রাখতে গিয়ে দিব্যেন্দু ধরতে পারছে, উর্মি তার ওপর প্রতিশোধ নেবার নতুন খেলা খুঁজে পেয়েছে। রুমা জানে না, বুঝতে পারে না. ওর সমস্ত শরীর ঘিরে এখন উর্মি।

দিব্যেন্দু অসহায়ভাবে চোখ বুঝল। নিজেকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে তার। অথচ এখন রুমা তাকে টানছে। ওর শরীরের আকষণ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অভ্যাসের নিত্যকর্মপদ্ধতির মতো রুমার খোলা বুকে মাথা রাখতে রাখতে দিব্যেন্দু আজ ভাবল, ভাগ্যিস কেউ কারো ভেতরটা দেখতে পায় না। যদি পেত, তাহলে নির্বোধ রুমাও দেখতে পেত এখন ওর বুকে মুখ গুঁজে দিয়ে জুঁই আর মুনড্রপের গন্ধের মধ্য দিয়ে আমি ওর কথা, ওর মুখ একবারও ভাবছি না। আমি খুঁজি অন্য একজনকে। ন' বছর আগে ঠিক এমনই অন্ধকার বিছানায় উর্মিকে বুকে রেখে যেমন উর্মি ছাড়া অন্য একজনকে খুঁজতাম।

আসলে ঠিক কাকে যে খুঁজি. খুঁজে যাচ্ছি সেটাই ধরতে পারি না। তাই আমার সব সুখ কেবলই অসুখ হয়ে যায়। আমার স্বপ্নে আর ধ্যানে কবে থেকে সেই নারী থেকে গেছে, দিনে দিনে লালিত হয়েছে জানি না। শুধু চোখ বুঝলে তাকে দেখতে পাই। কদাচিৎ কোন-কোন মুহূর্তে মনে হয় সে হয়তো কিছুটা রুমা হয়তো খানিকটা উর্মি। তবু সম্পূর্ণ করে তাকে উর্মি কিংবা রুমার মধ্যে কখনও খুঁজে পাইনি। কারো সঙ্গে মেলাতে পারিনি। আমার বুক জুড়ে, আমার স্বপ্নের সেই মায়াবী নারী হয়তো আমরণ থেকে যাবে। আমার সুখের ঘরে থেকে থেকে অগ্নিকাণ্ড ঘটাবে তবু তাকে উর্মির মতো বিচ্ছেদ করা যাবে না। রুমা আর উর্মিকে কখনও বলা যাবে না, সব মেয়েদেরই একটা করে সতীন থাকে তাদের স্বামীর বুকের মধ্যে, ভাবনা আর বাসনার গোপন ঘরে। দিব্যেন্দু তাকে দেখতে পায় বলেই নিজের কষ্টটা ধরতে পারে। উর্মি রুমার মধ্যে দিয়ে ফিরে আসতে চায় অথচ নিজের আসল শত্রুকে আজও ধরতে

পারে না। যেমন পারে না রুমা।

দিব্যেন্দু চোখ খুলে রুমাকে দেখতে চাইল। তৎক্ষণাৎ রুমার ঠোঁট নেমে এল ওর চোখের পাতায়। গাঢ় গলায় ফিসফিস করে বলল, 'কী ভাবছো?'

দিব্যেন্দু চোখ বুজিয়ে ফেলল। অন্ধকার চোখ জুড়ে সেই নারী, যে রুমা কিংবা উর্মি নয়। দিব্যেন্দু দু' চোখ বন্ধ করে বুকের মধ্যে তাকে খুঁজতে খুঁজতে জবাব দিল, 'তোমাকে।'

আততায়ী

বুকের মধ্যে ব্যথটা আবার অনুভব করল সুনীল। ঘুমের মধ্যে সেই ব্যথাটা ছিল কিনা সেটা বুঝতে পারেনি। হঠাৎ করে ঘুমটা ভেঙ্গে যাবার পর মনে হচ্ছে বাঁ দিকের বুকে সেই চিনচিনে যন্ত্রণাটা ক্রমশ বাড়ছে। সুনীল দোতলার খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। বাইরে শ্রাবণের ঘোলাটে আকাশ। অন্ধকারে ডুবে গেছে চাঁদের আলো। সুনীল আস্তে আস্তে উঠে বসল। ব্যথাটা বাড়ছে। এই ব্যথাটুকু নিয়ে নতুন করে কোন দুঃশ্চিন্তা হোলা না। পুরুলিয়ার জেলে থাকতেই মাঝে-মাঝে এই ব্যথাটা উঠতো। তখনও তার কোন দুঃশ্চিন্তা হয়নি। পুলিশ যাকে বেওয়ারিশ কুকুর-বেড়ালের মতো এক জেল থেকে আরেক জেলে ক্রমাগত চালান করছে, সামান্য অজুহাতে যাকে শাস্তি পেতে হয়েছে, প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যু যার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থেকে আবার উধাও হয়ে গেছে, সামান্য বুকের ব্যথা নিয়ে তার ভাবনা করার সময় থাকে না।

জেলের ভেতরে তার কোন কষ্ট হয়নি। তার জন্যে যখনই যে ব্যবস্থা হয়েছে সে তাই মেনে নিয়েছে। কষ্টটা আরম্ভ হয়েছে কিছু-দিন আগে। পুরুলিয়া থেকে আলিপুর জেলে আসবার পর মা একদিন দেখা করতে গিয়েছিল। মায়েদের চোখে-মুখে সব সময়ই এক ধরনের কষ্ট আর দুর্ভাবনা লেগে থাকে। সেদিনও ছিল। অথচ এমন হওয়ার কথা নয়। সুনীলের চাইতে তার মা আরও ভালোভাবে জানে জেল খাটা তাদের বংশে কোন নতুন ঘটনা নয়। সুখী মানুষরা যেমন মাঝে-মধ্যে পুরী, দার্জিলিং কিংবা নৈনিতাল বেড়াতে যায়, সুনীলদের পরিবারে কেউ কেউ তেমন বছরে একেবার করে জেলে যায়। এটা শুরু হয়েছিল ঠাকুর্দা আদিত্য চৌধুরীকে দিয়ে। গান্ধীজীর অহিংসা আন্দোলন তাঁর ধাতে সয়নি। তিনি যোগ দিয়েছিলেন

অনুশীলন সমিতিতে। তাঁর ধারণা ছিল গাল পেতে দিলে শাসকরা চড় মেরেই হাত গুটিয়ে নেয় না, গলাও টিপে ধরে। বাঁচবার জন্যই রক্তপাত দরকার। মৃত্যুকে ভয় করলে জীবনকে ভালবাসা যায় না। সেবার এক বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে আদিত্য চৌধুরীরা দল বেঁধে গিয়েছিলেন ট্রেজারীতে আগুন দিতে। সুনীল তখন জন্মায়নি। বাবা অনিল চৌধুরীর মুখ থেকে শুধু জেনেছিল, সে রাত্রে ট্রেজারীতে আগুন ধরিয়ে আদিত্য চৌধুরীর দল বায়ুবেগে ছুটে গিয়েছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাডসনের বাংলোয়। তখন সেখানে ইংরেজী ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে হাডসনেব মত্ত উৎসব। বাড়ির পেছনে ব্রহ্মপুত্র। আদিত্য চৌধুরীরা বোধহয় ভেবেছিলেন খান চারেক হাতবোমা ফেলেই ব্রিটিশরাজকে ভয় পাইযে দেওয়া যাবে। চারটে বোমার মধ্যে মাত্র দুটো ওঁরা ছুঁড়তে পেরেছিলেন। তারপরেই গোরা পল্টনদের পাল্টা আক্রমণ।

নদীর ঘাটে ডিঙ্গি রাখা ছিল। সেই ডিঙ্গি করে পালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ওপারে গিয়ে ভোর রাত্রে ধরা পড়ে গেলেন আদিত্য চৌধুরী আর তার দলবল। জেলা শহর থেকে অপরাধীদের চালান দেওয়া হল দমদম জেলে। জেলের মেয়াদ কাটিয়ে বেরিয়ে আসার পনেরো দিন পরে আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কাজে। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে আবার জেল। সেই জেল থেকে ফিরলেন অসুখ নিয়ে। প্রথমে জ্বর। তারপর রক্তবমিতে আদিত্য চৌধুরী মারা গেলেন। মরবার আগে বাবাকে নাকি বলে গিয়েছিলেন, ইংরেজ জাতিটা খুব সভ্য, শিক্ষিত। কিন্তু শাসক, আর সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে এসব শিক্ষা আর সভ্যতার কোন দাম নেই। দুনিয়ার সব শাসকদের একটাই চরিত্র—শোষণ করা। তুই এর বিরুদ্ধে লড়াই করিস।

আদিত্য চৌধুরীর পরামর্শেই কিনা কে জানে, স্বাধীনতার পর বাবা যোগ দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। তাঁর বিশ্বাস ছিল এই স্বাধীনতা শুধু ক্ষমতা বদলের স্বাধীনতা। ভারতবর্ষের মানুষের

সার্বভৌম স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় এটা তা নয়। ইংরেজ শাসনে একজন দরিদ্র শ্রমিক বা কৃষক যেভাবে জীবন কাটাতো এখনও ঠিক সেইভাবেই কাটায়। অনিল চৌধুরীর বিশ্বাস তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল বিপর্যয়ের মুখে। সরকারী চাকুরী খুইয়ে, স্কুল শিক্ষকের চাকুরীর সামান্য বেতন অবলম্বন করে তিনি যোগ দিয়ে ছিলেন তেভাগা আন্দোনে। স্বাধীন ভারতে আন্দোলন করার জন্য জেলে যেতে হয়েছিল অনিল চৌধুরীকে। তারপর খাদ্য আন্দোলনে আরেকবার। শেষবার জেলে গিয়েছিলেন বোধহয় আরেক খাদ্য আন্দোলনে। বারাসতে নুরুল ইসলাম মরেছে পুলিশের গুলিতে। সুনীলের দিব্যি মনে আছে সেসব কথা। মাঝরাত্রে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙাল পুলিশ। মা দরজা খুলে দিয়ে বললো, কাকে চাই?'

পুলিশ উত্তর দেবার আগেই বাবা বলেছিলেন, 'আমি তৈরি আছি। শুধু জামাটা পরে নিতে দিন।'

দুই চোখে আক্রোশ নিয়ে সুনীল দেখেছিল বাবার চলে যাবার দৃশ্যটি। বাবা যেতে গিয়ে তার দিকে একবার তাকিয়ে বলেছিলেন, 'খোকা, ভয় পাসনি। হয়তো তোকেও একদিন জেলে যেতে হবে। শাসকরা সব সময় নিরপেক্ষ জনতা পছন্দ করে। এই সমাজে নিরপেক্ষতা এক ধরনের ভণ্ড আত্মতুষ্টি। তোরা ছাত্র-আন্দোলন চালিয়ে যাস।'

মধ্যরাতের অন্ধকারকে ফালা-ফালা করে পুলিশ জিপের হেড লাইটের আলো জ্বলে উঠল। জীপ গাড়িটা নির্জন রাস্তা দিয়ে অনেকটা পথ সোজা গিয়ে বাঁয়ে বাক নিল। সুনীল নীলরঙের ব্যাপার গায়ে জড়িয়ে যতক্ষণ দেখা গেল পুলিশ জিপের পেছনের লাল আলোটা দেখল।

তাদের বাড়ির দরজায় সেই পুলিশ জিপ চলে যাবার পর অনেক কাল পরে আর আবার যখন এলো তখন অনিল চৌধুরীর জন্য নয়।

সুনীল বিছানার ওপর উঠে বসেছিল। এবার মশারির ভেতর

থেকে বেরিয়ে জানালার সামনে গেল। বাইরে রাত ফুরিয়ে আসছে বোধহয়। আকাশে মেঘ থাকায় ঠিক বোঝা গেল না। শুধু ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শে সে শুধু আরাম অনুভব করল। তার মনে হচ্ছিল ঘরের আলো জ্বেলে নিজেকে একবার ভালো করে দেখে। তার চোখে-মুখে কি এমন কিছু আছে যা দেখে তাকে ভীতিকর মনে হতে পারে। কাল সন্ধ্যেবেলা সে যখন বাড়িতে এলো তখন তার মুখের দিকে দিদি আর ওর ছোট ছেলে টুকাই অমন করে তাকিয়েছিল কেন? টুকাইকে হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল সুনীল। টুকাই ভয় পেয়ে মা'র পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। দিদি কোন কথা না বলে টুকাইকে নিয়ে নিঃশব্দে উঠে গেল।

বাবা শুধু চোখ তুলে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কখন রিলিজ করল?'

সুনীল ঘরের চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল, 'চারটে দশ-এ?'

মা বলল, 'খোকা চা খাবি না, সরবত করে দেব?'

সুনীল জামাটা খুলতে খুলতে জবাব দিল, 'পারলে একটু চা দাও। তার আগে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল।'

মা চলে যাবার পর সুনীল বাবাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পার্টি নিশ্চয়ই আমরা ধরা পড়াতে খুশি হয়েছে?'

অনিল চৌধুরী অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন, 'সে সব প্রসঙ্গ থাক। ও তর্ক তো আগেও অনেকবার হয়েছে। তুমি তোমার বিশ্বাসমতো চলতে চাইলে আমি বাধা দেব না।'

সুনীল জামাটা সোফার ওপর রেখে জুতোর ফিতে খুলতে লাগল। মা জলের গ্লাস নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সুনীল এক চুমুকে জলটুকু খেয়ে পরম তৃপ্তিতে 'আঃ' বলে গ্লাসটা মা'র হাতে ফিরিয়ে দিল।

মা সুধা চৌধুরী ছেলের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, তোদের খাওয়া-দাওয়া নিশ্চয়ই খুব খারাপ ছিল।'

সুনীল ম্লান হাসল। হাসতে হাসতে বলল, 'খারাপই তো

থাকবে। আমাদের তো ট্রিট্ করা হয়েছে অ্যান্টিসোস্যাল মানে সমাজবিরোধী হিসাবে।'

চশমার ভেতরে অনিল চৌধুরীর ছুই চোখ কুঁচকে গেল। সারা মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে বললেন, 'দিজ ইজ আনফেয়ার। তোমাদের রাজনৈতিক মত এবং পথের সঙ্গে আমার তফাত থাকতে পারে কিন্তু তোমরা তো রাজনৈতিক বন্দী, পলিটিক্যাল প্রিজনার। সরকার সেই স্বীকৃতিটুকু কেন দেবে না! বিদেশী সরকার যতবার বাবাকে ধরেছে ততবার রাজনৈতিক বন্দী হিসাবেই ট্রিট্ করেছে। বিধানবাবু আর প্রফুল্লবাবুর আমলে আমি যতবার জেলে গেছি রাজনৈতিক বন্দীর প্রাপ্য মর্যাদাটুকু আমি পেয়েছি। এরা সেটুকু দিচ্ছে না কেন? তোমরা কি চোর, ডাকাত না গুণ্ডা।'

সুনীল সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজল। সেইভাবেই জবাব দিল, 'ওদের বিচারে হয়তো তাই।'

বাবার চোখ-মুখে তখনও ঘৃণা আর বিরক্তি লেগেছিল। সুনীল সেই মুখের দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে পারল না। সে জানে এরকমটাই হয়। প্রথম যেদিন অ্যান্টিসোস্যাল হিসাবে তাকে 'সেলে' ঢোকানো হল সেদিনই সে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানিয়েছিল কিন্তু কোন ফল হয়নি। পুরুলিয়াতে তাকে রাখা হয়েছিল কুষ্ঠ রোগীদের সঙ্গে। তখন প্রতিবাদ করার ইচ্ছেও হয়নি তার। শুধু এক বুক আক্রোশ নিয়ে সে চারদিকে তাকিয়েছিল। তখনও তার বিশ্বাস ছিল জেলের মধ্যে তাকে যেখানে-যেভাবেই রাখা হোক না কেন জেলের বাইরে তার বন্ধুরা বোধহয় তখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আলিপুরে সে জানতে পারল বাইরে কোথাও কোন পরিবর্তন হয়নি। তার বন্ধুরা, যারা একসঙ্গে জঙ্গলে দিন-রাত্রি কাটিয়েছে তাদের মধ্যে ছুজনে মুচলেকা দিয়ে নিজেদের নিরাপদ রেখেছে।

খবরটা বিশ্বাস করার মতো নয়। সে বিশ্বাস করতে চায়নি। সে জানে, রাজনীতিতে এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে। কিউবাতেই

ঘটেছিল। শাসকদল বেতারে, সংবাদপত্রে একাধিকবার প্রচার করেছিল ফিদেল কাস্ত্রো ধরা পড়েছেন কিংবা মারা গেছেন। এ বড় পুরনো কায়দা। সুনীল এসব কথায় কান দেয়নি। এবার মনে হল কথাটা ভালভাবে যাচাই করা দরকার। ওদের সঙ্গে দেখা করাও জরুরী।

সুনীল চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সঞ্জয়, গোপাল ওদের খবর কি?'

বাবা উত্তর দিলেন না। মা বললেন, 'ওরা আর আসে না। ওরা দুজনে এখন রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে ঘর-সংসারে মন দিয়েছে।'

কথাটা সুনীলের বুকে ধাক্কা দিল। ঘর-সংসারে মন দিয়েছে কথাটার মানে কি? ওরা কি বিয়ে থা করে সংসার করছে? তা করুক, সংসারে মধ্যে থেকেও তো রাজনীতি করা যায়। সুনীল বাবার মুখের দিকে তাকাল। বাবা গম্ভীর হয়ে আছেন।

সুনীল জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওদের কোন খবর রাখ?'

বাবা স্থির চোখে সুনীলের মুখের দিকে একবার তাকালেন। পরে প্রায় স্বগতোক্তির মতো গলায় বললেন, 'তোমার বন্ধুদের খবর আমি জানি না। শুধু জানি ওরা জেলে যায়নি।'

বাইরে একটু একটু করে আলো ফুটছে। সুনীল জানালা থেকে সরে এলো। আজ একবার বন্ধুদের খোঁজে তাকে বেরুতে হবে। ওদের জানার কথা নয় যে জেল থেকে সুনীল ফিরে এসেছে। ওদের পাঁচজনের দলটা ছিল পঞ্চপাণ্ডবের মতো। পাঁচজনের মধ্যে দিব্যেন্দু ঘাটশিলার জঙ্গলে পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করতে গিয়ে আগেই মারা গিয়েছিল। গুলি লেগেছিল ডান কাঁধে। তখন আসন্ন সন্ধ্যার বিষণ্ণ ছায়া ঘাটশিলার জঙ্গলে নেমে আসছে। গুলি খেয়ে দিব্যেন্দু হঠাৎ ছিটকে উঠে গড়িয়ে গিয়েছিল কয়েক হাত। তারপর চাপা আর ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলেছিল, 'সুনীল, তুই ওদের নিয়ে পালা। আমি লড়ে যাচ্ছি। ধরা পড়লে সব ভেস্তে যাবে।'

দিব্যেন্দুকে অন্ধকার জঙ্গলে ফেলে রেখে ঝাড়ির মধ্য দিয়ে ওরা

পালিয়ে গিয়েছিল অনেক দূরে। দিব্যেন্দুর লাশ আর ফিরে পায়নি। পরে কাগজে দেখেছে পুলিশ সেই লাশ পাঠিয়ে দিয়েছিল কলকাতায়। বাকী চারজনের মধ্যে সুনীল ধরা পড়ল নিজের বাড়িতে। ধরা পড়ার আগে বোঝেনি, ধরা পড়ার পর বুঝেছিল, তাকে ধরিয়ে দেওয়া হল। দিবাকর, তার সব চাইতে বিশ্বস্ত বন্ধু, তাদের পঞ্চপাণ্ডবের একজন, তারই চক্রান্তে সুনীল ধরা পড়ে গেল।

সুনীলের বুকের মধ্যে আক্রোশ থমথম করতে থাকে। চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। কেন, কিসের লোভে দিবাকর এমন করল সেকথা সুনীল জানে না। সে শুধু জানে, বিশ্বাসঘাতকতার কোন ক্ষমা নেই। দিবাকরকে ক্ষমা করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তারও আগে বাকি দুজন, অর্থাৎ সঞ্জয় আর গোপালের হদিশটা নেওয়া দরকার। ওদের কাছ থেকে দিবাকরের বিশ্বাসঘাতকতার আরও কিছু খবর হয়তো পাওয়া যাবে। ওরা নিশ্চয়ই এতদিনে বদলা নিয়েছে। না নিয়ে থাকলে এবার সেই দায়িত্ব সুনীলের।

২

সঞ্জয়ের বাড়িতে গিয়ে বোঝা গেল এখন আর ওরা এখানে থাকে না। ভাড়াবাড়ি ছেড়ে দিয়ে সল্টলেকে ফ্ল্যাট কিনেছে সঞ্জয়। খবরটা বিশ্বাস করা শক্ত, অথচ অবিশ্বাসও করা যাচ্ছে না। এ বাড়ির নতুন ভাড়াটে বৌদি সল্টলেকের ঠিকানা দিতে পারল না। সুনীল বাসে চেপে বরানগর এলো। গোপালকে এখানে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। এটা ওদের ভাড়া বাড়ি নয়, পৈতৃক বাড়ি। প্রেসিডেন্সিতে পড়ার সময় ফি হপ্তায় একবার-দু'বার করে এবাড়িতে এসে আড্ডা দিয়ে গেছে। ওদের দোতলার ওপর একটা চিলেকোঠা আছে। সেই ঘরে বসলে গঙ্গা দেখা যেত। জানালা খুলে দিলে দামাল ছেলের মতো হুই-হুই করে ছুটে আসতো ঠাণ্ডা বাতাস। সুনীলের মনে আছে ওই চিলেকোঠায় বসেই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, না, এভাবে

চলবে না। সংসদীয় রাজনীতির হাঁড়িকাঠে গলা সঁপে দিলে আরেকটা শাসকগোষ্ঠীর জন্ম হয় কিন্তু দেশে বিপ্লব আসে না। বিপ্লব মানেই আমূল সংস্কার। আমূল সংস্কার ছাড়া এই দেশের মানুষদের মানুষের মতো বাঁচা সম্ভব হবে না। দেশের দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষরা নিজেদের অজ্ঞাতেই ক্রমে ক্রমে দাসে পরিণত হবে। জগৎজোড়া দরিদ্র মানুষ-দের দাসে পরিণত করার সমস্ত কৌশল আর চক্রান্ত এখানেও শুরু হয়ে যাবে। গোপালকে সেদিন দারুণ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। দিব্যেন্দু ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'উত্তেজনা দরকার কিন্তু সেটাকে শাসন করতে জানা চাই। শুধু উত্তেজনা আর আবেগ দিয়ে বিপ্লব হয় না। তার জন্য দরকার রাজনৈতিক শিক্ষা, সংযম, তার কর্মপদ্ধতির সঠিক পরিকল্পনা ও রূপায়ণ।'

এগুলো অর্জন করতে বছর তিনেক সময় পেয়েছিল ওরা। তারপরেই পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যেতে লাগল। যেন উত্তাল সময়ের স্রোতে ওরা ভেসে গেল। বাড়ি থেকে চলে যাবার আগের দিন মীরার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সুনীল। মীরার মুখ গম্ভীর, থমথমে এবং বিষণ্ণ।

সুনীল বলল, 'তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।'

মীরার থমথমে কণ্ঠস্বরে গভীর অভিমান জড়ানো ছিল। মীরা বলল, 'কোন দরকার ছিল না।'

সুনীল জানতো এরকমটাই ঘটবে। দিব্যেন্দু গতরাত্রে বাসে ওঠবার সময় ওকে বলেছিল, তবুও নর্থ বেঙ্গল যাবার আগে তোর নিজের একবার দেখা করা উচিত। আমার মনে হয় ও তোকে ভালবাসে। তোরও নিশ্চয়ই একটা অন্যরকম টান আছে।'

সুনীল তার অর্ধেক খাওয়া সিগারেটটা দিব্যেন্দুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এখন আর ঠিক বুঝতে পারি না। তুই মীরাকে জিজ্ঞেস করলেই পারতিস।'

দিব্যেন্দু সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'দূর পাগল। হাজার হোক আমি ওর দাদা। ওকে লজ্জায় ফেলে

লাভ কি।'

সুনীল কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মীরাকে দেখতে দেখতে দিব্যেন্দুর কথাগুলো ভাবল। এক পা এগিয়ে এসে বলল, 'তোমার হয়তো দরকার নেই, কিন্তু আমার আছে। তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই, শুনবে?'

মীরা কোন উত্তর না দিয়ে সুনীলের চোখের দিকে তাকালো। তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। সুনীল চোখ নামিয়ে নিতে নিতে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই দিব্যেন্দুর মুখে শুনেছো আমরা কী করতে চলেছি। আমাদের উদ্দেশ্যটা কী। এই কাজে আর দশজনের মতো ব্যক্তিগত আবেগ, অনুরাগ অথবা…'

মীরা হাত তুলে সুনীলকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'প্লিজ, বক্তৃতা শুনতে চাই না। ছোড়দার মুখে এত বেশি শুনেছি যে আর ভালো লাগবে না। তার চেয়ে আমি যা জিজ্ঞেস করি তার উত্তর দাও।'

সুনীল চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে উল্টো করে বসল। অর্থাৎ যে দিকটায় হেলান দেওয়ার কথা সেই দিকটা তার সামনে। দু'পাশে পা রেখে চেয়ারের পেছনের অংশ, এখন যেটা তার সামনে তার ওপর চিবুক রেখে অনুগত ছাত্রের মতো বলল, 'বল।'

মীরা তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল, 'তুমি এম-এ পরীক্ষা দেবে না ঠিক করেছ?'

সুনীল নির্বিকারভাবে উত্তর দিল, 'কোন লাভ নেই। ওতে আমার জ্ঞান বাড়বে না, চাকরী করার একটা সার্টিফিকেট বড় জোর পেতে পারি।'

মীরা একইভাবে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি জানো তোমার রেজাল্ট কত ভাল। তুমি পরীক্ষা দিলে ফার্স্ট ক্লাস পেতেই।'

সুনীল একইভাবে বলল, 'হয়তো পেতাম। কিন্তু তার চাইতে বেশি কিছু নয়। হয়তো বাবা কিংবা মামাদের সুপারিশে ভাল মাইনের একটা চাকরীও পেতাম। তারপর বিয়ে, হনিমুন, সন্তান উৎপাদন, পুজোয় বেড়ানো আর চাকরীতে উন্নতির চেষ্টা।'

মীরা এগিয়ে এসে স্নীলের হাত ধরল, 'তুমি এসব চাও না ?'

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে স্নীল বলল, 'না। এগুলোর কোন পজিটিভ অর্থ নেই আমার কাছে। জীবনের অন্য উদ্দেশ্য আছে। জীবন একটা নিরন্তর সংগ্রাম। আমরা চাই মানুষের—'

মীরা হাত তুলে স্নীলের মুখে চাপা দিল। মীরার চোখ ভিজে আসছে। স্নীল মীরাকে দেখছে অনেকদিন। কিন্তু এভাবে তার চোখের দিকে কখনও তাকায় নি। তার মনে হল মেয়েদের চোখে বুঝি এক ধরনের রহস্যময় মায়াবী কাজল লাগানো থাকে। হয়তো মীরারও আছে। মীরার চোখ তাকে টানছে—যেমন করে মধ্যরাতের সমুদ্র একাকী দাঁড়িয়ে থাকা মানুষকে টানে।

স্নীলের চোখে চোখ রেখে আর্দ্র গলায় মীরা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমাকে চাও না ?'

স্নীলের বুকের মধ্যে যেন ঢেউ ভেঙে পড়ল। সে এরকম কোন পরিস্থিতির কথা আদৌ ভাবেনি। মীরার চোখের দিকে তাকাতে তার কষ্ট হচ্ছিল। সে মুখের ওপর থেকে মীরার হাত নামিয়ে দিয়ে বলল, 'চাই, চাইতাম। কিন্তু এখন আর তার কোন মূল্য নেই। আমাকে চলে যেতে হবে অনিশ্চিত জীবনে। তোমাকে ভালবাসি বলেই তোমাকে আর নতুন করে কোন কষ্ট দিতে চাই না। তোমার জন্য অন্য জীবন অপেক্ষা করছে।'

মীরা মাথা নামিয়ে ফেলল। তার গলা ধরে এসেছে। সে ভেজা গলায় বলল, 'আমি কি তোমার জীবনে যেতে পারি না ?'

স্নীল নিজেকে ব্যস্ত রাখবার অছিলায় পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট খুঁজতে খুঁজতে বলল, 'তোমার দাদা দিব্যেন্দু এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।'

মীরার ভেজা চোখে মুহূর্তে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল। কঠোর চোখে স্নীলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আর তুমি ? তুমি কী পারবে ?'

স্নীল দরজায় পিঠ রেখে অস্ফুট উত্তর দিল 'আমি শুধু তোমাকে

মনে রাখব।'

সুনীল আর দাঁড়ায় নি। দরজা পেরোতে গিয়ে সে মীরার কান্নার আওয়াজ পেয়েছিল। কিন্তু পিছু ফিরে এখন মীরাকে দেখার যে কষ্ট সেটা নতুন করে আর পেতে চাইল না সুনীল।

৩

বরানগরে গোপালদের বাড়িটা এখন তিনতলা হয়েছে। সেই চিলেকোঠা আর নেই। তিনতলার ওপরে বোধহয় বাগান-টাগান করেছে। যদিও কোন মানে হয় না, তবুও ওই চিলেকোঠার জন্য সুনীলের দুঃখ হল। সুনীল দবজায় দাঁড়িয়ে বেল টিপল। দু'বার বেল বাজাবার পর দরজা খুলে গেল। একজন বৃদ্ধার ভাবলেশহীন নির্বিকার মুখ। মনে হয় ওদের বাড়ির কাজেব লোক। সুনীল আগে কখনও ওকে এ বাড়িতে দেখেছে বলে মনে হল না।

বৃদ্ধা প্রশ্ন করল, 'কাকে চাই?'

সুনীল একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দিল, 'গোপালবাবু আছেন? গোপাল মজুমদার?'

বৃদ্ধা কোন উত্তব না দিয়ে ভেতরে চলে গেল। সুনীল খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রায় মিনিট দুয়েক বাদে বৃদ্ধা ফিরে এসে বলল, 'আপনি ভেতরে বসুন। উনি আসছেন।'

সুনীল দরজা পেরিয়ে বসবার ঘরে এলো। সুখী মানুষদের বসবার ঘর যেমন সাজানো থাকে এই ঘরটাও তেমনি। সুনীল ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখতে দেখতে পুরনো দিনের কথাগুলো ভাবছিল। মিনিট দশেক পরে ঘরে এলো গোপাল। ঘরে ঢুকেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠে শুধু বলল, 'তুই?'

সুনীল চট্ করে জবাব দিল না। গোপালকে আপাদমস্তক

দেখতে দেখতে বলল, 'খুব অবাক হচ্ছিস! ভেবোছাল সারাটা জীবন জেলেই থাকবো, নয়তো মারা যাব।'

গোপাল ভেতরে ভেতরে বিব্রত বোধ করল! আমতা আমতা করে বলল, 'না, মানে, তোর বিরুদ্ধে, যাকগে, কবে এলি?'

সুনীল উত্তর দিল, 'কাল সন্ধ্যেবেলা।'

গোপালের পরনে সাফারী স্যুট। গালের দাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো। ওর গা থেকে পারফিউমের হালকা গন্ধ ভেসে এসে সুনীলের নাকে লাগছে। গোপাল বাঁ হাতে কব্জি তুলে ঘড়িতে সময় দেখল। সোনালী ব্যাণ্ডের দামি ঘড়ি ওর হাতে।

গোপাল জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবি?'

সুনীল উত্তর দিল, 'না। তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। তোর সময় হবে?'

গোপাল চেষ্টা করে মুখে হাসি আনল। তারপর বলল, 'আজ একটু ব্যস্ত আছি। মানে কাজের ঝামেলায়…'

সুনীল ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'তুই এখন কী কাজ করিস?'

গোপাল আবার ঘড়ি দেখে নিয়ে বলল 'ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা করছি। আজ একটু তাড়া আছে।'

সুনীল এবার উঠে দাঁড়াল। গোপালের দিকে এক পা এগিয়ে এসে বলল, 'সঞ্জয় কোথায় থাকে? ওর ঠিকানা কি?'

গোপাল ভীত চোখে সুনীলকে দেখতে দেখতে বলল, 'সঞ্জয় বড় চাকরী করছে। ওর মামার দৌলতে চাকরীটা পেয়েছে। মাসে হাজার তিনেক টাকা মাইনে প্লাস গাড়ি। বেশ আছে।'

সুনীল বিদ্রূপের দৃষ্টিতে গোপালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুইও তো বেশ আছিস।'

গোপাল টেবিলের ওপর থেকে অ্যাটাচিটা হাতে নিয়ে বলল, 'আমি এখন বেরুবো। তুই কোন দিকে যাবি?'

সুনীল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে উত্তর দিল, 'কেন, লিফট দিবি নাকি? তোর গাড়িও আছে নিশ্চয়ই।'

গোপাল যেন লজ্জা পাওয়ার মতো হাসল। হেসে বলল, 'তা একটা আছে। কাজকর্ম করতে গেলে নিজের গাড়ি না হলে কলকাতায় চলে না।'

গোপাল চলে যাবার জন্য পা বাড়াচ্ছিল। সুনীল ওর কাঁধে হাত রাখল। সুনীলের পাঁচ আঙুলের শক্ত থাবা এখন গোপালের কাঁধের ওপর। গোপাল দাঁড়িয়ে পড়ল। ঢোঁক গিলে বলল, 'ছাড়, কাঁধে লাগছে? জামাটা নষ্ট হবে।'

সুনীল ছাড়ল না। চাপা অথচ তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'কাঁধের এই খানটাতেই দিব্যেন্দুর গুলি লেগেছিল। দিব্যেন্দু জঙ্গলের মধ্যে একা-একা মরেছে। আজ এইটুকুতেই তোর লাগছে?'

নিজের কাঁধটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টায় হতাশ হয়ে গোপাল ক্ষুব্ধ গলায় বলল, 'সে সব কথা এখন আমি ভাবি না। আমাদের ভুল রাস্তায় নিয়ে গিয়েছিল দিব্যেন্দু। পাঁচটা রাইফেল দিয়ে বিপ্লব হয় না।'

সুনীল এক ঝটকায় গোপালকে ঘুরিয়ে দিয়ে মুখোমুখি হল। খরদৃষ্টিতে গোপালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বিপ্লব হয় না, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করা যায়। মুচলেকা দেওয়া যায়। বন্ধুকে বিপদে ফেলা যায়।'

গোপাল হাতের অ্যাটাচি নামিয়ে রেখে বলল, 'আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আমার ভালো লাগেনি তাই মুচলেকা দিয়ে সরে এসেছি। পুলিশের কাছে আমি তোর সম্পর্কে কোন কথা বলিনি। যা বলার সঞ্জয় বলেছে।'

সুনীল এমনভাবে হাসল যাতে গোপালের মনে হল তার সারা মুখে কেউ যেন ঘৃণার কুলকুচি ছিটিয়ে দিচ্ছে। অ্যাটাচি তুলে নিয়ে গোপাল গম্ভীর গলায় বলল, 'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন বেরুবো।'

গোপালের সঙ্গে সঙ্গে সুনীল বাইরে এলো। সাদারঙের একটা ফিয়াট ততক্ষণে ওদের বারান্দার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

গোপাল গাড়িতে ওঠবার আগে ওপরে তাকালো। দোতলার গ্রিলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে একজন যুবতী। বোধহয় গোপালের বউ। গোপাল হাত নাড়ল। সুনীল সেইদিকে তাকালো যেখানে একদা দোতলার চিলেকোঠাটা ছিল।

গাড়িতে বসে গোপাল বলল, 'ওপরের বারান্দায় যাকে দেখলি সে আমার বউ। ইচ্ছে করেই আলাপ করালাম না। ওর বাবা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের আই জি ছিলেন। গত বছর রিটায়ার করেছেন। আমার কাকার ক্লাসমেট। তোর সম্বন্ধে এত আজগুবি গল্প শুনেছে যে তোকে উর্মিলা হয়তো স্ট্যাণ্ড করতে পারতো না।'

সুনীল বাইরে তাকিয়ে ছিল। উদাস গলায় বলল, 'তোদের সেই চিলেকোঠাটা বোধহয় ভেঙ্গে ফেলেছিস।'

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে গোপাল বলল, 'হুঁ'।'

স্ট্র্যাণ্ড রোডে পাঁচতলার ওপর সঞ্জয়ের অফিস। কাঁচের দেয়ালদেয়া আলাদা ঘরে তিনরঙের তিনটি টেলিফোন নিয়ে সঞ্জয় বসে। টেবিলের ওপর ঠাণ্ডা পানীয়ের দুটো শূন্য বোতল। দরজা ঠেলে সুনীল যখন ঘরে ঢুকল সঞ্জয় তখন ইণ্টারকমে কারো সঙ্গে কথা বলছিল। সুনীলকে চোখের ভঙ্গিতে বসতে বলে সঞ্জয় কথা বলে যেতে লাগল।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে সঞ্জয় বলল, 'ওয়েলকাম সুনীল। একটু আগে গোপাল টেলিফোন করে জানিয়েছে তুই ছাড়া পেয়েছিস। ওর বাড়িতে গেছিস।'

সুনীল টেবিলের পেপারওয়েটটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'আর কিছু।' সঞ্জয় হাসল। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'তুই নাকি খুব রেগে আছিস আমাদের ওপর।' আমি ওকে বললাম, 'ওটা কিছু নয়। ফ্রাস্ট্রেশন থেকে একধরনের অ্যাংগার জন্মায়। একটা কাজকম্মে লেগে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সুনীল শান্তগলায় বলল, 'না, আমার কোন ফ্রাস্ট্রেশন নেই।' সঞ্জয় গলার টাইটা একটু ঢিলে করে বলল, 'এখন কী করবি ঠিক

করলি ? জেলের খাতায় নাম উঠেছে সরকারী চাকরী তো পাবি না, সে বয়সও নেই। ব্যবসা-ট্যবসা কর, গোপাল যেমন করছে।'

সুনীল পেপারওয়েটটা শব্দ করে কাঁচের টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'তার আগে কিছু হিসেব-নিকেশ দরকার।'

সঞ্জয়ের ভ্রূ কুঁচকে গেল। চোখ কুঁচকে সুনীলকে দেখতে দেখতে বলল, 'কিসের হিসেব-নিকেশ ?'

সুনীল দীপ্ত গলায় জবাব দিল, 'তোদের বেইমানির। তোরা আমাকে একলা ফেলে শহরে চলে গিয়েছিলি কিন্তু আর ফিরে আসিসনি। পুলিশের কাছে আমার সম্পর্কে খবর পাঠিয়েছিলি তোরা। মুচলেকা দিয়ে তোরা পেছন থেকে ছুরি মেরেছিস আমাকে আর আমাদের আন্দোলনকে।'

সঞ্জয় গম্ভীর হতে গিয়েও হাসবার চেষ্টা করল। হাসিটা তেমন ফুটল না। সুনীলের দিকে ডানহিল সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আমরা শহরে এসেছিলাম খাবার জোগাড় করতে। কিন্তু সেখানে এসে পুলিশের নজরে পড়ে যাই। আমাদের বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়। তোকে ভুল খবর দিয়ে বাড়িতে টেনে এনে ধরিয়ে দিয়েছে দিবাকর। সেখানে আমাদের কিছু করার ছিল না। আমরা কিছু জানতেও পারিনি।'

সুনীলের চোয়াল শক্ত হয়ে আসছে। সে চাপা গলায় প্রশ্ন করল, 'দিবাকর কোথায় ?'

সঞ্জয় দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'রাসকেলটা তুই ধরা পড়ার পর থেকে উধাও হয়ে গেছে। আমাদের কারো সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি। পুরনো বাড়িটাতে নেই। বোধহয় পালিয়ে বেড়াচ্ছে।'

সুনীল উঠে দাঁড়াল। সঞ্জয় বলল, 'এখন কোথায় যাবি ?'

সুনীল উত্তর দিল, 'ঠিক জানি না।'

সঞ্জয় চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোকে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট করব আমার আর গোপালের পক্ষ থেকে। তুই শুনবি ?'

সুনীল ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'রিকোয়েস্টটা কী ?'

সঞ্জয় একটু ইতস্তত করে বলল, 'তুই হুটহাট আর গোপালের বাড়িতে যাস না। তোর সম্পর্কে তো নানা কথা রটেছে। সবাই তোকে সহ্য করতে পারে না। তুই বরং একটা কাজ-কম্মের ধান্দা ছাখ।'

স্নীলের বাঁদিকের বুকে সেই ব্যথাটা আবার চিনচিন করে উঠল। জানালা দিয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থেকে সে উদাস গলায় বলল, 'আর কিছু ?'

সঞ্জয় বাঁ হাত দিয়ে দরজাটা খুলে ধরতে ধরতে বলল, 'তুই এই অফিসেও আসিস না। চাকরীটা অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে বাবা জোগাড় করে দিয়েছেন। আমি এটা খোয়াতে চাই না।'

দরজা দিয়ে চলে যেতে যেতে স্নীল বলল, 'মনে রাখার চেষ্টা করব।'

৪

কলকাতার বাতাসে গুমোট গরম। শ্রাবণ মাসের আর্দ্রতা দিনের রোদে খুঁজে পাওয়া যায় না। পথ হাঁটতে হাঁটতে স্নীল টের পায় এই জগৎ সংসারের, সমাজের এবং রাষ্ট্রের সর্বাত্মক সংস্কারসাধনে একদা সে যে ব্রত নিয়েছিল সে কথা মনে রাখার দায় কেউ অনুভব করেনি। ঘাটশিলার জঙ্গলে দিব্যেন্দুর রক্ত অনেককাল আগে শুকিয়ে গেছে কিংবা বৃষ্টি না হয় সুবর্ণরেখার জলে সেসব কবে ধুয়ে গেছে। তার রক্তাক্ত স্মৃতি শুধু স্নীলের মনে। সঞ্জয় কিংবা গোপাল কেউ সে সব মনে রাখেনি, রাখতে চায়নি। দিবাকর তাকে ধরিয়ে দিয়ে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে বেঁচেছে। হয়তো কোন মামা বা কাকাকে ধরে সেও বাঁধা মাইনের চাকুরী করে যাচ্ছে। ব্যাপারটা অবাক করে স্নীলকে। ওরা এত সহজে সব ভুলে যেতে পারল কেমন করে ? স্নীল বুঝতে পারে পুরনো বন্ধুরা কেউ আর অতীতের স্মৃতিকে মনে রাখতে চায় না। যেন দুঃস্বপ্নের

ঘোর কাটিয়ে ওরা উঠে এসেছে। ওরা বেঁচে থাকার অন্যতর অর্থ খুঁজে পেয়েছে।

গত সাতদিনে সে নিজেকে, নিজের চারপাশের জগৎকে নতুনভাবে আবিষ্কার করছে। আত্মীয়স্বজনরা কেউ ভুলেও সুনীলের প্রসঙ্গ তোলেন না। পুরানো বন্ধুরা তাকে এড়িয়ে চলছে। যেন নিজের জগৎ থেকে সে নিজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। প্রতিটি মুহূর্তে সে একা এবং নিঃসঙ্গ। তার জন্যে জীবনের সব দরজাই বন্ধ হয়ে আছে। গতকাল মৃত্যুঞ্জয়দার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সুনীল। বেলেঘাটার বস্তি অঞ্চলে এখনও মৃত্যুঞ্জয়দা আগের মতোই একা। সুনীলকে দেখে প্রথমে হেসেছেন তারপর সব শুনে হাসতে হাসতেই বলেছেন, 'পুলিশের চোখে তুই ক্রিমিনাল, অ্যান্টি-সোস্যাল। পাঁচ বছর জেলখাটা লোক। সমাজে তোর মর্যাদা হবে কেন?'

সুনীল চুপ করে বসেছিল। মৃত্যুঞ্জয়দা পোড়া বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলল, 'শৌখিন রাজনীতি দিয়ে দেশের মঙ্গল হয় না। বিপ্লব তো নব্বই মিনিটের ফুটবল খেলা নয়। তোরা খেলা শুরুর আগেই মাঠ ফাঁকা করে ওদের ওয়াকওভার দিয়ে দিলি।'

সুনীল বিষণ্ণ গলায় বলল, 'সঞ্জয় গোপাল ওরা আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না। ওদের চোখে-মুখে একটা ভয় আর অপরাধ।'

মৃত্যুঞ্জয়দা নিজের কাটা পা-খানা দেখিয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গেও কেউ সম্পর্ক রাখে না। যেদিন পা কেটে বাদ দিতে হল সেদিন মনে হয়েছিল, আমার একটা পা গুলিতে গেছে যাক। লক্ষ লক্ষ পায়ের মিছিল আমাকে ঠিক সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা হল না। আমাকে ফেলে রেখে সবাই অন্য পথে চলে গেল। তোরও তাই। সঞ্জয় আর গোপাল তোকে একা রেখে শহরে এসে আত্মসমর্পণ করল। পেছন থেকে মদত দেবার লোক ছিল তাই কোন শাস্তি পেল না। আর দিবাকর! বড়

অবাক লাগে। ছেলেটা শেষে পুলিশের ইনফর্মারের কাজ করল।' মৃত্যুঞ্জয়দা অবাক হতে গিয়ে বোবা হয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ পর দু'চোখে আগুন ঝরিয়ে বললেন, 'পায়ে জোর থাকলে ওদের আমি গুলি করে মেরে ফেলতাম। বেইমানের কোন ক্ষমা নেই।'

মৃত্যুঞ্জয়দার কথাটা স্নুনীলের মনেও এসেছে। যতবার মনে পড়েছে বুকের মধ্যে চিনচিনে কষ্টটা ততবার ফিরে এসেছে। গতকাল গোপাল অফিসে থেকেও তার সঙ্গে দেখা করেনি। পাশের বাড়ির ছেলেরা বাড়ির সামনে আপনমনে দিব্যি খেলা করে কিন্তু স্নুনীলকে দেখলেই ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে দরজা দেয়। দিদির ছোট মেয়েটা ভয় পাওয়া চোখে দরজার ফাঁক দিয়ে ওকে দেখে। চোখে চোখ পড়লেই একছুটে মায়ের পিঠের আড়ালে গিয়ে মুখ লুকোয়। স্নুনীল ভেবে পায় না, সে কাদের জন্যে জীবন বাজী রেখে লড়াই করতে গিয়েছিল। যাদের জন্যে স্নুখের স্বর্গ গড়তে চেয়েছিল তাদের চোখে সে নেহাত একটা খুনে বা ডাকাত ছাড়া আর কিছু নয়। বহরমপুর জেলে একজন ডাকাতকে সে দেখেছিল। সাধারণ মানুষের মতো চেহারা। অত্যন্ত উগ্র মেজাজ। স্নুনীলকে সে বলেছিল, সমাজটা বড় অদ্ভুত। যত আপরাধ করো, যতক্ষণ ধরা না পড়ছো ততক্ষণ তুমি ভদ্রলোক। একবার সাজা হলে সমাজে তোমার ঠাঁই নেই। তখন ফিরতে চাইলেও ফেরা যায় না। ঘরের মানুষ, পাড়া-পড়শী এবং পুলিশ সবার চোখে পুরনো পাপের স্মৃতিটাই একমাত্র সত্য পরিচয় হয়ে বেঁচে থাকে, আর সব মিথ্যে।

স্নুনীল বুঝতে পারে, পুলিশের খাতায় তার যেমন সমাজবিরোধী পরিচয়টাই সত্য তেমনই বুঝি সত্য তার সমাজের কাছে। তার রাজনৈতিক বিশ্বাস, সংগ্রামের সততা এবং কৃচ্ছসাধনের কথা কেউ মনে রাখেনি। অথচ সঞ্জয়, গোপাল আর দিবাকরদের সমাজ মেনে নিয়েছে।

স্নুনীলের বুকের মধ্যে রাগ ফুঁসে উঠতে থাকে। তার মনে হয় মৃত্যুঞ্জয়দা এবং দিব্যেন্দুর কথাই ঠিক। বেইমানদের আগে সরাতে না

পারলে বিপ্লবের সরণী তৈরি করা যায় না। ওরা সবসময় নৌকোর তলায় ফুটো করে রাখে। মাঝ গাঙে গিয়ে নৌকো যখন ডোবে তখন আর করার কিছু থাকে না।

সন্ধ্যের মুখে বাড়ি ফিরে এলো সুনীল। শরীরে একটা ক্লান্তি টের পাচ্ছে। মাথা ধরে আছে বিকেল থেকে। হয়তো জ্বর আসবে। গায়ে জল ছোঁয়ালে ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করে ওঠে। মুখ ধুয়ে ঘরে আসতেই বাবা বললেন, 'লোকাল থানার ওসি তোমার খোঁজে এসেছিলেন। কাল সকালে একবার দেখা করো।'

সুনীল খুব একটা অবাক হল না। নিঃস্পৃহ গলায় জানতে চাইল, 'কেন?'

অনিলবাবু থেমে যাওয়া টেবিল ঘড়িটায় দম দিতে দিতে বললেন, 'সব কথা আমাকে খুলে বলেননি। হয়তো তোমাকে বলবেন। ওঁদের কাছে ইনফরমেশন আছে তুমি নাকি আবার সংগঠন তৈরি করার চেষ্টা করছো। অস্ত্র-শস্ত্র জোগাড় করেছো।'

সুনীল মনে মনে হাসল। তোয়ালেটা দড়ির ওপর রাখতে রাখতে বলল, 'মানুষের চাইতে শক্তিশালী অস্ত্র আর কিছু নয়। সেই অস্ত্রই তো জং ধরে ভোঁতা হয়ে গেছে।'

সুনীল চলে যাচ্ছিল। বাবার ডাকে পিছু ফিরল। বাবা বললেন, 'তোমার মা খুব উদ্বেগে আছে। সে জানতে চায় তুমি ঘর-সংসারে মন দেবে কিনা, যেমন দিয়েছে তোমার-সহযোদ্ধারা।'

সুনীল এক মুহূর্ত ভাবল। পরে বলল, 'তোমাদের সংসারে টাকার খুব দরকার তাই না?'

বাবা ঘড়িটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'দারিদ্রে আমি অভ্যস্ত। স্কুলের চাকরীটা এখনও আছে। দুটো কোচিং ক্লাসও করছি। আমার এর চাইতে বেশি প্রয়োজন নেই। তুমি নিজের জন্য কোন প্রয়োজন অনুভব করো না?'

সুনীল মুখ না তুলেও বুঝল বাবা তার উত্তরের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছেন। সুনীল লম্বা করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'যদি বুঝি

তাহলে ভাববো।'

সকালে থানা থেকে সুনীল ছাড়া পেল ঘণ্টা দেড়েক বাদে। বাইরে তখন ঝকঝকে রোদ। সুনীলের বুকের মধ্যেও ঝকমক করে জ্বলছে একটা প্রচণ্ড ক্রোধ। থানার দারোগা স্পষ্টই বলেছেন, 'আপনার পুরনো বন্ধুদের সূত্রেই খবর পেয়েছি রাষ্ট্রের এবং সমাজের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আপনি এখনও বিপজ্জনক। সংগঠন তৈরি করার চিন্তা ছেড়ে কাজের ধান্দা দেখুন। নইলে কিন্তু আপনাকে আমরা আর স্পেয়ার করব না।'

সুনীল থানা থেকে সোজা মৃত্যুঞ্জয়দার বাড়িতে গেল। সেখান থেকে সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়ল। সারারাত্রে তাকে খাবার জন্যে কেউ ডাকতে এলো না। রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুনীল অনেকদিন পর মীরাকে স্বপ্নে দেখল। মীরা এখন দিবাকরের বউ। বিয়েটা সুনীলই দিয়েছিল। দিবাকরের অ্যাজমার কষ্ট ছিল। শীতকালে বড় কাহিল হয়ে পড়তো। তাই ওকে রাখা হয়েছিল বাইরে। ও শুধু খবর পৌঁছে দিত। নর্থবেঙ্গল যাবার আগেই সুনীল ধরতে পেরেছিল মীরার ওপর দিবাকরের একটা দুর্বলতা আছে। কিন্তু কোনদিন প্রকাশ করেনি। মীরা তখন দিবাকরের কাজে সাহায্য করতো। দিবাকরকে মীরা পছন্দ করতো কিন্তু ওকে বিয়ে করার কথা কখনও ভাবেনি। বিয়ের প্রস্তাবটা দিল সুনীল। সুনীলের সারা গায়ে তখন র‍্যাশ বেরিয়েছে। দিবাকর ওকে লুকিয়ে রেখেছে তালতলার একটা বাড়িতে। সেই বাড়িতেই সুনীল মীরাকে বলল, 'দিবাকর তোমাকে ভালবাসে। তুমি ওকে বিয়ে করলে আমি খুশি হবো।'

মীরা জোড়া ভ্রূ তুলে বলেছিল, 'তোমাকে খুশি করাই তো আমার জীবনের লক্ষ্য নয়। তাছাড়া তুমি ভাবছো কেমন করে তুমি যা বলবে তাই আমি মেনে নেব।'

সুনীল গলায় আবেগ জড়িয়ে বলেছিল, 'আমাকে ভালবাসো তাই আমার অন্যে তুমি মেনে নেবে এটুকু তো আশা করতে পারি।'

মীরা চুপ করে ছিল। সুনীল ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, 'আমার জীবন অনিশ্চিত। তাই আমি চাই দিবাকরকে তুমি বিয়ে করো। ও তোমাকে ভালবাসে। দিবাকর আমারই অর্ধেক অংশ। প্লিজ তুমি ওকে হতাশ করো না।'

মীরার চোখ ভারি হয়ে উঠল। নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'আমার জীবনটা নিয়ে নাই বা বিপ্লব করলে। আমাকে আমার মতো থাকতে দাও।'

সুনীল উঠে বসে আবার মীরার হাত ধরেছিল। কাতর গলায় অনুরোধ করে বলেছিল, 'আমি দিবাকরকে কথা দিয়েছি। তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিও না—প্লিজ মীরা আমাকে কথা দাও। মনে করো কোন অসহায় ভিখারীকে তুমি করুণা করছো।'

মীরা কোন কথা বলেনি। ওর বড় বড় দুই চোখের কোলে কান্না থইথই করে উঠেছিল।

কলকাতায় থাকতে থাকতেই ওদের বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের রাত্রে সুনীলের অনুরোধে মীরা গান গেয়েছিল, 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার।'

সেইরাত্রেই দিবাকর আর মীরাকে রেখে ওরা ঘাটশিলা চলে গিয়েছিল। ঘাটশিলাতে দিবাকরই খবর দিয়েছিল মীরা মা হয়েছে। ওর ছেলের নাম রেখেছে বরুণ। ধরা পড়বার আগে কলকাতায় এলেই দিবাকরের ওখানে উঠতো সুনীল। ছেলেটা ছুটে এসে দিবাকরের কোলে উঠত। যখন কথা ফুটল, তখন ডাকতো, 'আঙ্কেল, ও আঙ্কেল, আমার টফি কই?'

মীরাকে তখন চেনা যেত না। সে পাশে দাঁড়িয়ে হাসতো। মেয়েরা বিয়ের পর যতটা বদলায় মা হওয়ার পর তার দ্বিগুণ বদলে যায়। মীরা কলেজে চাকরী পেয়ে গেছে। ছেলেটাকে নিজেই সন্ধ্যাবেলা পড়াতে বসায়। বরুণ যখন বলে, 'আঙ্কেল তুমি যে আমার জন্যে সত্যিকারের ঘোড়া আনবে বলেছিলে আনলে না তো?'

সুনীল মুগ্ধ চোখে বরুণকে দেখতে দেখতে বলে, 'আরেকটু বড় হও। ঘোড়ায় চড়ে তো তোমায় শিবাজীর মতো যুদ্ধ করতে হবে। আমি তোমাকে যুদ্ধ শিখিয়ে দেব।'

বরুণ খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠতো। আর মীরা ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতো, 'খোকা, এই আঙ্কেলকে একদম বিশ্বাস করবি না। বিশ্বাস করলেই ঠকবি। ও শুধু আশা দিতে জানে, পূর্ণ করতে পারে না।'

সুনীল অপরাধীর মতো শুধু হাসতো।

ঘুম ভাঙ্গার পর মীরা আর বরুণের সঙ্গে সঙ্গে তার দিবাকরকেও মনে পড়ল। সেই দিবাকর যে তাকে মিথ্যে খবর দিতে বাড়িতে এনেছিল। বলেছিল, 'তোর বাবার ভীষণ অসুখ। হয়তো বাঁচবে না। আমি ব্যবস্থা করে রেখেছি। তুই একবার দেখা করে আয়। তোর কোন ভয় নেই। কেউ জানবে না।'

দিবাকরের ব্যবস্থার প্রতি ভরসা ছিল সুনীলের। খবর পেয়ে রাত্রিবেলা বাড়ি এলো। ঘরে পা দিতেই সে চমকে গেল। বাবা বিছানায় শুয়ে টেবল ল্যাম্প জ্বেলে বই পড়ছেন।

সুনীল আহত বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাকি খুব শরীর খারাপ? আমাকে দেখা করতে খবর পাঠিয়েছো?'

বাবা চশমা খুলে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কই না তো! আমি তো দিব্যি ভাল আছি। তা ছাড়া আমার তরফ থেকে তোমাকে তো কোন খবর দেইনি।'

সুনীল সঙ্গে সঙ্গে বিপদের গন্ধ পেয়ে গেল। কিছু ভেবে ওঠবার আগেই দরজায় ধাক্কা। সুনীল পকেটে হাত ঢোকাতে যাচ্ছিল। বাবা এগিয়ে এসে বললেন, 'ডোণ্ট ডু দিস! আমার মনে হয় তুমি জালে ধরা পড়েছ। এখন এসব করা হঠকারিতা হবে।'

মা জানালা থেকে ফিরে এসে বলল, 'বাড়ির চারপাশে পুলিশ।'

বাবা অস্থিরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'জানতাম। এটা প্ল্যান করে করা হয়েছে।'

স্নীল অসহায়ভাবে কপালে চাপড় মারল। অনিলবাবু হাত বাড়িয়ে বললেন, 'ওটা তোমার কাছে থাকলে বিপদ বাড়বে। আমায় দাও। কুইক!'

স্নীল পিস্তলটা বাবার হাতে তুলে দিলো। বাবা পিস্তলটা হাতে নিয়ে এক মুহূর্ত ভাবলেন। পরক্ষণেই দেওয়ালে টাঙানো বিবেকানন্দের ফটোর পেছনে রেখে তিনি লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। মা দরজা খুলে দিতেই ঘরের মধ্যে জনা ছ'য়েক পুলিশ ঢুকে পড়ল। ঘরে ঢুকেই পুলিশ স্নীলকে পেয়ে গেল। পরম উল্লাসে জিপগাড়িতে তুলে নিয়ে ওরা চলে গেল দশ মিনিটের মধ্যেই।

স্নীল মনে মনে ভাবল, সেই পিস্তল নিশ্চয়ই বাবা ফেলে দেননি। এই বাড়িতেই কোথাও না কোথাও আছে। শুধু খুঁজে দেখতে যা সময় লাগবে।

৫

দিনদশেকের মধ্যেই শহর তোলপাড় হয়ে উঠল। সকালবেলা কাগজ হাতে নিয়ে অনিলবাবু চোখের চশমা খুলে দ্রুত ভেতরের ঘরে এলেন। স্ত্রীকে কড়া গলায় ধমক দিয়ে বললেন, 'স্নীল কোথায়?'

সুধা রান্নাঘরে ভাতের ফ্যান গালছিল। ভাতের হাঁড়িটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'কেন কী হয়েছে?'

অধৈর্য গলায় অনিলবাবু বললেন, 'এটা আমার প্রশ্নের জবাব হল না। খোকা কোথায়?'

সুধা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কাল সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে গেছে। বলে গেছে নাও ফিরতে পারে।'

হাতের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অনিলবাবু দ্রুত শোবার ঘরে এলেন। খাটের ওপর থেকে প্রথমে বালিশ আর তোশক তারপর

মোটা জাজিমটা তুলে ধরে বললেন, 'এটা একটু ধরো।'

ভয়ে এবং অধীর উত্তেজনায় সুধা এগিয়ে এসে দু'হাতে জাজিমটা তুলে ধরে থাকল। অনিলবাবু সতরঞ্চিটা সরিয়ে খাটের দিকে তাকালেন। খাটের ওপর ছোট একটা খোপ। প্রায় কবজি পরিমাণ সাইজ। সেই খোপের তালাটা ভাঙ্গা। অনিলবাবু সেই খোপের তালাটা খুলে দেখলেন সেখানে কিছু নেই। শুধু এক খণ্ড কাগজ। তাতে লেখা, 'বাবা, আমার জিনিস আমি নিলাম। এখন এটাই আমার কমরেড।'

অনিল চৌধুরী ধপ করে মেঝেতে বসে পড়লেন। বিমূঢ় সুধার হাত থেকে জাজিমটা ধপাস করে বিছানার ওপর পড়ল।

সুধা চিঠিটা পড়ে বলল, 'ওতে তো গুলি ছিল না।'

অনিলবাবু হতাশ গলায় বললেন, 'ওটা জোগাড় করা কঠিন কাজ নয়।'

সুধা ফিসফিস করে বলল, 'ওকি আবার আন্দোলন করতে যাচ্ছে?' অনিলবাবু জবাব দিলেন না। উঠে গিয়ে কাগজটা এনে স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন, 'প্রথম পাতায় চারের কলমের খবরটা পড়, নিচেব দিকে।'

সুধা পড়তে গিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। 'মজুমদার ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানির মালিক গোপাল মজুমদার গতরাত্রে মারা গেছেন। তার মৃতদেহ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বরাহনগরের গঙ্গার ঘাটে পাওয়া গেছে। আততায়ী সম্ভবত কাছ থেকে তার গলায় গুলি করেছে। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। পুলিশ সন্দেহ করছে এটি উগ্রপন্থীদের কাজ।'

সুধা বিস্ফারিত চোখে স্বামীর দিকে তাকালো। অনিলবাবু দেয়ালে হেলান দিয়ে অবসন্ন গলায় বললেন, 'এটা খোকারই কাজ। ও বোধহয় বদলা নিচ্ছে। পুলিশ নির্ঘাত ওর সন্ধানে এ বাড়িতে আসবে। আমার হুকুম রইল, ওকে এ বাড়িতে ঢুকতে দিও না।'

কিন্তু তিনদিনের মধ্যেও সুনীল আর এ বাড়িতে এলো না।

সুধার মধ্যে উদ্বেগ হচ্ছিল কিন্তু স্বামীর সামনে সেটা প্রকাশ করতে পারছিলেন না। আবার ঠিক চারদিনের মাথায় হিন্দুস্থান জুট অ্যাণ্ড লেদার কর্পোরেশনের পার্সোনেল ম্যানেজার সঞ্জয় দত্তের গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হল। এখানেও আততায়ী গুলি করেছে বাঁ পাশ থেকে মৃত ব্যক্তির গলায়। একই সপ্তাহে দুটো খুন একই ধরনের। পুলিশ এবারও উগ্রপন্থীদের কাজ বলে অনুমান করেছে। দ্বিতীয় খুনের খবর বেরোবার পর পুলিশ সুনীলের খোঁজে এসেছিল। অনিলবাবু স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, 'ছেলের সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না। কাজ-কর্মের খোঁজে সে একদিন সকালে বেরিয়ে যায় এখন পর্যন্ত ফিরে আসেনি।'

সুনীল ফিরে এলে যেন পুলিশকে জানানো হয় এমন নির্দেশ দিয়ে দারোগা চলে গেলেন। অনিলবাবু বিলক্ষণ জানেন, পুলিশ তার খবর দেওয়ার অপেক্ষায় থাকবে না। এই বাড়ির ওপর এখন থেকে তাদের কড়া নজরদারী চলবে।

সুধা ভেতরের অস্থির উদ্বেগ চেপে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি মনে হয় খোকা নিজে হাতে খুন করেছে ?'

অনিলবাবু গম্ভীরমুখে জবাব দিলেন, 'অবিশ্বাস্য কিছু নয়।'

সুধা বাঁ হাতে চোখের কোল থেকে জল মুছে নিয়ে বলল, 'এর থেকে জেলে থাকা ঢের ভালো ছিল। এখন বাইরে বেরিয়ে অশান্তি করে বেড়াচ্ছে।'

অনিলবাবু নিঃশব্দে পায়চারি করতে করতে বললেন, 'ওকেও এমনি করে বেঘোরে একদিন প্রাণ দিতে হবে। ইডিয়টটা জানে না, একা-একা বিপ্লব হয় না, কোনদিন কোনদেশে হয়নি।'

সুধা চুপ করে থাকেন। তার মনে পড়ে যেতে থাকল খোকার কথা। স্কুলের কোন পরীক্ষায় কোনদিন দ্বিতীয় হয়নি। স্কুল ফাইনালে একলাখ চল্লিশ হাজার ছেলের মধ্যে খোকা সেকেণ্ড হয়েছিল। কলেজে ঢোকার পর থেকেই ওর মাথার পোকা নড়ে উঠল। সুধা কাউকে দোষ দেন না। এটা তাঁর অদৃষ্টের লিখন। শ্বশুর,

স্বামী আর একমাত্র ছেলে এরা কেউ অন্য দশজনের মতো হোল না। নিজেদের সংসারের দিকে তাকালো না, কোন শখ-আহ্লাদ মেটালো না শুধু অলীক একটা স্বপ্ন দেখতে দেখতে নিজেদের জীবনের পরমায়ু শেষ করে ফেলল। কে মনে রেখেছে আদিত্য চৌধুরীকে? কে আগ-বাড়িয়ে নাম করে অনিল চৌধুরীর? যে চাকরীটা রাজনীতি করার জন্য খুইয়েছে সেটা থাকলে চার হাজার টাকা মাইনে হয়ে যেত এতদিনে। রিটায়ার করার সময় দেড়-তুলাখ টাকা নিয়ে ঘরে আসতে পারতো। সবার জন্যে সুখের স্বর্গ বানাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত চোখের জল আর দিবা-রাত্রির উৎকণ্ঠা সম্বল হয়েছে সুধার।

সুধা গোপনে চোখের জল মুছে ভাবে তার খোকা কেন অন্যরকম হোল না। ওর মতো ছেলের ভাল চাকরীর অভাব হতো না। ছোট বোন নিভার ছেলে ব্যাঙ্কে চাকরী করে। গত বছর ছেলের বিয়ে দিয়েছে নিভা। সাজানো সংসারে গর্বিত পায়ে নিভা ঘুরে বেড়ায়। মেয়ের বাড়ি গায়ে হলুদের তত্ত্ব পাঠাবার সময় নিভার ননদ সুধাকে প্রশ্ন করেছিল, 'বড়দি, তোমার ছেলের বিয়ে দেবে না?'

সুধা উত্তর দিতে পারেনি। নিভা চোখের ইশারায় ননদকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'আগে জেল থেকে ফিরুক। ওটা ওদের বংশগত ব্যাধি!'

আড়ালে ডেকে নিভা বলেছিল, 'জেল থেকে ফিরলে ছেলেটার মতি ফেরাও, দিদি। নইলে ভবিষ্যতে খুনে-ডাকাত হয়ে যাবে। অত বিপ্লব-টিপ্লব করতে হবে না। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ঢের হয়েছে আর দরকার নেই।'

সুধা দাঁতে দাঁত চেপে সব শুনে গেছে। বিয়েবাড়ির উৎসবে তার মন বসেনি। তার বুকের মধ্যে একটা অসীম শূন্যতা নিয়ে কেবল খ্যাপা হাওয়ার মতো দীর্ঘশ্বাস উঠে আসছিল। শরীর খারাপের অছিলায় সুধা চলে এসেছিল বোনের বাড়ি থেকে। খোকা ফেরার পর কেউ খোকার খোঁজে এ-বাড়িতে একবারও আসেনি। সুধা বুঝতে পারে আত্মীয়স্বজনরা তার খোকাকে সহ্য করতে পারে

না। তবু কেন, কিসের জন্য খোকা সবার হয়ে লড়াই করতে যায়?

সুধা কান্না চাপতে গিয়ে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বাইরে তখন আকাশ কালো করে অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে। সেইসঙ্গে শেষ শ্রাবণের মাতাল হাওয়া।

৬

হু হু শব্দে আছড়ে পড়েছে বাতাস। গাছ-গাছালির মাথার ঝুঁটি ধরে কাঁপিয়ে দিচ্ছে হাওয়া। অন্ধকার আকাশ ফুটো হয়ে তীক্ষ্নবেগে নেমে আসছে বৃষ্টি। ঝড়ের মুখে-মুখেই রাস্তার আলো নিবে গেছে। চারপাশ অন্ধকার এবং নির্জন।

এই দুর্যোগের মধ্যে ঘরের দরজায় প্রথমে আস্তে আস্তে পরে অসহিষ্ণু এবং অধৈর্য হাতে দরজার কড়া নাড়ল কেউ। মীরা বসবার ঘরে বসে আলমারির বই গোছাচ্ছিল। চকিতে মুখ ঘুরিয়ে সে দরজার দিকে তাকালো। ভেতর থেকে প্রশ্ন করল 'কে?'

মীরা উত্তরের অপেক্ষা করল না। দরজা খুলে দিতেই ঝড়ের হাওয়ার সঙ্গে উড়ে এলো একঝাক বৃষ্টি। আর তারই মধ্যে সর্বাঙ্গ ভেজা অবস্থায় দরজার পাশ থেকে একলাফে ঘরে এলো সুনীল।

প্রথমে চমকে গিয়েছিল মীরা। সুনীলই দরজা বন্ধ করে দিল। মীরা হ্যারিকেনটা তুলে ধরে বলল, 'তুমি! হঠাৎ এসময়ে?'

সুনীলের চোখের দৃষ্টি কঠোর এবং ধারালো। তার ভেজা দাড়ি থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে বুকের ওপর। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে বলল, 'দিবাকর কোথায়?'

মীরার বুকের মধ্যে ধাক্কা লাগল। সুনীলের প্রশ্নটা ধারালো ইস্পাতের ফলার মতো তাকে বিদ্ধ করেছে। সে হ্যারিকেনটা নামিয়ে রেখে বলল, 'বহুকাল পরে এলে। বসতে না চাও জোর করব না। ভেজা জামাটা অন্তত খুলে দাও।'

সুনীল মীরার মুখের ওপর থেকে চোখ সরাল না। একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আগের মতোই বলল, 'আমার সময় কম। দিবাকর কোথায়?' মীরার চোখ আগের চাইতে তীক্ষ্ণ হল। সুনীলকে নিরীক্ষণ করতে করতে বলল, 'ওর সঙ্গে তোমার কিসের দরকার?'

সুনীল অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে আমি আসিনি। আমি জানতে চাই দিবাকর কোথায়? ওর সঙ্গে আমার হিসেব মেটাবার পালা এইবার শুরু হবে।'

মীরা টেবিলের দিকে সরে গেল। তার পা কাঁপছে। সুনীলের চোখের আগুন তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। সে অস্ফুটে বলল, 'কিসের হিসেব?'

ঘৃণায় মুখ বেঁকে গেল সুনীলের। তীব্র গলায় বলল, 'তুমি জানো না, কিসের হিসেব, বেইমানির হিসেব। আমার সময় নেই, মীরা। আমি ওকে দেখতে চাই।'

মীরা নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করল। গলার স্বর স্বাভাবিক করে বলল, 'এখন তোমার মাথার ঠিক নেই, তোমার চোখে আমি সর্বনাশের আগুন দেখছি। তুমি হয়তো জানো না, দিবাকর তোমাকে—'

অস্থিরভাবে মাথা নেড়ে টেবিলে চাপড় মেরে মীরাকে থামিয়ে দিয়ে সুনীল বলল, 'কোন সাফাই দেবার প্রয়োজন নেই। তুমি আজ চেষ্টা করলেও দিবাকরকে আড়াল করতে পারবে না। তুমি বল সে কোথায়?' মীরা জেদের গলায় বলল, 'যদি না বলি।'

সুনীল সামান্য হাসল। বাঁ হাতে দাড়ির ওপর থেকে জল মুছে নিয়ে বলল, 'তাহলেও দিবাকরকে তুমি বাঁচাতে পারবে না। হয়তো আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তোমাকে খুন করতে হবে।'

মীরা তার আহত চোখ তুলে বলল, 'পারবে?'

সুনীল ডান হাতটা পকেট থেকে টেনে বাইরে আনল। তার হাতে এখন উদ্ধত পিস্তল। তার মুখে নিষ্ঠুর হাসি।

মীরার চোখের পাতা কেঁপে উঠল। বুকের মধ্যে ঢিবঢিব শব্দ

উঠেছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে।

পাশের ঘর থেকে 'মা, কার সঙ্গে কথা বলছ' বলতে বলতে ছুটে এলো দিবাকরের ছেলে বরুণ। সুনীলকে দেখেই সে চিনলো, ঝাঁপিয়ে পড়ল সুনীলের কোলের কাছে, 'আঙ্কেল আমার টফি এনেছো? এতদিন আসেনি কেন?'

বরুণের গলার আওয়াজ পেয়েই সুনীল পিস্তলটা পকেট ঢুকিয়েছিল। বরুণ এখন তাকে জড়িয়ে ধরছে। সুনীলের ডান হাত প্যান্টের পকেটে ঢোকানো। সে হাত বার করতে পারছে না।

বরুণ সুনীলকে ছেড়ে দিয়ে মীরাকে বলল, 'মা তুমি কেমন গো! আঙ্কেল তো ভিজে গেছে। আমি বাবার প্যান্ট-জামা নিয়ে-আসছি।'

বরুণ চলে যাচ্ছিল। সুনীল বলল, 'তোমার বাবা কোথায়?'

বরুণ হাত তুলে পাশের ঘরটা দেখাতে যাচ্ছিল। মীরা ছেলেকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে ব্যস্ত গলায় বলল, 'ও কিছু জানে না।'

সুনীল পাশের ঘরের খোলা দরজার দিকে তাকালো। দরজার ওপর ফিকে গোলাপী রঙের পর্দা। সুনীল এগিয়ে যাচ্ছিল। মীরা তার আগে গিয়ে দরজা আড়াল করে দাঁড়াল। দুই হাত দুইদিকে ছড়িয়ে বাধা দেওয়ায় ভঙ্গিতে বলল, 'না, তুমি ওঘরে যাবে না। আমি তোমাকে যেতে দেব না।'

সুনীল দীপ্ত ভঙ্গিতে সামনে দাঁড়িয়ে। ডান হাতটা পকেট থেকে টেনে আবার সামনে আনল। পিস্তলটা সামনে ধরে বলল, 'সামনের বাধা সবাবার কায়দা আমি জানি। আমাকে বাধা দিয়ে লাভ নেই। ওর প্রাপ্য শাস্তি ওকে পেতেই হবে।'

মীরা গলায় ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'কিসের শাস্তি?'

সুনীল তার চোখ সরাল না; চোখের ভাষা বদলানো না। আগের মাতাই বলল, 'বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি। আমাকে মিথ্যে খবর দিয়ে পুলিশের জালে ধরিয়ে দেবার শাস্তি।'

মীরা এবার কাতর গলায় বলল, 'তুমি বিশ্বাস করো এসব?'

সুনীল আগের মতো ঠোঁট চেপে হাসল। নিষ্ঠুর এবং ব্যঙ্গের হাসি।

মীরার শরীর কাঁপছিল। শরীর ক্রমশ দুর্বল মনে হচ্ছে। নিজের ভেতর সাহস খুঁজতে খুঁজতে সে বলল, 'সঞ্জয় আর গোপাপকে কি তাহলে তুমিই খুন করেছ?'

সুনীল বিরক্ত গলায় বলল, 'সে কৈফিয়ত তোমাকে দেব না। এটাই আমার শেষ কাজ। তারপর যা বলবার আমি পুলিশের কাছে বলব। খুন না করে পাঁচ বছর খুনীর সাজা পেয়েছি। এবার সত্যিকারের খুন করে সেই সাজা পেতে চাই। তুমি সরে দাঁড়াও।' মীরা দরজা থেকে সরল না। দু'হাতে দরজা আগলে অস্থির গলায় বলল, 'আমাকে না মেরে তুমি ওঘরে যেতে পারবে না।'

সুনীল দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিদ্রুপের গলায় বলল, 'খুব পতিব্রতা হয়েছো তো। সহমরণে যেতে যদি না চাও তাহলে দরজা ছেড়ে দাঁড়াও। আমি একবার বিশ্বসঘাতকটার সামনে যেতে চাই।'

মীরা এবার আহত বাঘিনীর মতো তীব্র চোখে সুনীলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি বিশ্বাসঘাতক নও? তুমি আমাকে ঠকাওনি? কথা দিয়ে পরে দূরে সরে যাওনি? অথচ তোমার কথা রাখতে আমি ওকে বিয়ে করেছি। তোমার শাস্তি হবে না?'

সুনীল একথার হঠাৎ কোন জবাব খুঁজে পেল না। বাঁ হাত দিয়ে মীরাকে টেনে সরিয়ে দেবার জন্যে সে হাত বাড়াল। বরুণ মায়ের কোলের কাছে দাঁড়িয়ে। সে এগিয়ে এসে সুনীলের হাঁটু চেপে বলল, 'আঙ্কেল, তুমি বাবাকে মেরো না। আঙ্কেল আমাকে আর কোনদিন টফি দিতে হবে না। আমার জন্যে ঘোড়া আনতে হবে না। তুমি আমার বাবাকে বাঁচিয়ে দাও।'

সুনীল একমুহূর্ত স্থির থেকে বরুণকে দেখল। তারপর দু'হাতে বরুণকে তুলে টেবিলের ওপর জোর করে বসিয়ে দিল। টেবিলের ওপর কিছু বই খাতা ছড়ানো ছিল। তার পাশে একটা টেপরেকর্ডার। বরুণ কিছুতেই সুনীলের হাত ছাড়ছে না। ওকে ছাড়াতে না পারলে

সুনীলের দেরি হয়ে যাচ্ছে। সুনীল এবার জোর খাটালো। ওর হাতের ধাক্কার বরুণ ছিটকে টেবিল থেকে গড়িয়ে যাচ্ছিল-। সুনীল সেদিকে তাকালো না। ক্ষিপ্রহাতে মীরাকে একটানে দরজা থেকে সরিয়ে দিয়ে সে ঘরের পর্দা তুলে ধরল। ঘরের মধ্যে কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। দিরাকর পিছনে বালিশ দিয়ে স্থাণুর মতো উদগ্রীব হয়ে বসে। সে তাকিয়ে আছে সুনীলের দিকে। সুনীলের হাতে উদ্ধত পিস্তল। দিবাকর টেবিলের ওপর থেকে একটা শ্লেট তুলে ওকে দেখাল। চক দিয়ে তাতে লেখা, 'সুনীল, আমি তোর প্রতীক্ষায় বসে আছি। আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দে। তোর হাতে আমার মৃত্যু হোক।'

বাইরের ঘরে টেবিল থেকে পড়ে গিয়েছিল বরুণ। ওর পায়ের ধাক্কায় হ্যারিকেনটা মেঝেতে উল্টে পড়ে ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। বরুণ অন্ধকারে টেবিল হাতড়াতে গিয়ে না জেনে টেপরেকর্ডারেও বোতাম টিপে ধরেছে।

সুনীল শ্লেটটা বাঁহাতে নিয়ে দিবাকরের বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে এক পা এগোতেই পাশের ঘর থেকে অন্ধকারে টেপে মীরার গান ভেসে এল, 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার তোমার অভিসার।' অবিশ্বাস্য একটি মুহূর্ত যেন।

সুনীলের হাত মুহূর্তের জন্য কেঁপে গেল। যেন সারকারামার মতো পর পর ভেসে আসতে লাগল কয়েকটা ছবি। যেন দমকা হাওয়ায় হঠাৎ উড়ে যাচ্ছে পুরনো অ্যালবামের কয়েকটা পাতা। দিবাকর আর মীরার বিয়ে! বরুণকে কোলে তুলে নাচাচ্ছে সুনীল। মীরা সুনীলেব মুখে রসগোল্লা পুরে দিয়ে বলছে 'ছেলে যেন লেখাপড়ায় তোমার মতো হয় শুধু এইটুকু আশীর্বাদ করো।' বরুণ ছুটে এসে গলা জড়িয়ে ধরছে সুনীলের। দিবাকর আর সুনীল কলেজ ক্যানটিনে এক থালায় ভাত খাচ্ছে। সুনীল অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল পেছন থেকে মীরা বলল, 'কী হল গুলি চালাও। তোমার তো দেরি য়াচ্ছে।'

সুনীল ডাকল, 'দিবাকর, কিসের লোভে আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিলি ? কী পেয়েছিস তার বিনিময়ে ?'

দিবাকর উত্তর দিল না। শ্লেটটা কুড়িয়ে নিয়ে লিখতে লাগল। সুনীল মীরার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দিবাকর কথা বলছে না কেন ?'

মীরা যেন অনেকদূর থেকে উত্তর দিচ্ছে এমন গলায় বলল, 'ও কথা বলতে পারে না।'

দিবাকর শ্লেটটা তুলে সুনীলকে দেখাল। দিবাকর লিখছে, 'সুনীল, আমার গলায় ক্যানসার। 'রে' দেওয়া হয়েছে। কয়েকদিন পরেই হয়তো মরব। তার চেয়ে ঢের ভালো তোর হাতে মরা। তুই গুলি চালা।'

মীরা ঠিক এইসময় অদ্ভুত আচরণ করল। বিছানায় বসে দিবাকরকে তু'হাতে জড়িয়ে ধরে ডাকল, 'খোকা-খোকা !'

অন্ধকার ঘর থেকে বরুণ ছুটে এলো। মীরা বলল, 'তুই আমার পাশে বোস। সুনীল, তোমার পিস্তলে তিনটে গুলি আছে তো ?'

ঝট করে সুনীলের মনে হল সে একবার দিবাকর, মীরা আর বরুণের ছবি তুলে দিয়েছিল। ওরা ঠিক এমন করেই পাশাপাশি বসেছিল। সেদিন সুনীলের হাতে ক্যামেরা ছিল, এখন পিস্তল।

সুনীল ভেতরে ভেতরে তুর্বল হচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল, মীরা কিংবা বরুণ তার লক্ষ্য নয়। অথচ ওরা এক অদৃশ্য শক্তিতে দিবাকরকে আড়াল করছে। এই শক্তিটার নাম কি ? এই আড়াল সে সহজে ভেদ করতে পারবে না। তার মনে হল দিবাকর নয়, তার উদ্ধত পিস্তলের সামনে একজন মা, একজন বাবা আর তাদের একমাত্র বংশধর। সুনীল পিস্তল নামাল না। এক পা সরে গিয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বলল, 'তুই আমাকে মিথ্যে খবর দিয়ে ধরিয়ে দিলি ? তুই পুলিশের ইনফর্মার হয়ে গেলি ?'

দিবাকর জবাব দিতে পারল না। সে মুখ তুলে মীরার দিকে তাকালো। তার ঘোলাটে এবং যন্ত্রনায় করুণ হয়ে আসা চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল।

মীরা বলল, 'ও তোমার কথার জবাব দিতে পারবে না। জবাবটা আমার কাছ থেকে শুনে নাও। বিশ্বাস করা না করা তোমার ওপর।'

সুনীল বলল, 'আগে শুনি।'

মীরা বলল, 'সঞ্জয় এলো সন্ধ্যেবেলা। বলল পুলিশ ওদের ফলো করছে। ওদের পক্ষে সুনীলের সঙ্গে যোগাযোগ করা মুশকিল। সুনীলের বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। বাঁচবার আশা নেই। ওরা ডাক্তারের রিপোর্ট দেখাল। ও যেন সুনীলকে খবর দেয়। সুনীলের নিরাপত্তার দায়িত্ব ওদের। দিবাকর খবর পাঠিয়ে আর বাড়ি ফিরতে পারেনি। পুলিশ ওকে সামনের রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে যায়। খোকাকে নিয়ে আমি তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছিলাম কাকাবাবুকে দেখতে। আমাদেরও ওরা থানায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখে। আমরা বুঝতে পারি, তোমার বিপদ আসছে। কিন্তু তখন কিছু করার নেই। তুমি অ্যারেস্ট হওয়ার পর আমরা ছাড়া পাই। পরে জেনেছি সঞ্জয় আর গোপালকে পুলিশ ধরেছিল। ওদের শর্ত দিয়েছিল যদি সুনীলকে ধরিয়ে দিতে পারে তাহলে ওদের ওপর থেকে সমস্ত চার্জ তুলে নেবে। গোপালের বউ ঊর্মিলার বাবাই এই ব্যবস্থা করেছিলেন। উনি গোপালের কাকার বন্ধু। তোমাকে ধরিয়ে দেওয়ার কোন ইচ্ছে দিবাকরও না জেনে, শুধু বিশ্বাস করে ট্রাপে পা দিয়েছিল।'

কথা বলতে বলতে মীরা উত্তেজিতভাবে উঠে গেল। আলমারির ভেতর থেকে একটা ছোট্ট কাঠের বাক্স এনে তার ঢাকনা খুলে বার করল দুটো চিঠি। সুনীলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এইটা হচ্ছে ডাক্তারের সেই মিথ্যা রিপোর্ট, যেটা গোপাল জাল করেছিল পুলিশের সাহায্যে। আর তুমি ধরা পড়ার পর দিবাকরকে লেখা সঞ্জয়ের চিঠি।'

সুনীল চিঠিটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে পড়তে লাগল, 'প্রিয় দিবাকর, সুনীলের খুব লম্বা মেয়াদের জেল হবে। তোর জন্যেই সুনীলকে ধরতে পেরেছে বলে পুলিশ তোর কাছে কৃতজ্ঞ। গোপালের কাকাকে

বলেছি, তিনি তাঁর বন্ধুকে দিয়ে তোর ওপর থেকেও সমস্ত চার্জ তুলে নেবেন। বিয়ে-থা করেছিস, ছেলের বাপও হয়েছিস এখন এসব পাগলামী মানায় না।'

সুনীল চিঠিটা ফেরত দিয়ে বাইরে তাকাল। বাইরে বৃষ্টি বোধ-হয় থেমেছে। সুনীল বাঁ হাত দিয়ে জানালার একটা পাল্লা খুলে দেখল আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

মীরা কাঠের বাক্সে চিঠিটা রাখতে রাখতে বলল, 'তবুও আমরা নিরাপদ ছিলাম না। ক্রমাগত বাড়ি বদলেছি। সহজে কেউ বাড়ি ভাড়া দিতে চাইতো না। ঊর্মিলাকে গোপাল বিয়ে করার পর আমাদের ওপর থেকে চার্জ উঠল। আমি ভেবেছিলাম আলিপুরে যখন এসেছো তখন একবার দেখা করি। কিন্তু অনুমতি পাইনি। আমি জানি না এসব কথা তুমি বিশ্বাস করবে কি না।'

সুনীল দিবাকরের টেবিলের দিকে তাকাল। স্ট্যাণ্ডে দুটো ফটো। একটা সুনীলের হাতে তোলা দিবাকর, মীরা আর বরুণের ছবি। আরেকটা মীরার হাতে তোলা সুনীল আর দিবাকরের ছবি।

সুনীল চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দিবাকরের দিকে তাকালো। দিবাকর শ্লেটে লিখছে 'মীরার সব কথা সত্যি। আমি না জেনে ঠকেছি। তবু তুই আমায় ক্ষমা করিস না। . আমি মরতে চাই।'

সুনীল স্থির চোখে দিবাকরকে দেখল! তাকিয়ে থাকল খানিক-ক্ষণ। তার চোখ জ্বালা করছে। সে পিস্তল হাতে এগিয়ে এলো। বরুণের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, 'খোকা, আমার কাছে টফি নেই। এইটা আছে। এবার থেকে এটা তোমার কাছে থাকবে!'

মীরা শিউরে উঠে বলল, 'ওর মধ্যে গুলি নেই?'

সুনীল হাসল। হাসতে হাসতে বলল, 'নিশ্চয়ই আছে। খোকার হাতে কি ভোঁতা অস্ত্র দিতে পারি। ওতে তিনটে গুলি ছিল। দুটো খরচ হয়েছে কিন্তু একটা থেকে গেছে আগামীদিনের জন্যে। ওটা আমি খোকাকে দিলাম। তোমরা ওকে অস্ত্রের ব্যবহারটা শিখিয়ে দিও।'

সুনীল চলে যাচ্ছিল। বাইরের দুর্যোগ কেটে গেছে। মীরা ওর হাত টেনে ধরে বলল, 'কোথায় যাচ্ছো?'

সুনীল হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মিষ্টি করে হাসল। বলল, 'থানায়। দুটো খুনের দায়িত্ব নিজে নিয়ে আমাকে বাঁচাবার জন্যে মৃত্যুঞ্জয়দা হয়তো কাল সকালে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করবে। ওঁর আগে আমাকে যেতে হবে।'

সুনীল দরজা পেরোতে গিয়ে থামলো। মীরা দরজায় দাঁড়িয়ে। বাইরের দুর্যোগ কেটে গিয়ে একফালি চাঁদ উঠেছে নারকেলগাছের মাথায়। তারই ক্ষীণ আলো মীরার চিবুকে।

সুনীল গাঢ় গলায় বলল, 'যদি কখনও ফিরে আসি তাহলে আবার দেখা হবে। তোমাদের আমার মনে থাকবে।'

সুনীল বাগানের গেট পেরিয়ে রাস্তায় উঠে হাত নাড়ল তারপর আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মীরার মনে হল, সুনীল এতক্ষণ শুধু খুনের ভয় দেখিয়েছে কিন্তু খুন করতে পারেনি। এইবার সে সত্যিই খুন করে মৃতদেহ পেছনে রেখে হেঁটে গেল।

এখন এই লাশ বয়ে বেড়াতে হবে মীরাকে—যতদিন বাঁচবে ততদিন বুকের হিমঘরে লাশটা থেকে যাবে।

মীরা অন্ধকারেই চোখ বুজল। শুধু অন্ধকারই জানল, মীরার দু'চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

আমডাঙার পাকা পড়ক ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় নামতে হলে দীনুকে সাবধানী হতে হয়। দু হাতে ব্রেক চেপে প্যাডেল বন্ধ করে গাড়ির গতি কমিয়ে আস্তে আস্তে নামতে হয় নিচের ঢালু পথে। এখানের কাঁচা রাস্তাটাকে ঠিক রাস্তা বলা চলে না। গরুর গাড়ি চলে চলে নরম মাটিতে এমন কাণ্ড করে রেখেছে যে শয়তান আর দীনু ছাড়া আর কেউ এ রাস্তায় হড়হড়িয়ে গাড়ি নামাতে পারে না। গোটা গাঁয়ে দীনুর মতো রিকশাভ্যান আছে মোটে দুখানা। আছে বলা ভুল বরং বলা যায় ছিল। দীনুও মনে মনে বলে, 'হ্যাঁ ছ্যালো। দু'খানা সাইকেল রেকশো ছ্যালো। তা গেল বছর দোলের দিন সেই দু'খানার একখানা নরীর ধাক্কা খেয়ে মায়ের ভোগে গেল। বিপ্‌নের বড় তেজ ছ্যালো। সিগরেট টানতে টানতে গাড়ি চালাতো। দত্তবাবুদের গুদাম থেকে পাটের আটি বয়ে আনতো সদর হাটে। রোয়াব ছ্যালো বিপ্‌নের। তা সেই দোলের দিন দেদার তাড়ি খেয়ে রোয়াব মেরে গাড়ি চালাতে গিয়ে ঠিক এইখানটাতেই গাড়ি উলটে পড়লো ঠিক কোলা ব্যাঙের মতো। যেইমাত্র পড়া আর অমনি সদরের পাকা রাস্তা দিয়ে যমের বাহনের মতো ছুটে এল তাগড়াই লরীটা। ব্যাটা ড্রাইভার গাড়ি থামাবার আগেই বিপ্‌নে খতম। এরপর আর কেউ গাড়ি থামায় ? ভাঙাচোরা গাড়িটার সঙ্গে প্রায় কাদামাটির মতো থেতলে ছিল বিপ্‌নের শরীরটা। বেলচা দিয়ে লাশ তুলতে হয়েছে।

সেই থেকে দীনু সাবধান হয়ে গেছে। আগের মতো হড়হড়িয়ে নামা কিংবা প্যাডেল মেরে হুড়হাড় করে রাস্তায় আর উঠে আসে না। পাকা সড়কটাও ঠিক এই জায়গাটায় এমন করে বাঁক নিয়েছে যে পাঁচ দশ হাত দূরের কোন গাড়ি নজরে পড়ে না। ঘোষালদের

বাগানটা কলা বৌয়ের ঘোমটার মতো রাস্তার ওপর ঠিক ওই বাঁকের মাথায় এমন করে এগিয়ে এসেছে যাতে করে রাত বিরেতে আরও গণ্ডগোল লেগে যায়। এখন কাঁচা রাস্তায় নেমে ঘোষালদের বাগানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দীনু ভাবল, রোজই যেমন ভাবে, আজও ভাবল, শালা ট্যাঁকে পয়সা থাকলে বাগানটা কিনে নিতুম। বাবুদের ফুর্তি মারাবার জায়গা। আগে নাকি কোলকাতা থেকে মেয়েমানুষ ভাড়া করে এনে এখানে খ্যামটা নাচ হত। সেসব অনেককাল বন্ধ। এখন মাঝে মধ্যে বাবুদের ছেলেরা বন্ধুবান্ধব নিয়ে ছুটি ছাটায় আসে। সেও এক রকম ফুর্তি বলা যায়। বোতাম টিপে যন্ত্র থেকে গান বার করে আর তার সঙ্গে মাগীমদ্দ সবাই পাছা দুলিয়ে নাচে। এমন বেঢপ রাস্তায় বাবুদের মিনিবাস নামে না। তখন দীনুর রিকশা ভ্যানে চাপিয়ে আনতে হয় মুরগীর খাঁচা, মদের বোতলের পেটি আর বাবুদের খাবারদাবারের নানা সরঞ্জাম। একবার একটা বোতল চোখের পলকে ঝেড়ে দিয়েছিল দীনু। বাঁশবাগানের গর্তে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল। সন্ধ্যেবেলা বাড়ির দাওয়ায় বসে দাঁতে করে টেনে সেই বোতলের ছিপে খুলে পুরো বোতলটাই সাবাড় করে দিয়ে দেখেছিল তার একটুও নেশা হয়নি। জিনিসটাব নাম বীয়ার। পুরো বোতলেও দীনু বুঝতে পারল না সে আদৌ কিছু খেয়েছে কিনা। আধঘণ্টা বাদে কলকলিয়ে পেচ্ছাপ করার পর পেটের ভারটাও কমে গেল। এর চেয়ে তাড়ি কিংবা চোলাই ঢের ভাল।

বাড়ির দিকে ভ্যানটা ঘোরাতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যেতে হল দীনুকে। একটা কান্নার আওয়াজ আসছে দক্ষিণ দিক থেকে। মণ্ডলপাড়ার ভেতর থেকে কান্নাটা উঠছে। দীনু গাড়ির মুখ ফেরাল। তার মেজাজ খুশ হয়ে আসছে। গেল হপ্তা থেকেই আন্ত্রিক না তান্ত্রিক কী একটা ব্যামো ঢুকেছে মণ্ডলপাড়ায়। ব্যামো যত বাড়ে সদরের হাসপাতালে যাবার জন্য দীনুরও রেট বাড়ে ধাপে ধাপে। এমনিতে সদর হাসপাতাল পর্যন্ত গেলে তিন টাকার বেশি কোন

শালা দিতে চায় না। তাও আবার কত দরদস্তুর। এ সময় দরকষাকষির সময় নেই। হাসপাতাল মানেই পাঁচ টাকা। বাতবিরেত হলে আরও বেশি। যদি দাও তাহলে দীনু কাঁহার তৈবি, নইলে ঘরের দাওয়ায় শুয়ে শুয়ে আকাশের চাঁদ দেখতে দেখতে মায়ের ভোগে যাও।

রোজগারের গন্ধ পেয়ে দীনু মণ্ডলপাড়ার দিকে গাড়ি চালাতে লাগল। সারা দুপুর দমফাটা গরমের পর এখন মাঝে মধ্যে হালকা বাতাস বইছে। গায়ে বাতাস লাগলে ঘামটা শুকিয়ে আসার সময় বেশ আরাম লাগে। দীনু ভেবেছিল বাড়ি ফিরে পুকুরে চান করবে। কিন্তু চান এখন তোলা থাক। আট টাকার একটা দাঁও মারার লাভে সে প্যাডেলে চাপ দিল। যেতে চাইলেই কী আর তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। রাস্তা তো নয় যেন আমডাঙার চষা ক্ষেত। ভ্যানের চাকা কেতরে কেতরে যায়। মণ্ডলপাড়ার ভেতরে ঢোকবার আগেই সে বুঝে গেল তার আন্দাজ মিথ্যে নয়। হ্যারিকেন নিয়ে লোক বেরিয়েছে তাকে খুঁজতেই। দীনু অন্ধকারে ঘন্টি বাজাতেই হ্যারিকেনটা একটু উঁচুতে তুলে কেউ একজন বলল, 'কে দীনু না?'

দীনু গলার স্বর ক্লান্ত আর কাতর করে বলল, 'হ্যাঁ, তো দীনুই বটে।' লোকটি ব্যগ্র গলায় এবং ক্ষিপ্র গতিতে গাড়ির কাছে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, 'আমি তোর খোঁজেই যাচ্ছিলাম বাবা। একটিবার ঘরে আয়। মেয়েটা আমার এ্যাখন ত্যাখন অবস্থা।

দীনু অতি ঘোড়েল মাল। সে জানে এই মওকায় ঝট করে রেট বাড়িয়ে দিতে না পারলে কেউ আর কোনদিন কস্মিনকালেও চার আনা পয়সা বেশি দেবে না। দয়াধম্ম দেখাতে গেলে পরনের ন্যাতা জোটে না। নিজের বাপ ধম্ম করতে গিয়ে জমিজমা সব খুইয়ে বসে আছে। দয়াধম্ম হচ্ছে কিনা নেবুর জলের মতো। গুরুপাক ভোজনের পর তারিয়ে তারিয়ে খেতে ভাল লাগে। খালি পেটে

লেবুপানি সইবে কেন। অতএব দীনু কাঁহার তার গলার স্বরে বিষম ক্লান্তি ফুটিয়ে বলল, 'আমি যে এখন ঘর যাচ্ছি। সারাদিন কুটোটি দাঁতে কাটিনি। পেটে খিচ ধরে আসছে। রোদে পুড়ে পুড়ে মাথাও চক্কর মারছে। অ্যাখনি আমি গাড়ি টানতে পারবুনি।'

লোকটা এগিয়ে এসেছে গাড়ির কাছে। সাইকেল ভ্যানের কাঠের পাটাতনের ওপর হ্যারিকেন রেখে দীনুর হাতটা চেপে ধরে বলল, 'দোহাই বাপ। তুই না গেলে মেয়েটা বিনা চিকিৎসেতে ঘরে পড়ে মরবে। একটু দয়া কর দীনু। তোর কষ্ট আমি পুষিয়ে দেব।'

লোকটার গলা থরথর করে কেঁপে উঠল। দীনু মনে মনে বলল, 'বাছাধন পথে এসো। তুমি শালা দাশরথি মণ্ডল। বুড়ো বয়সে নাগর সেজে তিনবার বে করেছ। একবার বারোয়ারির অষ্টমীতে আমাকে খিঁচুড়ি খাবার আসন থেকে তুলে দিয়ে বলেছিলে, তোদের জন্যে পাত পেড়ে খাবার ব্যবস্থা হয়নি। কলাপাতা নিয়ে আয় তাতে পেসাদ নিয়ে যা। সেদিন আমার দশ বছরের বোবা মেয়েটার চোখ নিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিলো। সেই জল তোমার চোখে পড়েনি। এখন আমায় বাপ বলছ। তা বলছ বল। আমিও তোমার মতো বাপের কাজ করে যাব।'

দীনু দাশরথিকে শুনিয়ে লম্বা করে একটা শ্বাস ফেলল। কাতর গলায় বলল, 'শরীঃ আর বইছে না গো। কুচকিতে আবার একটা বিষফোঁড়া,—পা চালালেই মনে হয় প্রাণখান বেইরে যাবে।'

দাশরথির গলা আরও কাতর হল। দীনুর ঘামে ভেজা পিঠে হাত রেখে বলল, 'তোকে পুষিয়ে দেব দীনু, পুষিয়ে দেব।'

দীনু ক্লান্ত গলায় বলল, 'চলেন, কী আর করা। একই গাঁয়ে থাকি। বিপদে তো যেতেই হবে।'

দাশরথি হ্যারিকেন নিয়ে দীনুর পাশে পাশে হাঁটে। দীনু গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করে, 'কত দিবেন মনস্ত করিছেন?'

দাশরথি চলতে চলতেই জবাব দেয়, 'এখন কী দামাদামির সময়।

তুই যা চাস।'

দীনু প্যাডেলে জোর করে একটা চাপ দিয়ে দাশরথির দিকে তাকাল। হ্যারিকেনের আলোয় খুব ভাল করে মুখটা দেখা যাচ্ছে না। দীনু গলায় আক্ষেপ ফুটিয়ে বলল, 'এ সময় কী আর চাইবো। গাঁয়ের ব্যাপার। আপনি বলেই এলাম। যতক্ষণ কলিজায় পেরাণ আছে ততক্ষণ তো আর চোখ বুজে থাকতে পারিনে। খান পনেরো টাকা দিবেন।'

চলতে চলতেই দাশরথি ধমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। হ্যারিকেনটা দীনুর মুখের কাছে তুলে ধরে অবাক গলায় শুধোয়, 'বলিস কি! পনেরো টাকা।'

দীনু চোখ সরিয়ে নিয়ে মনে মনে বলে, 'শালা, ঘরে মেয়ে মরতে বসেছে এখনও হিসেব ভুল হচ্ছে না। আবার বলে, পুষিয়ে দেব। বন্দকী কারবার করে মালকড়ি তো নেহাৎ কম হড়কাও নি। এখন মেয়ের জন্যে একটু বেশি ছাড়লে কলজে শুকিয়ে ওঠে কেন?'

দীনু এসব ব্যাপারে দয়াধম্মে বিশ্বাস করে না। সে খচ্ করে গাড়ি থামিয়ে দিয়ে বলে, 'তাহলে ঘর যাই। পেটে বড্ড খিচ্নি মারছে। সারাদিনে তো কম রুগী বইনি। শরীরে জুত নেই।'

দাশরথি ব্যস্ত হয়ে দীনুর হাত চেপে ধরে বলল, 'দেব, পনেরোই দেব। তবু তুই আয়।'

দাশরথি দাঁতে দাঁত চেপে হাঁটতে হাঁটতে ভাবল, মেয়েটা একবার বেঁচে ফিরুক। তারপর তোর রমজানি আমি বার করছি।'

দীনু বুঝতে পারে দাশরথি বেকায়দায় ফেঁসে গিয়ে পনেরো টাকায় রাজী হয়ে গেল। মনে মনে নির্ঘাৎ দীনুর বাপচোদ্দ পুরুষ তুলে শাপশাপান্ত করছে। কিন্তু তাতে দীনুর বয়েই গেছে। কৈবর্তপাড়ার মাসি বলে, দীনুটা একটা শয়তান। শরীরে দয়ামায়া নেই। গাড়ি থেকে মরা নামিয়ে দিয়েই বলে, কাঁদবার আগে আমার ভাড়া মিটিয়ে দাও। ভাড়া দিয়ে তারপর গলা ছেড়ে সারাদিন কাঁদো।' দীনু নিজেও জানে তার ভেতরে একটা শয়তান

আছে। সেটা মাঝেমধ্যে যখন জেগে ওঠে তখন চোষকাগজের মতো শরীরের সব মায়ামমতা দয়াধম্ম শুষে নেয়। শয়তানটাকে কখনও কখনও তার ভালো লাগে। তার বাপের মধ্যে কোন শয়তান ছিল না বলে সে ঠকেছে। দীনু ঠকতে চায় না। ভগবানের চাইতে শয়তানই তার ঢের আপন। ভগবান তাকে কিচ্ছু দেয়নি। দিতে পারেনি। জোতজমি বেহাৎ হয়েছে। গোখরোর ছোবলে বারো বছরের ছেলেটা গেছে। একটা মাত্র মেয়ে কিন্তু সেও জন্ম থেকে বোবা। বৌটা বারো মাস রোগে ভোগে। এই তো তার কপাল—তার ভগবানের বিধান। তার চেয়ে শয়তান ভালো। সে ভেতরে ভেতরে দীনুকে জেদি করে তোলে। সে শেখায় কখন কেমন করে মানুষকে নিঙড়ে নিতে হয়। এই যেমন এখন সে নিঙড়ে নিচ্ছে দাশরথি মণ্ডলকে। তার ভেতরে শয়তান আছে বলেই পারছে। ভগবান থাকলে কি পারতো!

দাশরথির দাওয়ায় তখন পাড়াপড়শীদের ভিড়। দীনুকে দেখতে পেয়ে সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দাশরথি এগিয়ে গিয়ে বৌকে ডাকল, 'দেরি করো না গাড়ি এসে গেছে।'

দীনু গাড়িটাকে টেনে নিয়ে দাঁড় করালো বারান্দার সামনে। কাঠের পাটাতনের ওপর এবার বিছানা পাততে হবে। এসব কাজ ঝটপট করতে পারে দীনু। মেয়েটাকে তোলবার সময় দীনু দাশরথির তৃতীয় পক্ষের বৌটাকে একবার ভালো করে দেখে দিল। আগেও বার কয়েক দেখেছে কিন্তু সে দূর থেকে। কোন দরকার ছিল না তবু দীনু হাত বাড়িয়ে তোষকটা নিতে গিয়ে খানিকটা ইচ্ছে করেই বাঁ হাতের কনুই দিয়ে দাশরথির বৌয়ের বুকের কাছটায় একটা খোঁচা দিল। দীনু জানে, এখন এসব ব্যাপার নিয়ে কেউ কথা তুলবে না। এখন সবাই ব্যস্ত আর ব্যগ্র মেয়েটাকে নিয়ে। এসময় কারো মাথায় কুমতলব আসে? দীনুর কিন্তু এসে যায়। বারুণীর স্নানে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে সবাই পুণ্য করে। দীনুর পুণ্যে অত আগ্রহ নেই। সওয়ারী নামিয়ে দিয়ে সে গঙ্গার ঘাটের

কাছটায় ঘাপটি মেরে বসে বসে মেয়েদের স্নান দেখে। গঙ্গা স্নানে পুণ্য হয় বলে কাপড় চোপড়ের দিকে অত খেয়াল রাখে না কেউ। যুবতী বৌগুলো বেসামাল হয়ে স্নান করে। তারপর ভিজে কাপড়ে যখন ছপ ছপ শব্দ তুলে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসে তখন শরীরের সঙ্গে লেপটে থাকা সেই কাপড় আর তলা থেকে ফুটে বেরুনো শরীর দেখতে দীনুর খুব ভাল লাগে। কোন পাপটাপের কথা তার মনে হয় না। দাশরথির বৌটা দেখতে জব্বর জিনিস। ভিটে মাটি বন্দক দিয়ে বাপটা দেউলে হয়ে যাচ্ছিল। তখন বাপ কচি মেয়েটাকে এই হুলো হুমদোটার কাছে বে দিয়ে ভিটেমাটি ছাড়ায়। মোদ্দা কথা মেয়ে বন্দক দিয়ে বাস্তুভিটে ছাড়িয়ে নেওয়া আর কি! তিন কুড়ি বয়স পেরিয়ে এসে সেই হুমদো এখন কচি মেয়েটাকে বৌ বৌ বলে ডাকছে। জেনে বুঝে সেই বৌয়ের বুকে কনুয়ের খোঁচা দিলে পাপ হবে কেন? দাশরথির বৌ সেজে সংসারের চাবি আঁচলে বেঁধেছে বটে, কিন্তু ওদিকে মাঝ দুপুরে পিরীত চালাচ্ছে গাঁয়ের মাস্টারের সঙ্গে। দীনুর কাছে গায়ের কোন বেত্তান্ত অজানা নয়।

রিকশা ভ্যানে মেয়েটাকে শুইয়ে দেওয়া হয়ে যাবার পর দাশরথি বলল, 'বাবা, দেখেশুনে চালাস।'

দীনু অভয় দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না। একেবারে পেট্রোল গাড়ির মতো গড় গড় করে নিয়ে যাবো।'

কথাটা শেষ করেই দীনু গলা নামিয়ে দাশরথিকে বলল, 'তা আমারটা দিয়ে দিন।'

দাশরথি অবাক হওয়ার চাইতে বিরক্ত হল বেশি। বলল, 'এখনই চাই?'

দীনু সরল গলায় উত্তর দিল, 'এর আবার অ্যাখন ত্যাখন কি! মিটিয়ে দেয়াই তো নিয়ম।'

নিজের সাইকেলে ওঠবার আগে দাশরথি পকেট থেকে দীনুকে টাকাটা দিয়ে বলল 'পনেরই দিলাম।'

দীনু কথাটার কোন জবাব দেওয়ার দরকার মনে করল না। সে গাড়ি টানতে আরম্ভ করল।

হাসপাতালে মেয়েটাকে নামিয়ে দিয়ে দীনু যা করে সেই কাজটা আগে সেরে ফেলল। ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে বুঝে নিতে চাইল মেয়েটা আজকের রাত টিকে যাবে নাকি ঘণ্টাখানেক বারান্দায় বসলে লাশ নিয়ে ফেরা যাবে। তাহলে ফিরতি পথেও নিদেন পক্ষে আরও দশ-পনেরো রোজগার হয়ে যায়। কিন্তু সে রকম কোন সম্ভাবনা না থাকায় দীনু বাড়ি ফিরে এলো প্রায় মাঝরাত্তিরে। উঠোনে চাটাই পেতে বৌটা ঘুমিয়ে পড়েছে। মেয়েটা রিকশার শব্দে উঠে বসল। হ্যারিকেনের আলোটা বাড়িয়ে নেমে এল বাপের কাছে। দীনু এই একটা জায়গায় বড় দুর্বল। মেয়েটা কথা বলতে পারে না। ওর চোখের দিকে তাকালে দীনুর বুকের মধ্যে খচ খচ করে। ওর গভীর চোখে মেটে অন্ধকার। আতুড়ে সাধ করে ওর নাম রেখেছিল জবা। জবা সব বুঝতে পারে, দেখতে পায়, শুধু বাপের বুকের ভেতরটা ছাড়া। শয়তানের থাবা বাঁচিয়ে এখনও একটু জায়গা দীনু রেখে দিয়েছে তার বোবা মেয়েটার জন্য। জবা জলের বালতি আর গামছা এগিয়ে দেয়। দীনু মুখ হাত ধুয়ে ঘরে যায়। জবা মাকে ধাক্কা দিয়ে তোলে।

দীনু খেতে খেতে মেয়ের দিয়ে তাকায়। ওর চোখে ঘুমের চিহ্ন নেই। মেয়েটা বোধ হয় অনেক রাত এঁকা একা জেগে থাকে। মনে মনে হয়তো কথা বলে।

দীনু খাওয়া শেষ করে বারান্দায় বসে বিড়ি ধরাচ্ছিগ। বৌ এসে ওর পাশে বসল।

দীনু জানে এখন কোন কথাটা তার বৌ বলবে। মাঝরাত্তিরে দাওয়ায় বসে পিরীত করার মতো বৌ তার নয়। বৌ ছোট করে একটা হাই তুলে বলল, 'ছেলেটার বাপের সঙ্গে কথা কয়েছো?'

বিড়িতে টান দিয়ে দীনু বলল, 'বোবা মেয়ে পার করা অত সহজ নয়। দেদার টাকা চাইছে।'

অসহায় গলায় বৌ প্রশ্ন করে, 'কত ?'

দীনু মনে মনে বিরক্ত হয়। বিরক্ত গলাতেই বলে, 'শুনে কী করবি। অত টাকা তোর বাপও দেখেনি, আমার বাওপ দেখেনি।'

গলায় আর্তি তুলে বৌ বলে, 'তাহলে ?'

দীনু হাই তুলে বলে, 'তাহলে আর কী। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। বেদেডাঙায় একটা সন্ধান পেয়েছি। ছেলেটা ইটভাটায় কাজ করে।'

দীনুর বৌয়ের গলায় স্তিমিত উৎসাহ আবার ঝিলিক দিয়ে ওঠে। স্বামীর পিঠে হাত রেখে বলে, 'জবার বেত্তান্ত জানে ?'

শেষ হয়ে আসা বিড়িটা উঠোনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দীনু বলে, 'বেত্তান্ত আর এমন কী মহাভায়ত। গোটা গা জানে দীনু কাঁহারের মেয়ে বোবা। ওরাও জানে। জানে বলেই গলায় পা দিয়ে বায়না ধরেছে।'

বৌয়ের উৎসাহ নিভে এলো। অন্ধকার আকাশের দিকে চোখ রেখে উদাস গলায় বলল, 'ওরা কত ট্যাকা চাইছে ?'

দীনু কোমরের লুঙ্গি আলগা করতে করতে বলল, 'চশমখোর বাপটা বলছে হাজার টাকা লগদ দিতেই হবে। আর ছেলেটা চাইছে একখানা সইকেল। এই দুইয়ে মিলে তোর আঠারোশো টাকা লাগবে। তার ওপর আরও খরচ যোগ করলে দাঁড়াবে পেরায় তিনহাজার টাকা।'

দীনুর বৌ অস্ফুটে আহত গলায় বলে, 'এত টাকা ? কোথায় পাবে গো ?'

দীনু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'পেতে হবে। টাকা নেই বলে তো মেয়েডারে ঘরে রাখতে পারব না। টাকার উপায় বার করতে হবে। সেই উপায়ের তক্কে তক্কে আছি।'

দীনু চাপা গলায় কথাটা এমন হিংস্রভাবে বলল, যে তার বৌয়ের গা শিউরে উঠল। সে স্বামীর কাঁধে ধাক্কা দিয়ে ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'তুমি কি চুরি-ডাকাতির মতলব করছো নাকি।

তাহলে কিন্তু আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।'

দীনু বৌকে ধমক দিয়ে বলল, 'ধ্যাৎ, যা বুঝিস না তাই নিয়ে কথা কইতে আসিস না। চুরি করলে তো শালা কবেই দাশরথির দোকান ভেঙে ফেলতাম। আমি আছি অন্য ধান্ধায়।'

দীনুর বৌয়ের ভয় গেল না। সে স্বামীকে অবিশ্বাসের চোখে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, 'কিসের ধান্ধা?'

দীনু আরেকটা বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলল, 'বেওয়ারিস বুঝিস?'

দীনুর বৌ বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকিয়ে বলল, 'সেটা কী জিনিস গো?'

'যে মালের কোন মালিক নেই। ধর, পুকুরঘাটে চান করতে গিয়ে দেখলি ঘাটের রানায় এক খণ্ড সাবান পড়ে আছে। কার সাবান কে জানে! তুই সেটা তুলে নিয়ে এলি। তাতে কোন দোষ হোল?'

দীনুর বৌ মাথা নাড়ল। বাইরে আলোর তেজ না থাকায় স্বামীর মুখটা ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না। বুঝতে পারছিল না, তার স্বামী ঠিক কী বোঝাতে চাইছে। দীনু বিড়িতে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'ঠিক তেমনই মানুষও বেওয়ারিস হয়। সাতকুলে কেউ নেই, কিংবা ধর রাস্তার কোন ভিখেরি, লোকটা মরে গেল। তখন ওর লাশটা হবে বেওয়ারিস।'

দীনুর বৌয়ের মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। সে বলল, 'তাতে তোমার কী লাভ হবে?'

দীনু নিজের মনেই হাসতে হাসতে বলল, 'তেমন একটা বেওয়ারিস লাশ হাতাতে পারলে বুঝবি কত লাভ। আমার লোক ঠিক করা আছে। লাশ দিলেই হাতেহাতে টাকা।'

দীনুর বৌ আঁতকে ওঠে। বলে, 'ওমন কাজ তুমি করো না। ওতে অধম্ম হবে। পরকালে কষ্ট পাবে।'

দীনু মুখ ভেংচে বলে, 'শালা একালের কষ্ট সামলাতেই প্রাণ যায় তো পরকাল। একালেও কষ্ট, পরকালেও কষ্ট। আমার ওতে

কিছু যায় আসে না।'

দীন্নুর বৌ আর কথা বলতে পারে না। ভয়ে তার বুক কাঁপতে থাকে। এই গোয়ার লোকটাকে তার বেজায় ভয়। জেদ করলে যা খুশি তাই করতে পারে। পাড়ার লোক তার স্বামীকে ডাকে 'শয়তান' বলে। দীন্নুর বৌয়ের কখনও কখনও মনে হয় খুব একটা খারাপ বোধ হয় বলে না। লোকটার অতবড় শরীরের মধ্যে মনটাকে মাঝে মাঝে খুঁজে পায় না দীন্নুর বৌ। বৌ ঘরে যাবার আগে বলে যায়, 'আমার নামে দিব্যি দেওয়া রইল। তুমি ওসব ধান্ধায় মেতে থেকো না। তাতে অধম্ম হবে।'

দীন্নু কোন কথা বলল না। চাটাইয়ের ওপর শুয়ে পড়ে অন্ধকার আকাশের দিকে চোখ রেখে সে ভাবতে লাগল, নিজের ধম্ম নিজের কাছে। বেওয়ারিস লাশ তুলে দিয়ে যদি এক ক্ষেপে তিন চারশো টাকা পাওয়া যায় তাহলে সেই মওকা ছাড়ে কোন শালা। মরে গেলে সেই মানুষের কোন জাত থাকে না। তার ছাল ছাড়িয়ে হাড় বিক্রি করে যদি কেউ পেট চালায় তাতে মরা মানুষটার আর কী ক্ষতি। দালাল গোছের লোকটা তাকে অবশ্য বলেছে রূপনারাণের কাছে একটা জায়গা আছে সেখানে বড় বড় কড়াইতে মরা মানুষ সেদ্ধ করা হয়। তারপর হাতা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মাংস ছাড়িয়ে শুধু হাড়গুলো বার করে নেওয়া হয়। জ্যান্ত মানুষের চাইতে মরা মানুষের দাম নেহাৎ কম নয়। তেমন তেমন মওকা পেলে নাকি দেড় দুহাজারও মিলে যেতে পারে।

কিন্তু তেমন মওকা দীন্নুর কাছে আসে না। হাটেঘাটে কত লোক মরে অথচ কেউ বেওয়ারিস হয় না। লাশ নেবার যোগ্য দাবীদার ঠিক জুটে যায়। বেদে ডাঙার হাটে বসে ভিক্ষে করতো একটা লোক। দীন্নু তার নাম জানে না। তার সাতকুলে কেউ আছে বলে দীন্নুর মনে হয়নি। লোকটা শুয়ে থাকতো চণ্ডীতলার চালাঘরে। হেগেমুতে হেজে গিয়ে লোকটা ওখানেই মরে যেতে বসেছিল। খবর পেয়ে দীন্নু তার গাড়ি নিয়ে শকুনের

মতো উড়ে গেল চণ্ডীতলায়। লোকটার তখন শ্বাস উঠেছে। চোখ ঠিকরে বেরুচ্ছে কোটর থেকে। দীনু লোকটাকে নিজের গাড়িতে তুলে নিল। ওর হয়ে ভাড়া দেবার কেউ ছিল না। কিন্তু দীনু তখন ভাড়ার কথা ভাবছিল না। তার মনে হয়েছিল হাতের কাছে মওকা এসে গেছে। লোকটার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল। কিন্তু দীনু সেসব খেয়ালের মধ্যে আনল না। যারা ভিড় করে দীনুর এই কাণ্ড দেখছিল তারা দীনুকে ধন্য ধন্য করল। দীনু লোকটাকে সাইকেল রিকশার ওপর তুলে দিয়ে মনে মনে ভাবল, দীনু অত বোকা নয়। দয়াধম্ম করতে দীনুর এখানে আসতে বয়ে গেছে। লোকটা মরে গেলেই লাশটা বেওয়ারিস হয়ে যাবে। তিন চারশো টাকার একটা সওদা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে দীনু। এতে কোন দয়াধম্ম নেই।

লোকটা হাসপাতালে পৌঁছবার আগেই মরে গেল। মরা লোককে ভর্তি করাবার দরকার নেই। দীনু খোশ মেজাজে লাশটা আবার সাইকেল রিকশায় তুলতে যাবার কথা ভাবছে ঠিক তখনই কোত্থেকে ওই ভিখেরিটার একটা ভাগ্নে এসে জুটলো। ভাগ্নে একা নয়, সঙ্গে আরও কয়েকজন। দীনুর সাইকেল রিকশায় না উঠে সেই লাশ উঠলো বাঁশের মাচায়। আপসোসে আর আক্ষেপে মনটা বিষিয়ে গেল দীনুর। ভাগ্নে এসে দীনুকে অনেক ভালো ভালো কথা বলল। দীনুর মতো মানুষ নাকি সে দেখেনি। এই সব ভালো কথায় দীনুর মন ভালো হবার নয়। তার ইচ্ছে হচ্ছিল গলা খুলে খিস্তি করে। কিন্তু পারল না। হাতের নাগালের মধ্যে এসেও মওকাটা ফসকে গেল দীনুর।

মাঝ দুপুরে দীনু গাড়ি চালিয়ে এসে বেদেডাঙার মোড়ে দাঁড়াল। একটু জিরেন চাই। এখান থেকে ইটভাটার চিমনিটা দেখা যায়। ছেলেটা ওই ভাটায় কাজ করে। সামনের শ্রাবণে ওরই সঙ্গে জবার বিয়েটা হয়ে যেতে পারত যদি—

দীনু ঢোঁক গেলে। তার মন এলোমেলো হয়ে যায়। বুকের মধ্যে খ্যাপা হাওয়ার মতো একটা অস্থির দাপাদাপি শুরু হয়। গায়ে

গতরে খেটে চারশো টাকা মাত্র জমাতে পেরেছে। এখনও দেদার টাকার দরকার। দীনু আস্তে আস্তে আবার প্যাডালে চাপ দেয়। গাড়ি নিয়ে এসে দাঁড়ায় সেই দোকানটার সামনে। পরেশের বাপের দোকান। পরেশ এখন ইঁটভাটার কাজে গেছে। বাপ দোকানে বসে চা বানাচ্ছে। দীনুকে দেখে পরেশের বাপ চোখ তুলে তাকাল। দীনু এই তাকানোর মানে বোঝে। লোকটার নাম নিকুঞ্জ। গলায় কণ্ঠির মালা ঝুলিয়ে বকধার্মিকের মতো দোকানে বসে থাকে। কেষ্টঠাকুর আর টাকা দুটোই খুব ভাল চেনে। দীনু হাত জোড় করে নমস্কার করল। দীনু একবার নমস্কার করলে নিকুঞ্জ দুবার করে। কাঁঠালের রসের মতো বিনয় আর ভক্তি যেন গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে। দীনু কিছু বলতে যাবার আগে নিকুঞ্জ বলে, 'ঠাকুরের ইচ্ছেয় কথা যখন দিয়েছি তখন কাজটা তো করে যেতে হবে। শ্রাবণ তো এসে গেল। টাকা, সাইকেল এসবের কি ব্যবস্থা হল?'

দীনু মনে মনে ঘাবড়ায়। মুখে বলে, 'হয়ে যাবে কর্তামশাই হয়ে যাবে।'

নিকুঞ্জ চা বানিয়ে নিজেই চুমুক দেয়। এক চুমুক খাবার পর বলে, 'চা খাবে নাকি হে।'

দীনু মনে মনে বলে, শালা। কিন্তু মুখে বলে, 'না, এই তো খেয়ে এলাম।'

নিকুঞ্জ দুঢোক চা খেয়ে বলে, 'তোমার কথায় ভরসা করতে পারছি কই। নগদ টাকার অর্ধেক কিস্তিটাও দিলে না। এখনও বলছ হয়ে যাবে। কেমন করে হবে কে জানে। আমায় বাপু ঝুলিয়ে রেখো না। না পারলে বলে দাও।'

দীনুর মাথায় হঠাৎ জেদ চেপে যায়। নিকুঞ্জর হাত চেপে ধরে বলে, 'আপনি দিন ছাখেন। আমি আসছে হপ্তায় টাকা নিয়ে আসবো।'

বাড়ি ফিরে দীনু ঠিক করে ফেলে ভিটের জমিটুকু বেচে দেবে। বৌ বোঝায়, 'তুমি ওমন কাজ করো না। থাকবো কোথায়? কে

থাকবার জায়গা দেবে।'

দীনু বোঝে না। জবা ছল ছল চোখে সব শোনে। বুঝতে পারে তাকে নিয়ে বাপে আর মায়ে একটা গণ্ডগোল বেঁধেছে। কিন্তু দীনুর জেদ কমে না। দীনুর বৌয়ের মুখ শুকিয়ে যায়। গলা থেকে শব্দ বেরুতে চায় না। সে জানে দীনুর গোঁ বড্ড শক্ত গোঁ। তার বুকের মধ্যে সর্বনাশের ঝড় বইতে থাকে।

শেষ রাত্তিরে দীনু যখন ঘুমিয়ে কাদা হয়ে আছে তখন তার ঘুম ভাঙালো জবা। বাপের বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বাপকে ধাক্কা দিচ্ছে। তার চোখ ভয়ে আর উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। কথা বলতে পারে না বটে, গলা দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ বার করতে পারে। সেই আওয়াজ এখন কান্নার চাইতেও করুণ শোনাচ্ছে।

দীনু উঠে বসল। মেয়ের মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বুঝতে চাইল ব্যাপারটা কি। জবা আঙুল দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখাচ্ছে। ঘরের মধ্যে থেকে গোঙানির আওয়াজ এলো। দীনু ভেতরে এসে দেখল তার বৌ মেঝেতে বমি করে নেতিয়ে পড়ে আছে। দুহাতে পেট খামচে ধরে অসহায় চোখ তুলে সে একবার স্বামীর দিকে তাকালো।

দীনু উবু হয়ে বসে বলল, 'কী হল তোর ?'

দীনুর বৌ কাতরাতে কাতরাতে উত্তর দিল, 'ব্যামোয় ধরেছে। মাঝরাত থেকে শুরু। এখন আর পারছি নে গো।'

এই রোগের লক্ষণ দীনুর অচেনা নয়। দীনু দড়ির ওপর থেকে গামছাটা নিয়ে মাথায় বাঁধল। তারপর বলল, 'চল হাসপাতালে যাই।'

দেড়দিন পর এক সকালে দীনুর বৌ মরল। যেমন একটা ভোরে সে হাসপাতালে এসেছিল, তেমনই একটা নরম সকালে দীনুর বৌয়ের লাশ এনে তোলা হোল দীনুরই রিকশা ভ্যানে। দীনুর চারপাশে তখন পাখি ডাকছে। পাকুড় গাছের মাথায় সকাল বেলার ঝিরঝিরে হাওয়া লেগে মিহি শব্দ ছড়াচ্ছে পাতায় পাতায়।

সকালবেলার সেই নরম আলোতে দীনু তার মরা বৌয়ের দিকে একবার তাকালো। তারপর নিজের মাথার গামছা খুলে বৌয়ের মাথার বালিশ বানিয়ে দিয়ে শরীরটাকে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধল। তার বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। শরীরটা অসাড় মনে হচ্ছিল। সিটের ওপর বসে প্যাডেলে চাপ দিল। গাড়ি চলতে লাগল ধীরে ধীরে।

হাসপাতালের সীমানা ছাড়িয়ে পাকা সড়কে পড়ে দীনু হঠাৎ গাড়ি থামাল। এক মিনিট, দু মিনিট—দীনু ভেবে যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে তার চোয়াল শক্ত হোল। হাতের শিরা ফুলে উঠল। সে গাড়ির মুখ অন্যদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে ভাবল, এই দুনিয়ায় গরীব মানেই বেওয়ারিস। বেঁচে থাকতেই যার কেউ নেই, মরে গেলে তার জন্যে মরাকান্না কাঁদবার দরকার কী। চিতায় তুলে পোড়ালে সেটা তার বৌ দেখতে আসবে না। পেটে কিল মেরে ধম্ম করতে পারে না। তার চাইতে মরা বৌয়ের শরীরের হাড়গুলো অন্যের কাজে লাগুক। বিনিময়ে যদি পাঁচ সাতশো টাকা বাগাতে পারে দীনু তাহলে কালই নিকুঞ্জকে পাঁচশো টাকা দিয়ে আসা যাবে! বাকী টাকার জন্যে তো ভিটেটুকু রইল। মেয়েটার হিল্লে হয়ে গেলে দীনুর বুকের ওপর থেকে বিষম ভারটা নেবে যাবে। তার বৌটা বুদ্ধি ধরে বটে। ঠিক মোক্ষম সময়ে মরে তার সমস্যাটা হালকা করে দিয়ে গেছে। বোবা মেয়েটার একটা গতি করতে পারার সুখে দীনু এখন সব ভুলে যেতে পারছে। এক টুকরো সুখের স্বপ্নে দীনু তার শোক অথবা দুঃখ, তার শয়তান মন আর তার বৌ কোন কিছুকেই আমল দিল না। সে জানে তার বৌয়ের শরীর থেকে মাংস ছাড়িয়ে হাড়গুলো বার করে নেওয়া হবে। তাহোক সেটা তার বৌ জানতেও পাবে না। তার বুকের মধ্যে একটা পেরেক বিধে যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু তার যন্ত্রণাটা সে টের পেতে চাইছে না। এখন তার মগজের মধ্যে শুধু একটা বোবা মেয়ের অসহায় চোখ ভেসে বেড়াচ্ছে। জবার বিয়ে হবে; বর হবে। জবা হয়তো একদিন মা হবে। দীনুর বুকের

মধ্যে বোলতার কামড়ের মতো গভীর একটা কষ্টের পাশাপাশি ক্ষীণ অথচ তীক্ষ্ণ সুখের একটা দোতারাও বাজছিল। বেজে যাচ্ছিল।

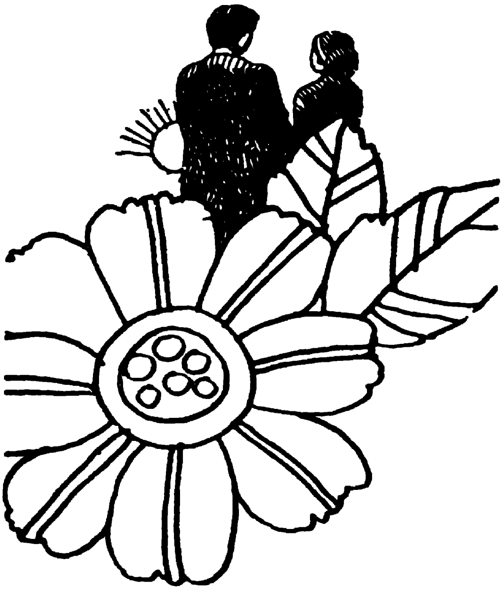
হঠাৎ সেই সুরটা কাটল। পেছন থেকে কেউ বুঝি তার নাম করে ডাকল। চোখ ঘোরাবার আগে দীনু দেখল তার দশ হাত দূরে সেই লোকটা, যে বেওয়ারিস লাশ কেনবার জন্যে পকেটে টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দীনু লোকটাকে দেখে হাসল। হেসে মুখ ফেরাল পেছনে। যেদিক থেকে ডাকটা এসেছে।

পেছন ফিরেই দীনুর বুকের রক্ত পাক দিয়ে উঠে সহসা হিম হয়ে যেতে লাগল। চষা ক্ষেতের ওপর দিয়ে দৌড়ে আসছে জবা, তার পেছনে তারই গায়ের একটা ছেলে। দীনু প্যাডেলে চাপ দিতে ভুলে গেল। তার হাত শিথিল হয়ে এল। রিকশা ভ্যানটা নিজের খেয়ালে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে জামগাছের গুড়িতে ধাক্কা মেরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সিটের ওপর থেকে নেমে আসবার আগেই জবা এসে দাঁড়াল তার সামনে। ওর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। সেই চোখে কী ছিল সেকথা দীনু জানে না, বুঝতে পারে না, শুধু টের পায় তার বুকের ভেতরের শয়তানটা মাথা নিচু করে মুখ ঢাকছে।

জবা তার মার মুখের দিকে তাকাল। দূরে দাঁড়ান ওই লোক-টাকেও দেখল। কী বুঝল কে জানে। তারপর ভেজা চোখ তুলে বাপের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালো যাতে দীনুর মনে হল জন্ম থেকে যে মেয়েটা কথা বলতে পারেনি সেই মেয়েটার দুই চোখে এখন অজস্র কথা তীব্র ঘৃণার মূর্তি ধরে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

দীনু সহ্য করতে না পেরে চোখ বুজে ফেলল। তার মনে হল তারই বৌয়ের আত্মা এখন যেন মেয়ের শরীরে ঢুকে তার দিকে তাকিয়ে আছে।



উপন্যাসোপম কাহিনী

দিব্যেন্দুর দিনরাত্রি

আমার নাম দিব্যেন্দু। দিব্যেন্দু সরকাব। '২৮-এ বি. এ পাশ করার পর যথারীতি বেকার ছিলাম, '২২-র মারচ মাসে অনেক কাঠ এবং অজস্র খড় পোড়ানোর পর, ইহজগতে যত মামা, মেসো, পিসে এবং সরকারী ও বেসরকারী কর্তাব্যক্তিরা আছেন, যাঁরা কোন না কোন সূত্রে আমার আত্মীয় তাঁদের সকলকে ধরাধরি করতে করতে একটা চাকরী পেয়ে যাই। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত লিখি, হপ্তা তিনেক বাদে ইণ্টারভিউ-এর চিঠি আসে। চাকরীটা নেহাৎই কেরাণীগিরি তবুও রাত জেগে পরীক্ষার পড়া মুখস্ত করার মতো দিনতিনেক বিস্তর পড়াশোনা করি। ওটা যতটা না নিজের তাগিদে, তার চাইতে বেশি অবুঝ মা আর আমার সবজান্তা বাবার মনরক্ষার জন্যে করতে হয়। আমার মা'র ধারণা তার ছেলে অতিশয় বুদ্ধিমান এবং যেকোন চাকরী পাওয়ার উপযুক্ত, আর বাবার ধারণা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। পশ্চিমবঙ্গের দশজন নির্বোধ বা ইডিয়টের নামের তালিকা করতে দিলে আমার বাবা সেই তালিকায় প্রথমেই তার মেজছেলের নামটি লিখবেন। মা এবং বাবা এর মধ্যে কার ধারণাটা সঠিক সেটা আমি জানিনা। জীবনে দশটি ইণ্টারভিউতে ব্যর্থ হবার পর এই একাদশ ইণ্টারভিউটিতে আমি কেমন করে যেন উতরে যাই। কেরাণীগিরির চাকরী, তবুও আমাকে যে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল অথবা যেসব প্রশ্ন করা হয়েছিল তার সঠিক উত্তর দেবার জন্যে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীকেও তিনজন সেক্রেটারীর সাহায্য নিতে হবে। অথচ আমি মন্ত্রীর চাকরী প্রার্থী ছিলাম না, নেহাৎই কেরাণীগিরি। ইণ্টারভিউ কেমন দিয়েছিলাম সেকথা বলে লাভ নেই। তবে চাকরীর আশা যে একেবারেই ছিলনা সেকথা আমি

দিব্যি গিলে বলতে পারি। অথচ আশ্চর্য, প্রায় মাস দেড়েক পরে, যখন আর দশটা ইণ্টারভিউ এর মতো ব্যাপারটা ভুলতে বসেছি তখনই আমার নিয়োগপত্র এল। এব্যাপারে কার কৃতিত্ব তা আমি জানিনা, কিন্তু চাকরীতে জয়েন করার পর জানলাম, ইহজগতে আমার যত মামা, মেসো, পিসেরা আছেন তাঁরা সকলেই এই চাকরীটার ব্যাপারে কৃতিত্বের দাবীদার। অর্থাৎ ওদের সুপারিশের জোরেই চাকরীটা পেয়ে গেছি, নিজের যোগ্যতায় নয়।

চাকরীটা অবশ্য খারাপ নয়। দিনে খানদশেক চিঠি টাইপ করা, কিছু ফাইলপত্র তৈরী করা আর পাঁচটা বাজলেই বেরিয়ে পড়া। মাস ফুরোলে সাতশো পঁচিশ টাকা বেতন। আমার যিনি বস্,' অর্থাৎ বড়বাবু তাঁর নাম বিনয়রঞ্জন মজুমদার, থাকেন গোয়াবাগানে। চেহারা যাই হোক, স্বভাবের সঙ্গে নামটা একেবারেই মানায় না। ঘনঘন পান খান, অনর্গল পিক ফেলেন, ফলে ওর ওয়েষ্টপেপার বক্সে পেপার সামান্য, ওটা রক্ষিত হয়ে থাকে পানের পিকে। উনি জীবনে কোন মুহূর্তে প্রাণখুলে হেসেছেন কিনা জানিনা, আমি এই ক'মাসের চাকরীতে ওঁকে একবারই শব্দ করে হাসতে দেখেছিলাম, যেদিন মোহনবাগান জিতেছিল। অন্যথায় ওঁর মুখে সর্বদাই বিরক্তি। বিনয়বাবুর স্ত্রী কোন একটা স্কুলে শিক্ষিকার চাকরী করেন। স্কটিশে পড়বার সময় নাকি ওঁদের প্রেম হয়, তারপর বিয়ে। এইরকম মুখে একটা লোক প্রেম করতে পারে অথবা প্রেমিক হতে পারে এটাই আমার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার।

অবশ্য এমনিতে লোকটা খারাপ নয়। যেহেতু আমি এখনও পার্মানেণ্ট ষ্টাফ নই, প্রভিশন পিরিয়ড চলছে তাই আমার ওপর ওঁর একটু বেশি নজর। প্রায়ই ডেকে বলেন, 'ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অফিস করবে না। পাঁচটা বাজলেই যদি বাড়ি ছোট তাহলে জীবনে কাজ শিখতে পারবে না। অফিসকে ভালবাস, কাজ করো উন্নতি কেউ আটকাতে পারবে না।

প্রভিশন পিরিয়ডে এসব নিঃশব্দে শুনে যাওয়াই রেওয়াজ,

অতএব শুনি। বাবা বলেন, আমার এফিসিয়েনসির অভাব, নইলে নাকি তিনমাসেই আমি কনফারমড হয়ে যেতাম। উনি যে এখনও ওঁর অফিসে রিটায়ার হওয়ার পরও একস্‌টেনশন পাচ্ছেন সেটা শুধু ওঁর এফিসিয়েনসির জন্যে। হয়তো তাই, কিন্তু ঠিক কী কী কাজ করলে কেরাণীগিরিতে এফিসিয়েনসি প্রুফ করানো হায় সেটাই ভেবে পাই না। অফিসে আমার ওপরে যাঁরা আছেন তাঁদের কাছাকাছি ঘুরঘুর করি, লক্ষ্য রাখি, কিন্তু কিছুতেই তাঁদের এফিসিয়েনসিটা ধরতে পারিনা। কে জানে, হয়ত খুব উঁচুদরের ব্যাপার, তাই আমার মোটা মাথায় ধরা পড়ে না। অনেকেই অনেক কিছু পারে, পেরে ওঠে, কিন্তু আমি হাজার চেষ্টা করেও অনেক কিছু পেরে উঠি না। বিনয়বাবু আমাকে অফিসে ঢুকতে দেখে প্রায়ই ঘড়ি দেখেন। আমি ভেতরে ভেতরে লজ্জা পাই। কিন্তু আমি লজ্জা পেলেই তো আর তিনি সন্তুষ্ট হন না। অতএব নিজের চেয়ারে বসতে না বসতেই ডেকে পাঠান। যথারীতি বিরক্তমুখে আমাকে দেখেন, তারপর বলেন, 'রোজই যদি পনেরো-বিশ মিনিট করে লেটে আসো তাহলে আর অফিস করা কেন? ভুলে যেও না, এটা তোমার প্রভিশন পিরিয়ড চলছে, তোমার সম্পর্কে ধারণা খারাপ হয়ে যাবে।'

আমার জীবনটাই যে এক ধরণের প্রভিশন সেটা আর আমার চাইতে ভাল কে জানে। ক'মাসে কিংবা ক'বছরে এই অফিসের প্রভিশন পিরিয়ড় শেষ হয় কে বলবে। বড় বাবু বলেন, 'তুমি লেটে আসো কেন? বাড়ি ফিরলে মা বলে, 'তোর এত দেরী হয় কেন? কত রাত অব্দি কাজ হয় তোদের অফিসে?' মালা বলে, 'তোমার একদম সময়জ্ঞান নেই। তুমি সব সময় লেট।'

আমি জানি, এসবক্ষেত্রে আমার কৈফিয়ৎগুলো সত্যি হলেও এত পুরনো আর এত ব্যবহৃত যে নিজের কানেই ভোঁতা ভোঁতা শোনায়। ওদের আর দোষ কী। অথচ আমার নিজের দিক থেকে জ্ঞানত কোন ত্রুটি নেই। কেমন করে আমার প্রত্যেকটা দিন শুরু

হয়, কীভাবে আমার রাত্রিগুলো কাটে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি কীভাবে পাল্লা দিয়ে দৌড়তে চাই সেকথা আমি কেমন করে বোঝাই। জীবনের অনেক সরল সত্য, খুব বেশি রকম সরল এবং বেশিরকম সত্য বলেই কখনো কখনো অবিশ্বাস্য লাগে। সবাই একটা ঘটনা শুনতে চায়, ঘটনার মধ্যে থেকে নাটকের স্বাদ পেলে উৎসাহী এবং আগ্রহী হয়, অথচ যা রোজ ঘটে যার মধ্যে তেমন ঘটনা বা নাটক থাকে না, সে জিনিস কারো মনোযোগ কাড়ে না। সূর্য রোজ ওঠে বলেই কেউ আর সূর্য দেখতে রাস্তায় নেমে আকাশে তাকায় না। মানুষের শরীরে, তার ধমণীতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেলেই মানুষ বিপন্ন হয়ে বুঝতে পারে, সে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে এসেছে। তখন বাঁচবার জন্যে তার তৎপরতার শেষ থাকে না। অথচ কোন মানুষই তার ধমণীতে রক্ত চলাচল নিয়ে এমনিতে কখনো ভাবতে বসেনা। সুতরাং আমার জীবনে যা ঘটে তা এতই স্বাভাবিক এবং দৈনন্দিন যে কেউ তার জন্যে ভাবেনা। অথচ আমি ভেবে পাই না। অথচ আমি ভেবে পাইনা আমার দোষটা কোথায়? আমার দিনগুলো শুরু হয় ঠিক এইভাবে ঃ

২

সকালে ঘুম ভাঙ্গার মুহূর্তটি বড় কষ্টের। গোটা শরীরে মাখামাখি হয়ে থাকে আলস্য, চোখের পাতায় তখনও ঘুমের রেশ। বিছানাটাই তখন সবচেয়ে আরামের জায়গা। তলপেটে প্রবল চাপ, তবুও পাশবালিশ জড়িয়ে আরও খাণিকক্ষণ শুয়ে থাকার মতো সুখ যেন আর কিছুতেই নেই। বিছানায় শুয়েই টের পাই গোটা বাড়িতে সাজ সাজ রব শুরু হয়ে গেছে। দাদার দুই মেয়ে রাণু আর বুলবুলকে স্কুলের পোষাক, বইয়ের বাক্স, ওয়াটার বটল, টিফিন নানা সরঞ্জাম গুছিয়ে দিতে দিতে বৌদি হিমসিম। মেয়ে দুটোকে দেখলে মনে হয়, স্কুলে নয়, যেন যুদ্ধে যাচ্ছে। ছোট ভাই নব, অর্থাৎ

নবেন্দুকে মা তাড়া দিচ্ছে দুধের লাইনে গিয়ে দুধ আনতে, আমাদের তিনি ভাইয়ের এক বোন রাখী, তার মর্নিং কলেজ। সে ঘুম থেকে উঠেই বিনুনী বাঁধতে ব্যস্ত, মা রান্নাঘরে। চোখ খুলে দেখতে পাই নির্দয় ঘড়ির কাঁটা আমাকে ছুয়ো দিতে দিতে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে। আমার শোবার ঘরের পাশেই মা'র রান্নাঘর। উনুনের ধোঁয়া ঘরের মধ্যে। বারান্দায় জনতা জ্বালিয়ে চায়ের আয়োজন করছে কাজের মেয়েটা। ওর নাম অর্চনা। ধোঁয়া এবং কেরোসিনের গন্ধ দিয়ে আমার সকাল শুরু। পাজামার আলগা দড়ি শক্ত করে কোমর বেঁধে আমি ছুটি তলপেটের ভার হালকা করার জন্যে। বাথরুমে যাওয়ার উপায় নেই, ওখানে এখন রাখী। অতএব, বাথরুমের কোণে বাইরের দিকে যে নর্দমাটা আছে সেখানেই বসে পড়তে হয়। ফিরে এসে বারন্দায় মুখ ধুয়ে ঘরে যাই। একখানা কাগজ, ওটা আপাতত বাবার দখলে। চা আসে। সকালে আমি আমি শুধু চা খাই। তারপর সিগারেট ধরাই। সিগারেট ধরিয়ে কয়েকটা টান দিতেই আমার পায়খানার বেগ আসে। বাড়িতে পায়খানা একটাই। রোজ সকালেই আমি মর্মে মর্মে টের পাই, প্রত্যেকের দুটো প্যাণ্ট আর দুটো জামার চাইতেও জরুরী হচ্ছে দুটো পায়খানা। কিন্তু টের পেলে কী হবে। পায়খানার ভেতরে বাবা। বন্ধ দরজার বাইরে আমি পায়চারি করি। আমার পেছনে আমার দাদা। ঘড়ির কাঁটা বাধা মানে না। তরতর করে এগিয়ে চলে, আমরা দুভাই বিরক্ত এবং ঘর্মাক্ত মুখে পারচারি করে যেতে থাকি। বাবার ঈষৎ অর্শের ব্যাধি, সুতরাং উনি একবার ঢুকলে বেরুতে একটু সময় নেন। অথচ আমাদের তর সয়না। সহ্য করতে না পেরে কখনও কখনও মৃদুস্বরে ডেকে ফেলি, 'বাবা সাতটা বাজল, আটটা পাঁচের ট্রেন ধরতে হবে আমাকে।'

বাবা শুধু একবার গলা ঝাড়েন। তাতে ওঁর প্রতিক্রিয়াটা ঠিক বোঝা যায়না। বাবা বেরুলে ঝড়ের মতো আমি ঢুকে পড়ি। কখনও কখনও এমনও হয় যে গায়ে ধাক্কাও লেগে যায়। মাঝে

মাঝে বাবা বলে ফেলেন, ইডিয়ট ধাক্কা মেরে যাচ্ছে।

ভেতরে ঢুকে আমিও বাবার মতো বেমালুম ভুলে যাই যে, দাদা দরজার সামনে পায়চারি করে চলেছে। ওখান থেকে বেরিয়ে ব্রাশ আর পেষ্ট নিয়ে আবার বাথরুমের সামনে লাইন। রাখী বেরিয়ে আসতেই বাবা, বাবার পর আমি আর আমার পর দাদা। মাঝে মাঝেই কলে জল আসে না। গতরাত্রের অবশিষ্ট জল যতটুকু থাকে সেটা বাবাই সাবাড় করে দিয়ে যান। অগত্যা ব্রহ্মতালুতে আধমগ জল ঢেলে ঘরে ছুটে আসি। অর্চনাকে নিয়ে মা তখন রান্নাঘরে, সেখানে একটা মিনি দক্ষযজ্ঞের চেহারা। বাবা ডাকছেন, কই গো? আমি হাঁক পাড়ি, কী হল? দাদা চ্যাঁচায়, তাড়াতাড়ি। নব দুধ নিয়ে ফিরে আসে এইসময়। সেও ডাক ছাড়ে, 'মা, আমার চা কই?'

আমার মার হাতের রান্না ভাল। কিন্তু সকালে সেটা টের পাওয়া যায়না। মা একটা থালায় করে খেতে দেয়। আমি যতটুকু পারি খাই, বাকিটা পড়ে থাকে। ঘড়ির কাঁটাটা ক্রমশঃ আটটার দিকে ছুটতে থাকে। আমি তার পেছনে পেছনে ছুটি। আমি যখন খাওয়া ছেড়ে উঠে আঁচাতে যাই, মা তখন তরকারী নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখে আমি মুখ ধুচ্ছি। রোজই এরকম ঘটে আর রোজই মা' বলে, 'একি, এরই মধ্যে হয়ে গেল? মুখ এঁটো করবার জন্যে বসা কেন?'

মা রান্না করে, কিন্তু ঘড়ি দেখে না। মা যখন ছেলেদের জন্যে তরকারী রেঁধে বেরিয়ে আসে আমরা তখন আটটা পাঁচের নৈহাটি লোকালের কথা ভেবে খাওয়া ছেড়ে উঠে মুখ ধুতে যাই।

আমি আমার ঘরে পোষাক পরি। বাবা হাঁক পাড়েন, কই গো, রুমাল কই, পানের কৌটো কোথায়?

মা রান্নাঘর থেকে দৌড়তে দৌড়তে বাবার কাছে যায়। দাদা ডাক ছাড়ে, আমার জামার বোতাম কোথায়?

বৌদি স্কুল থেকে ফিরেই ছুট লাগাল দাদার ডাকে। দাদার যে কেন রোজই বোতাম হারায় কে জানে। আমি প্যান্ট পরতে পরতে

টের পাই বোতাম খোঁজা নিয়ে দাদা-বৌদিতে ঝগড়া বেঁধে গেছে। ওঘরে বাবা খুঁজে পাচ্ছেন না চশমার খাপ। অতএব, মা আর বাবাতে তুমুল তর্কের আয়োজন। আমি বেচারা ব্যাচিলর, আমি আর কাকে ডাকি। অগত্যা অর্চনাকেই ডেকে বলি, দাদার ঘর থেকে জুতোর ব্রাশটা আনতো।'

ঘড়ির কাঁটা আটটার থেকে ঈষৎ পিছিয়ে। অর্থাৎ হাতে দশ মিনিটও সময় নেই। হেঁটে গেলে ষ্টেশন ঠিক দশমিনিটই লাগে। অতএব, ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। রিক্সা ডাকো। এসময় লাইন ধরে রিক্সা যায় ষ্টেশনের দিকে। 'রিকসা পথচলা মানুষ, পথ দখল করে বসা দোকানী, সবজীওয়ালা সবার মধ্যে দিয়ে বিলি কেটে কেটে ষ্টেশনে পৌঁছে টের পাই, ট্রেন নেই। ষ্টেশনে এসে সিগারেট খাই, পায়চারি করি, বড়বাবুর মুখটা মনে পড়ে আর বার বার ঝুঁকে দেখি ট্রেনের মুখ দেখা যায় কি না। ট্রেন আসে না, মাইকে ঘোষনা হয়, নৈহাটি লোকাল সাতটা পঞ্চান্নতে নৈহাটি ছেড়ে এসেছে। আটটা পাঁচে যার এখানে আসার কথা সে নৈহাটি ছেড়ে আসছে আমার বাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। ষ্টেশনের ভীড় থই থই করতে থাকে। দেখতে দেখতে তিনটে ট্রেনের প্যাসেঞ্জার যখন জমে যায় তখন ট্রেন ঢোকে স্টেশনে। জন্তুর মতো ঠাসাঠাসি করে ট্রেনের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করি। পুরো শরীরটা কামরার মধ্যে ঢোকেনা। তার জন্যে চিন্তা নেই। আমি জানি পরের ষ্টেশনে যাত্রীরাই আমাকে কামরার মধ্যে ঢুকিয়ে দেবেন। তারপর কোথায় কেমন ভাবে আমি গিয়ে দাঁড়াব সেটা ঈশ্বরই জানেন।

কামরার মধ্যে মানুষের জমাট ভীড়। তারমধ্যে ঝগড়া, তর্ক, তাসখেলা, রসিকতা সবই রোজকার নিয়মে চলছে। ট্রেন ষ্টেশনে থামে এটাই রীতি। কিন্তু যেহেতু আমার তাড়া, তাই ট্রেনটা যেন পাল্লা করে করে ষ্টেশনের আগেও একবার করে থামতে লাগল। হাত তুলে কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটাও দেখবার উপায় নেই এমনই অবস্থা।

ষ্টেশনে পৌঁছে প্রথমেই চোখ যায় ঘড়ির দিকে। বুকের মধ্যে সেই আগফাটা লাফালাফি করে। বড়বাবুর তীব্র চোখ যেন আমার শরীরে বিঁধছে। ভীড়ের মধ্যে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে এগোবার চেষ্টা করি। কারো গায় ধাক্কা লাগলেই চটে যায়, খ্যানখ্যানে গলায় বলে ওঠে, দেখে চলুন মশাই, অত তাড়া কিসের ?

বুঝতে পারি লোকটার তাড়া আমার চাইতে কম। প্রভিশন পিরিয়ডটা অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছে। আমি তর্ক করিনা। কেননা, জানি জবাব দিলেই তর্ক বেঁধে যাবে। আর তর্কের চাইতে প্রিয় জিনিস ডেলি প্যাসেঞ্জারদের কাছে কি আছে। ষ্টেশনের বাইরে যাবার লোক যত, ষ্টেশনের ভেতরে ঢোকার লোকও তত। ফলে ধস্তাধস্তি করে গেট পেরোই। ঘামে গেঞ্জি ভিজে গিয়ে সপসপ করে। এসে দাঁড়াই ট্রামের লাইনে। এমন জায়গায় দাঁড়াই যাতে ট্রাম আর বাস যে কোন একটা এলেই ধরতে পারি। সর্বাঙ্গে মানুষ ঝুলিয়ে এক একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায় আবার শুরু হয় নামা-ওঠার যুদ্ধ। এসব সময় আমার নিজেকে মহাভারতের অভিমন্যু বলে ভাবতে ইচ্ছে করে। ট্রেন, বাস, ট্রাম, লোডশেডিং সবাই যেন আমাকে ক্রমাগত পেছনে টানছে, একটা চক্রের মধ্যে আটকে ফেলতে চাইছে। আর আমি যেন খাঁচায় আটকা পড়া একটা ছোট্ট মুনিয়া পাখি। শেষের উপমাটাই বোধহয় ঠিক। অভিমন্যু তো তবু লড়াই করে মৃত্যুবরণ করেছিল। আমার সে ক্ষমতাও নেই। শুধু ডানা ঝাপটানো আর অক্ষম আক্রোশে ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হওয়া। ভয়ে ভয়ে ঘড়ির দিকে তাকাই। বুকের ভেতর ধিক ধিক করে আওয়াজ ওঠে। শব্দটার ভাষা আমি বুঝতে পারি। ওই শব্দটা বলছে, প্রভিশন পিরিয়ড, প্রভিশন পিরিয়ড।

এক সময় কোন একটা ট্রাম কিম্বা বাসের হাতল ধরে ঝুলে পড়ি। ঝুলতে ঝুলতে যখন ডালহৌসিতে পৌঁছই তখন নির্দ্দয় জিপিও'র ঘড়ি সাড়ে ন'টার ঘর পেরোচ্ছে। তার মানে আরও লেট। বাস থেকে নামার পর আমাকে দেখতে কেমন হয় তা জানিনা।

কোনদিন দেখিনি। আমি তাড়া খাওয়া শেয়ালের মত ছুটতে থাকি। ছুটতে ছুটতে অফিস। একতলায় এসে দেখি লিফটের সামনে কোন লাইন নেই। তার মানে লিফট বিকল, নয়তো লোডশেডিং। চারতলায় ওঠার জন্যে সিঁড়ি ভাঙতে আরম্ভ করি। পুরানো আমলের সাবেকী বাড়ি সিঁড়িগুলো কাঠের। আমার পায়ের শব্দে গমগম আওয়াজ ওঠে। কাঁচেব দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই চোখাচোখি হয় বড়বাবুর সঙ্গে। তিনি পান খাওয়া মুখ হাঁ করে সেই হাঁ মুখে দু' আঙ্গুলের টিপ থেকে জর্দা ছাড়ছেন। আমাকে দেখে তার মুখের বিরক্তি বেড়ে যায়। তির্যক চোখে একবার দেখেন আমাকে। আমি নিজের টেবিলে যাওয়ার আগে সোজা বড়বাবুর কাছে চলে আসি। অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে টের পাই আমি হাঁপাচ্ছি। বড়বাবু জর্দালাগা আঙ্গুল মুছতে ব্যস্ত থাকেন। আমাকে গ্রাহ্যই করেন না। এই উপেক্ষাটুকু আপাতত আমার শাস্তি। মিনিট দুয়েক পরে মুখ তুলে আমাকে লক্ষ্য করেন। বিরক্ত গলায় বলে ওঠেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে কেন? কী চাই?'

আমি যথাসম্ভব করুণ মুখে বলবার চেষ্টা করি. 'না, মানে, ট্রেনটা ভীষণ লেট, তাই...'

বড়বাবু টেবিলে চাটি মেরে বলেন, 'ফাটা রেকর্ডটা রোজই কেন বাজাও বলতো? তোমার বারোটা তুমি নিজে বাজালে আমি কী করতে পারি। আরেকটু সকালে বেরোতে পার না?

শেষ কথাটায় ধমকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঁ হাত দিয়ে হাজিরার খাতাটা বাড়িয়ে দিতে দিতে বলেন, 'আজকেই শেষ, এরপর আর এসব চলবে না।'

প্রথম প্রথম এসব কথায় আমার কান লাল হয়ে যেত। বুঝতে পারতাম একটা তীব্র অপমানবোধ আমাকে ঘর্মাক্ত করে তুলছে। ইদানীং অপমান হজম করার অভ্যেসটা রপ্ত করে নিয়েছি। এখন কথাগুলি শুনি, শুনতে খারাপ লাগে এই পর্যন্ত। তারপর নিজের

জায়গায় এসে বসি, জল খাই, জল খেয়ে বাথরুমে যাই। মুখ ধুই, চুল আঁচড়াই এবং ফিরে এসে কাজে মন লাগাই। আমার অন্যান্য সহকর্মিরা বড়বাবুর কথা গায়েই মাখে না। খবরের কাগজের আড়ালে মুখ ঢেকে বলে বাঞ্চোৎ। আমি অতটা পর্যন্ত এখনও যেতে পারিনি। শুধু মনে মনে বলি, গোয়াবাগান থেকে ডালহৌসী পায়ে হেঁটেও আমি সময়মতো হাজিরা দিতে পারি। যদি পড়তে বাছাধন বেলের খপ্পরে, তাহলে টের পেতে কেমন লাগে।

সপ্তাহে অন্ততঃ তিনদিন আমাকে বিব্রত করে তোলে মালার টেলিফোন। আর ব্যাপারটা এমনই কাকতালীয় যে, যেদিন দেরী করে আসার জন্যে বড়বাবুর ঝাড় খেয়েছি ঠিক সেই সব দিন-গুলোতেই বেছে বেছে মালা টেলিফোন করে। ওর ধারণা, আমি যেন চাকরী পেয়ে মহাসুখে আছি। গোটা অফিসটা যেন আমারই, টেলিফোনটাও যেন রাখা আমার টেবিলে। আমার যে এখনও টেমপোরারী ষ্টেজ চলছে, অফিসে যে আমার কোনরকম পজিশনই নেই সেটা মালা বোঝেনা। সব কথা খুলে বলাও যায়না। প্রেমিকার কাছে কোন ছেলেই বা নিজেকে খাটো করতে চায়। অতএব, ইঙ্গিতে দু'একবার বোঝাবার চেষ্টা করে দেখেছি, মালা বোঝে না। বরং চোখ পাকিয়ে বলে, 'কী এত ব্যস্ত থাকো যে টেলিফোন ধরতে অসুবিধে। টেলিফোন তো কথা বলবার জন্যেই।'

মালাদের বাড়িতে টেলিফোন আছে। দুপুরে মা ঘুমিয়ে পড়লে ও মহানন্দে আমাকে টেলিফোন করে। যন্ত্রটা থাকে বড়বাবুর টেবিলে। তিনি যথারীতি বাঁ হাত দিয়ে রিসিভারটা তুলে ধরেন। পরক্ষণেই ফোনটা নামিয়ে রেখে বেল বাজান। বেয়ারা এসে আমাকে ডাকে। আমি ঘরে ঢুকতেই বড়বাবু হাতের ইশারায় ফোনটা দেখিয়ে দিয়ে কাজে ব্যস্ত হবার ভান করেন। আমি বুঝতে পারি, ওঁর কানটা আমার দিকে। মালা দেখতে যেমনই হোক, টেলিফোনে ওর গলা ভারী চমৎকার শোনায়। রীতিমত

রোমানটিক। শুধু দূরাভাষেই ওকে মনে হয় যথার্থ প্রিয়ভাষিনী।' আমি টেলিফোনটা তুলতে তুলতে লক্ষ্য করি, বড়বাবু চশমার ভেতর দিয়ে আমাকে দেখছেন। আমি বলি, 'হ্যালো দিব্যেন্দু বলছি।'

ওপার থেকে মালার গলায় যেন খুশী উপচে পড়ে, 'কি করছিলে ?'

আমি : কাজ।

মালা : কেবল কাজ আর কাজ। ফোনটা কে ধরেছিলে বলতো, মোষের মতো হেড়ে গলা। কে ধরেছিল ?

বড়বাবু তাকিয়ে। উত্তর দি, 'হু'।

মালা : হু কি ? লোকটা কে ?

আমি : ঠিক আছে। এখন রাখছি।

মালা যেন আঁতকে ওঠে। বলে, রাখছি মানে, আসল কথাই তো হল না। কখন বেরোচ্ছো।

আমি : পাঁচটার পর।

মালা : আমি দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে বিকেলে গড়িয়াহাট যাব। তুমি আসবে ?

আমি : কোথায় ?

মালা : ছ'টার সময় কোয়ালিটিতে। আসবে তো ?

আমি : ঠিক আছে। এখন ছাড়ছি।

মালা আবারও আঁতকে ওঠার ভঙ্গিতে বলে, 'কেবল ছাড়ি ছাড়ি কেন ? আর অত আস্তে কথা বললে সব স্পষ্ট শোনা যায় ?'

আমি : না, মানে একটু অসুবিধে আছে ?

মালা হুকুম করার মেজাজে বলে, 'অসুবিধা আছে মানে ? কিসের অসুবিধে ! জোরে কথা বলার না এখানে আসার, কোনটা ?'

বড়বাবু পানের ডিবে খুলছেন। আড়চোখে আমাকে দেখলেন। কপালের ভাঁজগুলো আস্ত আস্তে বাড়ছে। মালা এগুলো দেখতে পাচ্ছেনা। এখন টেলিফোনে ওকে আমার অসুবিধেটা কেমন করে বোঝাই। অগত্যা বলে ফেলতে হয়, 'পরে বলব। এখন রাখছি।'

টেলিফোনের ভেতর দিয়েই টের পাই মালা রাগ করছে। কিন্তু উপায় নেই। প্রভিশন পিরিয়ড। অফিসের টেলিফোন বেশিক্ষণ ব্যক্তিগত কাজে আটকে রাখলে বড়বাবু রাগ করতে পারেন। রাখাল হালদার বাড়িতে একবার বৌয়ের সঙ্গে অফিসের টেলিফোনে সাতমিনিট কথা বলেছিল বলে বড়বাবু বলেছিলেন, 'অফিসের ফোনটা অফিসের কাজের জন্য বৌয়ের সঙ্গে গল্প করার জন্যে অফিস টেলিফোন পুষছে না।' পার্মানেণ্ট ষ্টাফ রাখাল হালদার বৌয়ের সঙ্গে কথা বলার জন্যেই যদি বড়বাবু এরকম করেন তাহলে প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আমার ভাগ্যে কতবড় ভৎর্সনা আছে সেটা বোঝার মতো বুদ্ধি আমার না থাকার কথা নয়।

প্রথম যেদিন মালা টেলিফোন করেছিল সেদিন কথা বলে চলে আসার সময় বড়বাবু বলেছিলেন, 'কে?' আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। অফিসের নিয়ম কানুন তো জানিনা। প্রভিশন পিরিয়ডে প্রেমিকা থাকাটা বিধেয় কিনা, অফিস প্রোটোকলে বৈধ কিনা সেটা ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে বলে ফেলেছিলাম, 'আমার মাসতুতো বোন। মাসীর শরীরটা খারাপ তাই…'

বড়বাবুর মুখের দিকে না তাকিয়ে চলে এসেছিলাম নিজের টেবিলে। আমি সাধারণতঃ মিথ্যে বলিনা, বলতে গেলে গুলিয়ে ফেলি, কিন্তু দেখছি বিপদের সময় মিথ্যেটা দিব্যি আমার জিভে চলে আসে। 'মাসতুতো বোন' কথাটা কিছু না ভেবেই বলে দিয়েছি। আমার মাসী আছেন, কিন্তু কোন মাসতুতো বোন কোনকালে ছিল না, এখন নতুন করে থাকবারও কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ বান্ধবীকে বিপদে পড়ে মাসতুতো বোন বলে চালাবার রেওয়াজটা বোধহয় অনেককাল থেকেই চলে আসছে।

যথারীতি সেদিন আমি কোয়ালিটিতে গিয়ে পৌছলাম সাতটা পনেরোতে। এতক্ষণ দিদি-জামাইবাবুকে নিয়ে আমার অপেক্ষায় মালার থাকার কথা নয়, থাকেও নি। অফিস থেকে বেরুতেই আমার সাড়ে পাঁচটা হয়ে গেল। মিনিবাসের লাইনে গিয়ে দেখি দীর্ঘ

লাইন, অথচ কোন বাস নেই। লাইনে দাঁড়ালাম। লাইন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগল। প্রথম বাসটায় ওঠার কোন প্রশ্নই নেই। দ্বিতীয় বাসটায় উঠলাম কিন্তু বসতে পেলাম না। ঘাড় গু'জে, হেঁটমুণ্ডে দাঁড়ালাম মিনিবাসের ভেতরে। ড্রাইভার চা খেয়ে ফিরে এল। গাড়ি চলতে প্রথম হোঁচট খেল রাজভবনের সদর দরজায় এসে। খেলা দেখে ফেরা দু'দলের মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তার ওপরে ইঁট ছোড়াছুড়ি চলছে। গাড়িটা সভয়ে কয়েক কদম পিছু হটে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুদূর এগিয়ে জ্যাম, জ্যামের জট ছাড়িয়ে, পাতাল রেলের খোঁড়াখুঁড়ি বাঁচিয়ে অবশেষে এলাম, তখন আর মালা নেই। বাতাসে ছড়িয়ে রেখে গেছে অদৃশ্য অভিমান, যা শুধু আমিই টের পেলাম।

মনে মনে ভাবলাম শিয়ালদা গিয়ে একটা টেলিফোন করে ব্যাপারটা মালাকে জানানো দরকার। মালা ততক্ষণে নিশ্চয়ই বাড়ি পৌঁছে যাবে। ট্রামের দরজায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যের কলকাতা দেখতে দেখতে শিয়ালদা ষ্টেশনে এলাম। গোটা পাঁচেক টেলিফোন বুথ আছে ষ্টেশনে। তার তিনটিতে অনাদি-অনন্তকাল ধরে তালা ঝুলছে। দুটোর দরজা খোলা কিন্তু টেলিফোন দুটো বড় রহস্যময়। অনেক চেষ্টায় লাইন মেলে, রিং হয়, চকচকে আধুলিটা গিলে ফেলেই চুপ করে যায়। আমার দুটো আধুলি গিলে আমাকে বোকা বানিয়ে ফিরিয়ে দিল। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলাম। একবার ইচ্ছে হল জোড়াপায়ে দরজাটার গায়ে লাথি কশাই। কিন্তু পারা গেলনা। সরকারী সম্পত্তিতে আঘাত করাটা খুবই অন্যায়। ষ্টেশনের থিকথিকে ভীড়ের মধ্যে মিশে যেতে যেতে মালার মুখটা মনে পড়ল। অভিমানে আহত মালা নির্ঘাৎ এতক্ষণে বাড়ি ফিরে গেছে। যোধপুর পার্কে দিদির বাড়িতে এতক্ষণ নিশ্চয়ই থাকবে না। মালা কি এখনও আমার কথা ভাবছে? ও কি জানতে পারছে, আমি কোয়লিটিতে গিয়েছিলাম। ওকে টেলিফোন করার জন্যে, ওর সঙ্গে কথা বলার জন্যে এতক্ষণ মরীয়া

হয়ে চেষ্টা করছি।

ষ্টেশনের মাইকে একটা ঘড়ঘড় করে আওয়াজ উঠল। তার মানে এখনই কোন সুসমাচার পরিবেশিত হবে। ঘোষকের আবেগহীন ঘোষণা, 'আপট্রেন দেরীতে আসার জন্য রেকের অভাবে ডাউন ট্রেন ছাড়তে দেরী হবে।'

৩

সাড়ে ন'টা নাগাদ নিজের ষ্টেশনে পা দিয়েই দেখতে পাই গোটা জগৎ যেন অন্ধকার। আলো থাকার সময়টা ক্রমশঃ কমে গিয়ে অন্ধকারের স্পর্ধা ধীরে ধীরে সীমাহীন হয়ে উঠেছে। এবার অন্ধকার রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরি হেঁটে হেঁটে। যেহেতু বাড়িতে বড়বাবু নেই, অতএব তাড়াটা কিঞ্চিৎ কম। অন্ধকার আমার পিছু তাড়া করে সাইকেল আর রিক্সা। প্যাঁক-প্যাঁক, ক্রিং ক্রিং নানা শব্দে অন্ধকারকে চমকাতে চমকাতে আলোছাড়া গাড়িগুলো ছুটে চলে। খুবই বিপজ্জনক পদযাত্রা আমার। যে কোন সময় একটা সাইকেল কিম্বা রিক্সা ঘাড়ের ওপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে। না পড়াটাই বরং অলৌকিক কাণ্ড। একবার কলেজ থেকে কোচিং ক্লাস সেরে বাড়ি ফিরতে একটু বেশি রাত হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার রাস্তা, রাস্তায় দোকানপাটও বন্ধ, ফলে অন্ধকারটা বেশ ঘন মনে হচ্ছিল। চেনা রাস্তা, সুতরাং রোজ যেভাবে হেঁটে যাই সেইভাবেই হেঁটে যাই সেইভাবেই হেঁটে যাচ্ছিলাম। বাড়ির কাছে, গলির মুখেই লোডশেডিং-এর অন্ধকারে রাস্তা জুড়ে শুয়েছিল একটা কালো ষাঁড়। অন্ধকারের সঙ্গে ওর গায়ের রঙ অদ্ভুতভাবে মিশে গিয়েছিল যাকে বলে সেভ ফর ইচ আদার। আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লাম ষাঁড়ের পিঠের ওপর। অন্ধকারে পড়ে যাওয়াটাই একটা দুর্ঘটনা, তারপর কিসের উপর পড়লাম, জিনিসটা কী সেটা একদম বুঝতে না পেরে আরও ঘাবড়ে গেলাম। জীবনে এর আগে এমন

স্পর্শসুখ বা অনুভব কখনও পাইনি। একেবারে অভূতপূর্ব ব্যাপার। আমি হুমড়ি খেয়ে পড়তেই জিনিসটা কিঞ্চিৎ নড়ে উঠল। আমি আঁতকে বইখাতা ফেলে রেখেই ছুট লাগালাম। ব্যাপারটা পরে জানাজানি হতে সবই জানা গেল। বাবা বললেন, 'দিবাটা একটা ইডিয়ট। অতবড় ষাঁড়টা তোর নজরে এল না। লোকে খানা-খন্দে পড়ে, কেউ কখনও ষাঁড়ের ওপর আছড়ে পড়েছে একথা তো শুনিনি।'

যেহেতু বাবা শোনেননি, তাই অন্ধকার রাত্রে রাস্তাজুড়ে শুয়ে থাকা কালো ষাঁড়টার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়াটা আমারই বোকামীর অ্যাকাউন্টে চলে গেল। এরপর থেকে ষাঁড় সম্পর্কে আমি খুব সাবধান। খানা-খন্দে আমার ভয় নেই, যেহেতু ওটা বাবার জানা আছে। ওঁর জানা নেই এমন কোন কিছু ঘটলেই সেটা আমার ঘাড়ে দোষ হয়ে বর্তাবে।

বাড়ি ফিরলাম অন্ধকার মাথায় নিয়ে। ঘরে ঘরে ভাঙ্গা মোম আর হ্যারিকেন জ্বলছে। হ্যারিকেন রোজই দু'তিনবার জ্বালতে হয়, জ্বালালে জ্বলেও সেগুলো, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ওখানেও লোডশেডিং-এর প্রভাব দেখা যায়। চিমনীর একটা দিক ক্রমশ কালো হতে থাকে। চন্দ্রের রাহুগ্রাসের মতো সেটা বাড়তে বাড়তে অচিরেই পূর্ণগ্রাস হয়ে যায়। ঘটনাটা রোজই ঘটে আর রোজই বাবা চিৎকার করেন, 'প্রপার মেইনটেনান্সের অভাবে লণ্ঠনগুলোর এই অবস্থা। সারাদিন কী যে তোমরা কর। দুটো লণ্ঠনকে অ্যাকটিভ রাখতে জানো না।'

মা বাবার মতো গলা চড়াতে পারে না। তবুও জোর দিয়ে বলে, 'রোজই মোছা হয়, ফিতে কেটে ঠিক করা হয়। এগুলো কেরোসিনের দোষ।'

দাদার একটা তিন ব্যাটারী টর্চ আছে। এজরা স্ট্রিট থেকে দাদা ওটা কিনে এনেছিল লোডশেডিং-এর জন্যেই। যেদিন আনল সেদিন

দাদার বাস্তববুদ্ধির প্রশংসায় ধন্য ধন্য পড়ে গেল। বাবাও বলেছিলেন, 'সৌম্য একটা কাজের কাজ করেছে। হঠাৎ আলো নিভে গেলে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে হ্যারিকেন খোঁজো, মোমবাতি বার কর, দেশলাই কোথায় খুঁজে আনো এতসব ঝকমারীর হাত থেকে বাঁচা গেল।' সত্যিই বাঁচা গিয়েছিল। দাদা টর্চের আলোর জোর দেখিয়ে আমাকে অবাক করার জন্যে নারকেল গাছের মাথায় আলো ফেলে বলত, 'দিবা, এবার গুণে দেখ কটা নারকেল আছে কাঁদিতে।'

আমি অবাক না হলেও দাদার দুই মেয়ে রাণু আর বুলবুল অবাক হতো। অবাক হতো বৌদিও। বলত, 'ঠাকুরপো, তুমি একটা কিনে ফ্যাল এই জিনিস। বলনা গো কোথায় পাওয়া যায়।'

বৌদির ধারণা এই দুর্লভ বস্তুর সন্ধান দাদা ছাড়া আর কেউ জানেনা। সুতরাং তার ঠাকুরপোকে সন্ধান না দিলে বেচারার জীবন থেকে অন্ধকার ঘুচবেনা। মাস তিনেকের মধ্যেই সেই তিন ব্যাটারীর টর্চ ক্যানসারের চাইতেও দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়ল। নতুন ব্যাটারী থাকলেও বোতাম টিপলে আলো বেরোয় না, যদি না তার পেছনে ক্রমাগত ধাক্কা মারা যায়। অতএব, বাঁ হাতে টর্চ নিয়ে দাদা এখন ডানহাতে ক্রমাগত ধাক্কা মারছে একবিন্দু আলোর জন্যে আর গজগজ করছে, কে তার টর্চের এমন হাল করেছে। নিশ্চয়ই কেউ ফেলেটেলে দিয়েছিল।

বিপদ বুঝে রাণু আর বুলবুল আমার ঘরে চলে এসেছে। ওরা জানে, কেউ যদি দোষ স্বীকার না করে তাহলে দোষটা ওদের ঘাড়েই চাপবে। কেননা, টর্চের প্রতি ওদের কৌতূহলটা সবারই জানা। আমার ঘরে খানিক আগে মা যে হ্যারিকেনটা রেখে গেছে তা থেকে এখন শুধু কালো ধোয়া ছাড়া আর কিছুই বেরুচ্ছে না। সারা শরীর কুলকুল করে ঘামছে। এখন আর কেউ আলোর জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকেনা। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে কাজ চালাতে থাকে। ওরই মধ্যে একবার করে চিমনীর কাঁচ মোছা হয়, যাতে খাবার সময় কিঞ্চিৎ আলো মেলে। বাইরে রাত বাড়তে থাকে, ঘরের মধ্যে

অন্ধকার আরো নিবিড় হয়। বিছানার ওপর মাছুর বিছিয়ে আমি শুয়ে পড়ি। বাইরের আকাশে ছড়ানো ছেটানো কয়েকটা তারা; আধখানা চাঁদ আর আকাশের নীচে চাপ চাপ অন্ধকার। গলার কাছে ঘাম জমে জবজব করে। গরমে ঘাম আর জমাট অন্ধকারে আমার যেন শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। মনে হয়, বিশাল একটা দৈত্য আমার বুকের ওপর হাঁটু গেড়ে বসতে চাইছে। দুচোখের পাতা এক করতে পারি না। জোর করে চোখ বুঁজি, ঘুম আসেনা। অন্ধকার চোখে সারাদিনের নানা ঘটনা, নানা ছবি টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে বেড়াতে থাকে। ভাবনাগুলো কিছুটা এলোমেলো। আমার চোখ থেকে ঘুম সরে যেতে থাকে। আমাকে বিনিদ্র রেখে ঘরে এবং বাইরে দ্রুতবেগে রাত বেড়ে চলে।

৪

এরাতও একসময় শেষ হয়। পুবের আকাশে সূর্য ওঠে। সকালের নরম আলোর মধ্যে দিয়ে আবার আরেকটা দিনের সূচনা ঘটে। খুব ছোটবেলায় ভোরে ওঠার অভ্যেস ছিল আমার। আমাদের বাড়ীর উঠোনে ছিল শিউলি ফুলের গাছ। শরৎকালে রাত্তিরে দেখতাম গোটা গাছের মাথা সাদা করে শিউলি ফুটে আছে। তলার উঠোনে টুপটাপ ঝরে পড়ছে ফুলগুলো। সেসময় সকালে উঠে ফুল কুড়োনোর বাতিক ছিল আমার। আমি আর মা, দু'জনে ঘুম থেকে উঠে ফুল কুড়োতাম। পাখির পালকের মতো সেইসব নরম সকাল কবে কীভাবে যে হারিয়ে গেল সেটা বোঝাই যায়না। এখন কদাচিৎ সকালে ওঠা হয়। শুধু মহালয়ার ভোরে, বছরে ওই একবার বোধহয় আমি দিনের শুরুটা দেখতে পাই। দেখতে পাই বটে, কিন্তু সেই দেখাটাতে আগের স্বাদ পাই না। এছাড়া বছরের বাকি দিনগুলো শুরু হয়ে যায় আমি বিছানায় থাকতে থাকতেই। আমি চোখ খুলেই দেখি আমার চারপাসে অসীম ব্যস্ততা, হুড়োহুড়ি

আর দমবন্ধ করা একটা গুমোট আবহাওয়া। যেন সকালের সূর্য তার আলোর সঙ্গে ছাড়িয়ে দিচ্ছে একটা নির্দয় কর্কশতা। আমার বাড়ীর সামনেই বাজার। ফলে আমি জানি, আমার সকাল গুলোতে কোন পেলবতা নেই, কোন লাবন্য নেই। ভয়ঙ্কর একটা কোলাহল, ঘড়ির কাটার দ্রুত এগিয়ে চলা, আমার ব্যস্ততা, গোটা বাড়িতে ছোটাছুটি, নিত্যকার এই ছবিতে কোথাও কোন বৈচিত্র্য নেই, এতটুকু শান্তি নেই। তবুও, এটাই আমার জগৎ, এটাই আমার জীবন—এথেকে পালাবার কোন প্রশ্ন ওঠেনা। আমি মাঝে মাঝে নিজেকে নিয়ে ভাবতে বসি। যেহেতু আমাকে নিয়ে ভাববার কেউ নেই, তাই আমি নিজেই ভাবি। নিজের দিকে তাকিয়ে যখন নিজেকেই কেউ দেখে তখন সেখানে কোন ফাঁকি বা চালাকী চলেনা। আমি লোকটা কেমন ? 'লোকটা' না 'ছেলেটা'—নিজের সম্পর্কে এই বয়সে কোন শব্দটা সঠিক সেটা নিয়ে আমার কিঞ্চিৎ দ্বিধা আছে। পৃথিবীতে এক ধরণের মানুষ আছে, যাদের বেঁচে থাকার যোগ্যতা কম অথচ মরে যাবার মতো সাহসেরও অভাব, তাঁরা ঠিকভাবে বাঁচেও না, মরেও না—শুধু ধুঁকে ধুঁকে দিন কাটায়। আমি যে এই গোত্রের মানুষ তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনে মনে আমি যত কথা ভাবি মুখ ফুটে তার সিকিভাগও বেরোয় না। বাবা যখন আমাকে 'ইডয়ট' বলে গাল দেয়, যখন বলে, আমাকে দিয়ে 'কিছু' হবেনা, তখন মাঝে মাঝে আমার বলতে ইচ্ছে করে, তুমিই বা সারা জীবনে কোন মহৎ কর্মটা করে গেলে। গোটা জীবন কাটিয়ে গেলে ভাড়া বাড়িতে, এক ছটাক জমি কিনে উঠতে পারলে না, অথচ আমার কাকারা সবাই তোমার রোজগারে লেখা পড়া শিখে বিয়ে-থা করে যে যার মতো আলাদা হয়ে চলে গেল, কেউ জমি কিনে বাড়ি বানাল, কেউ বা ফ্ল্যাট কিনল, অথচ তুমি পারলে না।

কথাগুলো বলতে ইচ্ছে করে কিন্তু বলা হয় না। বড়বাবুকে মাঝে-মাঝে দু' একটা কড়া কথা শোনাতে বড় সাধ হয়। সামনে

বলতে সাহসে কুলোয় না। ট্রেনে আসতে আসতে মনে মনে সেই কথাগুলো বলি, যেন বড়বাবুকেই শোনাচ্ছি-আসলে ভেভরের আক্রোশ অথবা জ্বালাটাকে নিজেই নিজের সামনে উগরে দিয়ে নিজেই শুনি। তবে একটা লক্ষণ শুভ যে, আমার মনে কোন রাগ বেশিক্ষণ থাকেনা। বাড়িতে রাগ হলে আমি প্রথমে বুঝতে চাই, আমার রাগটাকে কেউ পাত্তা দিচ্ছে কিনা। যদি দেখি সবাই খুব পাত্তা দিচ্ছে, আমাকে ভয় করছে তাহলে মনে মনে এক ধরণের সুখ পাই। যেহেতু বাড়িতে আপাতত মা ছাড়া কেউই আমার রাগকে বিশেষ আমল দিতে চায়না তাই রাগ করে সুখ পাওয়াটা কমে এসেছে। প্রথম প্রথম বৌদি আমাকে পাত্তা দিতো, কিন্তু ইদানিং তার রাগ এত প্রবল হয়ে উঠছে যে, আমার দিকে নজর দেবার বিশেষ সময় সে পায়না। মেয়েদের রাগ হলে ওরা প্রথমে খাওয়া বন্ধ করে দেয়, তারপর দু'চারবার সাধাসাধি করলে হয় খায় নয়তো ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকে। বৌদির মাসে একবার করে রাগ হয়। যখন বেকার ছিলাম, তখন আমিই গিয়ে বৌদিকে সাধাসাধি করে খাওয়াতাম। দাদাও সাধতো, তবে সেটা আড়ালে। এখন আমার আর সময় হয়না। দাদারও তার আগের মত ধৈর্য্য নেই। মা দু' একবার বলে তারপর সেও চুপ করে যায়। শেষ পর্যন্ত যখন সবাই খেয়ে নিয়ে শুতে যায় তখন বৌদি কাঁদতে শুরু করে দেয়। এ কান্নাটা কেন সেটা ঠিক বুঝতে পারিনা। আমার মাঝে মাঝে ভয় হয়, যদি মালার সঙ্গে আমার হয়, আর বিয়ের পর মালা যদি মাঝ রাত্তিরে বিছানায় বসে কান্না জুড়ে দেয় তাহলে আমি কি করব? মালার এখনই যেরকম রাগ, ওটা বিয়ের পরে কমবে বলে মনে হয়না, মেয়েদের ওটা একদম কমে না।

আজ দুপুরে মালা ফোন করেছিল। বড়বাবু যথারীতি বেয়ারা দিয়ে ডাকালেন। ইশারায় ফোনটা দেখিয়ে বললেন, 'তোমার।' বড়বাবুর সামনে দাঁড়িয়ে মালার সঙ্গে ফোনে কথা বলা ভারী

বিপজ্জনক। আমি ভয়ে ভয়ে ফোনটা তুলে বললাম, 'আমি দিব্যেন্দু।'

টেলিফোনের ভেতর দিয়ে মালার হাসি জলতরঙ্গের মতো ভেসে এল, 'আজ কখন বেরোচ্ছো ?'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'পাঁচটা নাগাদ।'

মালা আব্দারের সুরে বলল, 'রোজই বুঝি পাঁচটায় বেরুতে হয়।' একদিন একটু আগে আগে বেরুতে পারোনা।'

কথা সংক্ষেপ করবার জন্যে বললাম, 'কেন, কী ব্যাপার।'

মালা বলল, 'আমি সিনেমার টিকিট কেটেছি। ইভনিং শো।'

আমি : কোথায় ?

মালা : ইন্দিরা-তে। পৌনে ছ'টায় শো আরম্ভ। তুমি সাড়ে পাঁচটার মধ্যে চলে আসবে তো ?

উত্তর দেবার আগে বড়বাবুর দিকে তাকাই। বড়বাবু টোষ্টের সঙ্গে ছানা দিয়ে টিফিন খাবার আয়োজন করছেন। তার চোখ আপাতত খাবারের দিকে। আমি বলি, 'আসবো।'

মালা ফোন ছাড়ে না। বলে, 'ঠিক সাড়ে পাঁচটায় কিন্তু। আমাকে বেশিক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবে না তো ?'

আমি উত্তর দি, 'না।'

মালা যেন টেলিফোনের ভেতর দিয়ে আমাকে দেখতে পাচ্ছে, অবিকল সেইভাবে বলল, 'আমার সামনে কথা দিচ্ছ কিন্তু, প্রমিস, ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। এখন ছাড়ছি, এলে কথা হবে।'

ফোনটা নামিয়ে রাখতে রাখতে আমি বড়বাবুর দিকে তাকালাম। টোষ্টে কামড় দিয়ে চিবুতে চিবুতে উনি বললেন, 'ভবানীপুর থেকে মাসতুতো বোন ?'

আমি মাথা নাড়লাম। মালার গলাটা ওঁর চেনা হয়ে গেছে। কিছু আঁচ করতে পারছে বোধহয়। অবশ্য জেনে ফেললেও আমার কিছু করার নেই। আমি নিজের টেবিলে বসে দূর থেকে বড়বাবুকে লক্ষ্য করলাম। লোকটা চোখ বুঁজে খুব আরাম করে খাবার

চিবুচ্ছে। আমার চারপাশের প্রায় টেবিলই এখন ফাঁকা। সবাই টিফিন করতে গেছে। মালার টেলিফোন না এলে এতক্ষণে আমিও চলে যেতাম। মা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, 'অফিসে কি খাস টিফিনে?'

আমি দায়সারা গোছের উত্তর দি, 'ঐ আর কি! টোষ্ট, কলা-টলা--।'

অফিসের ক্যান্টিনে প্রথম প্রথম খেতাম। এখন আর খাইনা। নিচে গিয়ে কোন দোকানে ঢুকে পছন্দমতো যা পাই খেয়ে নিই। অফিসের ক্যান্টিনটা অফিসেব বলেই সেটার দায়-দায়িত্ব যে ঠিক কার ওপর কে জানে। চিরকাল একই মেনু ও একই স্বাদের রান্না। যে লোকটা রাঁধে তাকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছে করে। নিচে থেকে খেয়ে এসে আবার কাজে মন দিতে হয়। আমি দেখেছি যেদিন সকালের দিকে কাজ কম থাকে, সেদিন বিকেলের দিকে কাজ দ্বিগুণ ছয়। আজ আমার পাঁচটার একটু আগেই বেরুনো দরকার, সুতরাং টিফিনের পর আমার কাজের পরিমাণ বেড়ে যেতে লাগল। চারটে নাগাদ জয়ন্ত, অর্থাৎ ডেসপ্যাচের জয়ন্ত নন্দী ছুটি চাইতে গেল বড়বাবুর কাছে। ওর নাকি আজ একটু আগে বাড়ী যাওয়া দরকার। জয়ন্ত বড়বাবুর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল আর পরক্ষণেই বড়বাবুর হুঙ্কার শোনা গেল, 'নো-নো, ইম্পসিবল, আজকে পাঁচমিনিট আগে ছাড়াও সম্ভব নয়। আপনারা ভেবেছেন কি? এটা অফিস না পাড়ার ক্লাব।'

জয়ন্ত গজগজ করতে করতে নিজের জায়গায় চলে এল। মিনিট পনেরো ঘাড় গুঁজে কাজ করার পর বেয়ারাকে ডেকে বলল, 'আমার পেট কামড়াচ্ছে, আমি টয়লেটে যাচ্ছি, ডাকলে বলে দিস।'

জয়ন্ত টয়লেটে গেল, কিন্তু পাঁচটার পরেও আর সেখান থেকে ফিরে এলনা। এদিকে আমার অবস্থা শোচনীয় করে ছেড়েছেন বড়বাবু। সবকটা ফাইলে আর চিঠিতে 'আর্জেন্ট স্লিপ' আটকে ঘনঘন আমার টেবিলে পাঠাচ্ছেন। কাল সকালের ফ্লাইটেই বড়

সাহেব দিল্লি যাবেন সেমিনার অ্যাটেন করতে, সুতরাং আজই এগুলি তৈরী করে দেওয়া দরকার। আমি কলে আটকা পড়া ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজে কাজ করি আর ঘড়ি দেখি, আর মনে মনে হিসেব করি ডালহৌসি থেকে ইন্দিরা মিনিতে কতক্ষণ? পাতাল রেলের জন্যে মিনি কি ইন্দিরার সামনে দিয়ে যায়? ট্যাক্সিতে গেলে কত উঠবে মিটার?

হাতের কাজ শেষ করে আমি যখন অফিস থেকে বেরুলাম তখন সোয়া পাঁচটা। পনেরো মিনিটে পৌঁছনো অসম্ভব। ডালহৌসীর রাস্তায় রাস্তায় ঘরমুখো মানুষের উত্তাল জনস্রোত। আমি প্রথমে ট্যাক্সি ধরবার চেষ্টা করলাম। দু'একটা ফাঁকা ট্যাক্সি দেখে গলা ফাটিয়ে ডাকলামও, কিন্তু ওরা আমাকে গ্রাহ্য করলনা। অগত্যা গিয়ে দাঁড়াতে হল মিনির লাইনে। লাইনে দাঁড়িয়ে দেখলাম একটা ডিলাক্স, ওটাতে গেলে ইন্দিরার কাছাকাছি যাওয়া যাবে। লাইন ছেড়ে ছুটলাম। ভাগ্যিস সিগন্যালের জন্য বাসটা দাঁড়িয়েছিল তাই নাগাল পাওয়া গেল। পাদানীতে পা দিয়ে দাঁড়াতেই বাসটা ছেড়ে দিল। কোনরকমে ভেতরে ঢোকা গেল। দরজা বন্ধ করার জন্য শরীরটা বাঁকাতেই দরজা বন্ধ হল বটে, কিন্তু বাঁকা শরীরটা আর সোজা করার উপায় রইলনা! আমার মাথাটা নিচু, শরীরটা বাঁকানো, ঘাড়ের ওপর দোদুল্যমান বিশাল একটি লেডিস ব্যাগ, বাঁপাশে আমারই বয়েসী একটি ছেলে, আর ডানপাশে স্থুলকায়া এক রমণী। বাসটা যেভাবে ঝাঁকাচ্ছে, হঠাৎ হঠাৎ ব্রেক কষায় যেমনভাবে ধাক্কা লাগছে তাতে যদি ওই মহিলা একবার আমার ওপর আছড়ে পড়েন তাহলে ষ্টামপেড-এ আমার মৃত্যু রোধ করা অসম্ভব। আমি এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছি যেখানে সবাই অবলীলাক্রমে আমার পা মাড়িয়ে দিয়ে নামা-ওঠা করতে পারেন।

বাসটা রবীন্দ্রসদনের সামনে এসে দাঁড়াল। মনে মনে ভাবলাম, মালা যদি ইন্দিরায় না দাঁড়িয়ে এখানে দাঁড়াতো তাহলে এই

মুহূর্তেই আমি যমযন্ত্রণা থেকে স্বস্তি পেতে পারতাম। বাসটা দাঁড়ালো তো দাঁড়ালোই। সামনে দেদার গাড়ি। বোধহয় কোন মন্ত্রী-টন্ত্রী রবীন্দ্রসদনে ভাষণ-টাষণ দিতে আসবেন, নইলে আর এত পুলিশ কেন? গাড়ীর ভীড় বাড়তে থাকে। আমার বাস স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। যাঁরা জানালার ধারে বসে তাঁরা মুখ বার করে উঁকিঝুঁকি দিতে আরম্ভ করে। কেউ বলে সামনে একটা বাস বিগড়েছে, কেউ বলে মিনি উল্টেছে। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা, দেখা সম্ভবও না। পি. জি. হাসপাতালের দিকে কিছু একটা হয়েছে। ওদিক থেকে কোন গাড়ি আসছে না। যেতেও পারছে না। ঘাড়টা টনটন করে। কোমর থেকে একটা যন্ত্রণা উঠছে টের পাই। গোটা মুখ ভেসে যাচ্ছে ঘামে। অথচ একটুও নড়বার উপায় নেই।

বাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই একবার ঘড়ি দেখি। পৌনে ছ'টা বেজে যাচ্ছে। ইন্দিরার সামনে মালাকে মনে মনে দেখতে পাই। কিন্তু মালা কি আমাকে মনে মনে দেখতে পাচ্ছে? ওর কাছে যাবার জন্যে আমার এই কষ্ট কি মালা বুঝবে?

মালা সত্যিই অবুঝ। প্রায় সাড়ে ছ'টার কাছাকাছি আমি ইন্দিরার সামনে গিয়ে দেখি হল-এর সামনে মালা একা দাঁড়িয়ে। ছবি শুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। প্রায় নির্জন চত্বরে মালার দাঁড়ানো শরীরটা আমাকে দেখামাত্র আগুনের শিখার মতো জ্বলে উঠল। মুখোমুখি হতেই মালা হাতের টিকিট-দুটো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে দিল শূন্যে—আমার দিকে, দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল। দৃশ্যটা দুয়েকজন বাদামওয়ালা দেখল। আমি মালার পিছু পিছু হাঁটতে লাগলাম। রাস্তা পেরিয়ে নিজের বাড়িতে যাবার গলির মুখে পা দিতেই আমি ওর হাতটা টেনে ধরলাম। মালা তীব্রচোখে তাকাল। আমি হাতটা ছেড়ে দিলাম। বললাম, 'তুমি আমার কথাটা শুনবে তো?'

মালা চাপাস্বরে সমস্ত রাগটুকু ঢেলে দিয়ে উত্তর দিল, 'আমার কিছু শোনার নেই। আমি তোমার মুখ থেকে কোন কথা শুনতে

চাইনা।'

আমি আহত গলায় বললাম, 'তাহলে এতটা পথ কষ্ট করে কেন এলাম।'

মালা নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘাড় বেঁকিয়ে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, 'নিশ্চয়ই আমার জন্যে আসোনি।'

আমি পকেট হাতড়ে রুমাল বার করতে করেতে বললাম, 'তবে কার জন্যে?'

মালা চলতে চলতে উত্তর দিল, 'আমাব জন্যে এলে সময়মতো আসতে, তোমার প্রমিস রাখতে।'

মালার মেজাজ যেন বড়বাবুর চাইতেও চড়া। অন্ততঃ এই মুহূর্তে গোয়াবাগানে বিনয় রঞ্জন সরকারকে আমার মালার চাইতে কাইণ্ড হার্টেড মানুষ বলে মনে হল। প্রভিশন পিরিয়ডতো অফিসে চলছে, মালার কাছেও কি আমার প্রভিশন পিরিয়ড। হিন্দি ছবিতে দেখেছি, নায়িকা রাগ করে হাঁটা দিলে নায়ক পেছন থেকে কিশোর-কুমারের গলায় গান ধরে, আর ছুটে হোক, লাফিয়ে হোক নায়িকার পিছু তাড়া করে এই করতে করতেই একসময় ভাব হয়ে যায়, তখন দুজনে মিলে দিব্যি ডুয়েট গায়। হাজরা পার্কের কাছে এমন কাণ্ড করা কী আর সম্ভব। ওই পার্কের মধ্যে অনেক রকম পাইপ-টাইপ, ইঁট, পাথর কুচি ছড়ানো। যদি লাফালাফি করতে গিয়ে লাগে তাহলে টিটেনাসের হাত থেকে বাঁচা মুশকিল। তবুও মরীয়া হয়ে আমি আবার মালার হাত ধরলাম। বললাম, 'দাঁড়াও।' মালা এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ধমক দিল, 'এটা কী হচ্ছে রাস্তার মধ্যে, অসভ্যতা না করে বুঝি পথচলা যায়না।'

আমি বললাম, 'আমারও তো কিছু বলবার থাকতে পারে।'

মালা হেঁটে যেতে যেতে বলল, 'সেটা বলার জায়গা এখানে, এই রাস্তায় নয়। বাড়িতে গিয়ে বুঝি বলা যায়না।'

আমি একটু রাগ দেখাবার জন্যে বললাম, 'আমি এখন তোমাদের বাড়িতে যাবনা। আমার তাড়া আছে।'

মালা দাঁড়িয়ে পড়ল। তির্যক ভঙ্গিতে আমায় দেখল। তারপর মুখ নিচু করে চলতে চলতে বলল, 'সিনেমা দেখতে পেলে এই তাড়াটা কোথায় যেত? ইভনিং শো সাড়ে আটটায় ভাঙ্গে। সাড়ে আটটার আগে তুমি কোথাও যেতে পারবে না—।'

কথাটা শেষ করেই মালা হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। অগত্যা আমাকেও ওর সঙ্গে সঙ্গে আসতে হল।

আজ নিয়ে মালাদের বাড়িতে মোট তিনবার আসা হল। মালার মা আমাকে পছন্দ করেন কিনা, আর করলেও কতটা সেটা —আমি ঠিক জানিনা। প্রথম যেবার এসেছিলাম, তখন আমি বেকার ছিলাম। আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'চাকরী-বাকরী কিছু পেলে।'

আমি মাথা নিচু করে এমনভাবে জবাব দিয়েছিলাম, যেন স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল করেছি। চাকরী পাওয়ার পর মালা প্রায় জোর করে ধরে নিয়ে এসেছিল। যদিও কোন মানে হয়না, তবুও রেওয়াজ আছে চাকরী পেলে গুরুজনদের প্রণাম করে সংবাদটা জানাতে হয়। আমি জানালাম। মালার মা'র মুখ দেখে ঠিক ধরতে পারলাম না উনি কতটা খুশি হয়েছেন। আমি জলযোগ থেকে মিষ্টি কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার মিষ্টিই খানদুই আমাকে প্লেটে সাজিয়ে খেতে দিলেন। সঙ্গে বাড়তি যেটা ছিল সেটা হল ছুটো সিঙ্গারা। আমি জানি, সন্ধ্যেবেলা সিঙ্গারা খেলে আমাকে জেলুসিল খেতে হয়। জেনেশুনেও খেতে হল, কেননা, এখানেও আমার প্রভিশন পিরিয়ড। মালা যখন চা দিল তখন ওর মা আসল প্রশ্নটা ছুঁড়লেন, 'তোমার এখন মাইনে কত?'

কাউকে মাইনের কথাটা জিজ্ঞেস করলে আমার খুব রাগ হয়। বলবার মতো মাইনে পাইনা বলে রাগটা আরো বেশি। কিন্তু এখানে রাগ দেখাবার উপায় নেই। অগত্যা বলতে হল। মাইনের অঙ্কটা যে ওঁকে খুশি করলনা সেটা বলাই বাহুল্য। কোন মেয়ের মা'ই এটা শুনে উল্লসিত হবেন না। চায়ের স্বাদটা ক্রমশ বিস্বাদ

হয়ে আসছিল, তবুও গিলতে হল। মালা সোফার ওপর বসে, মালাকে আধখানা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছেন তার ভয়ঙ্করী মা। ফলে ওর দিকেও তাকাতে পারছিনা। মা-র দিকে তাকাবার সাহস তো নেই-ই।

যেহেতু আগের দু'বার ওদের বাড়িতে যাওয়াটা আমার কাছে খুব সুখকর লাগেনি, অতএব আজ তৃতীয়বার ওদের সিঁড়িতে পা রাখতে গিয়ে একটু থামতে হল। মনে মনে ভরসা দিলাম, এখন আর বেকার নেই, মাইনেও জানা হয়ে গেছে, সুতরাং এবার বোধহয় আমাকে বিব্রত করার মতো কোন প্রশ্নের সুযোগ উনি পারবেন না।

আমাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে মালা বলল, 'ওকি দাঁড়ালে কেন ?'

কেন দাঁড়ালাম সেটা মালাকে বলা যাবেনা। নিজের ঘরে ঢুকে মালা বলল, 'বসো, মা-কে ডাকি।'

মনের কথাটা হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, 'আবার ওঁকে কেন ?'

খুবই সরল কথা, কিন্তু আমার বলার দোষে বুঝি অন্যরকম শোনাল। মালা চোখ বড় বড় করে তাকাল। রেগে তো ছিলই, এবার সেটা কিঞ্চিৎ বাড়ল। নাক ফুলল। আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, 'এ কথার মানে ? তুমি আর আমি বুঝি এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে গল্প করতে এলাম। মা জানতে পারলে কী ভাববে বলতো।'

জগতে কে কী ভাববে সেটা ভাবতে ভাবতেই আমার বয়েস বেড়ে যচ্ছে, অথচ আমিও যে কিছু ভাবতে পারি সেটা আর কেউ ভাবেনা। মালা চোখ পাকিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। ওখানে টি-ভি চলছে। মালা যদি এখন টি ভি দেখা থেকে তুলে কাজের মেয়েটাকে চা বানাতে পাঠায় তাহলে সে চায়ের স্বাদ কিছুতেই ভালো হবে না। টি ভি ছেড়ে নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে আমার সঙ্গে কথা বলতে এলেও মালার মা যে খুব প্রসন্ন হবেন তা মনে

হয়না। তবু তিনি এলেন। সামনের চেয়ারটায় বসলেন। মুখ দেখে কিছু বোঝা গেলনা। চশমাটা খুলে নিয়ে খালি চোখে আমার দিকে তাকিয়ে একটু সৌজন্যের হাসি হাসলেন। অগত্যা আমিও হাসলাম। খুবই ফরমূলা মাফিক এইসব হাসাহাসি। মা চশমার ডাঁট দুটো নাড়াতে নাড়াতে বললেন, 'কখন এলে?'

আমি উত্তর দিলাম, 'এই তো, মিনিট ছয়েক।'

মালার মা একটু গম্ভীর প্রকৃতির মহিলা। এক ধরনের প্রৌঢ়াদের মুখ আছে যে মুখে গাম্ভীর্যটা ঠিক ঠিক খাপ খেয়ে যায়, এই মুখটা সেইরকম। মেয়েস্কুলের হেড দিদিমনি হলে ওঁকে চমৎকার মানাতো। উনি আবার মুখ খুললেন, বললেন, 'এদিকে কোন কাজে এসেছিলে বুঝি?'

প্রশ্নটা আমার কাছে গোলমেলে। মালা বাড়িতে কী বলেছে সেটা আমাব জানা নেই। মনে হচ্ছে সিনেমা দেখার ব্যাপারটা মা জানেনা। তাহলে মালার সঙ্গে দেখা হল কোথায়? প্রশ্নটা করেই উনি আমার দিকে তাকিয়েই রইলেন। অবশ্যই উত্তর আশা করছেন। কিন্তু এখন কী বলা? একা একা নিজের দায়িত্বে মিথ্যে বলা সহজ, যৌথ দায়িত্ব থাকলেই গণ্ডগোল। আমি উত্তর দেবার আগে ইচ্ছে করেই কাশলাম। বললাম, 'এদিকে এক বন্ধুর কাছে এসেছিলাম। রাস্তায়—।'

কথাটা শেষ করতে হলনা। মালা আমাকে তার ভয়ঙ্করী মা'র মুখোমুখি একলা ছেড়ে দিয়ে উধাও হয়েছিল বলে ভেতরে ভেতরে রেগে গেলেও এই মুহূর্তে মালাই আমাকে বাঁচাল। বলল, 'রাস্তায় বাসষ্টপেজে দাঁড়িয়েছিল। ডেকে নিয়ে এলাম।'

এরপর ছাড়া ছাড়াভাবে টুকটাক কয়েকটা কয়েক কথা চলতে লাগল। পাশের ঘরে টি-ভিতে তার স্বরে কেউ বুঝি গান গাইছে। মালার মা'র মনটা থেকে থেকে ওদিকে যাচ্ছিল। কিন্তু চোখজোড়া আমার ওপর। বিরস মুখে কাজের মেয়েটা চা নিয়ে এল। সঙ্গে একজোড়া বিস্কুট। হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই এনেছে। মালার

মা বললেন, 'সোজা অফিস থেকে আসছো তো, কিছু খাবে ?'

আমি চায়ের পেয়ালা নিতে নিতে বললাম, 'না-না, বন্ধুর বাড়িতে খেয়েছি।'

চায়ের কাপে দ্বিতীয় চুমুকটি যখন দিচ্ছি তখন উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি তো এখনও পার্মানেন্ট হওনি তাইনা ? কবে নাগাদ হবে ?'

বিষম খেয়ে ফেলেছিলাম আর কি ! আমার চাকরী নিয়ে এখনও যে কিছু প্রশ্ন অবশিষ্ট থেকে গেছে সেটা জানতে পারলে আমি কি আর এবাড়ির সীমানায় পা রাখি। মুখের চাটুকু গিলে নিয়ে বললাম, 'ঠিক জানিনা। হয়তো আরো মাস ছয়েক লাগবে।'

মালার মুখে কোন ভাবান্তর নেই। মা'র মুখের অভিব্যক্তি ঠিক ধরা গেলনা। আমার কোন ব্যাপারটাই যে পার্মানেণ্ট নয় সেই চরম সত্যটা ওঁকে বোঝানো সম্ভব নয়। জীবনটাই যেখানে টেমপোরারী সেখানে এসব প্রশ্ন কেন ওঠে, এরকম একটা দার্শনিক ভাব আমার মনে এলেও সেটা ওঁর সামনে প্রকাশ করা গেল না।

মালাদের বাড়ি থেকে উঠে হাজরার মোড়ে এলাম তেত্রিশ ধরবো বলে। আমি লাইটপোষ্টে হেলান দিয়ে সিগারেট খাই আর তেত্রিশ ছাড়া অন্য সব সরকারী বেসরকারী বাসকে সশব্দে চলে যেতে দেখি। চেতলায় যাবার তেত্রিশকে দেখি, কিন্তু শিয়ালদা ফেরার তেত্রিশকে দেখতে পাইনা। একটু একটু করে রাত বেড়ে যায়। অগত্যা ধর্মতলার মিনি ধরি। ধর্মতলা থেকে ট্রামে করে শিয়ালদা। আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে পৌনে ন'টার ব্যারাকপুর লোকালটা তখনও ঠাঁয় দাঁড়িয়েছিল। ন'টা নাগাদ ছাড়ল ছ'খানা গাড়ির প্যাসেঞ্জারকে তার পেটের মধ্যে ঠেসে নিয়ে।

আবার সেই অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ক্রমাগত রিক্সার তাড়া খেতে খেতে বাড়ি ফেরা। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে মোম খোঁজা নয়তো সর্বাঙ্গ কালো হয়ে যাওয়া হ্যারিকেনের অতি ক্ষীণ আলোয় প্যাণ্ট-

জামা ছাড়া। গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে গেছে। এখন স্নান করতে না পারলে কিছুতেই স্বস্তি আসবে না। তোয়ালে আর সাবান নিয়ে আমায় ঘর থেকে বেরুতে দেখে বৌদি বলল, 'গা ধুতে যাচ্ছো ?'

আমি মাথা নাড়লাম। বৌদি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'গা ধোবে কোত্থেকে ? এক ফোঁটাও জল নেই বাথরুমে।' কথাটা বলেই বৌদি নিজের ঘরে চলে গেল। আমি মা'কে ডাকলাম। বললাম, 'কী ব্যাপার বলতো ? এই গরমে একটু গা ধোবারও জল থাকেনা তোমাদের ! এত জল যায় কোথায় ?'

মা তার জলের হিসেব দেবে কোত্থেকে। ফলে সে অর্চনাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'তোর কী ন্যাকড়া দিয়ে মুছে জল খরচ করে রাখিস। ওদের জন্যে এক-আধ বালতি রাখতে পারিস না।'

অর্চনা অপরাধীর মতো জবাব দিল, 'বিকেলে জল এলে আমি তো টব ভর্তি করে রেখেছিলাম। কলে তো জল আসেনি।'

মা বলল, 'তাহলে এক টব জল গেল কোথায় ? বিকেলে অত জল খরচ করে গা না ধুলেই হয়।'

ব্যস যেই না বিকেলে গা ধোয়ার কথা উঠল অমনি বৌদি ফোঁস করে উঠে বলল, 'আমি শুধু একা গা ধুই, আর বুঝি কারো জল লাগে না।'

এবার রাখীর জবাব দেওয়ার পালা। কেননা, বিকালে গা ধোয়ার মধ্যে রাখীও আছে। সুতরাং দেখতে দেখতে রাখীতে, বৌদিতে ঝগড়া লেগে গেল। মা ছিল মাঝখানে, তার অপরাধ আরও গুরুতর, কেননা কথাটা সে-ই তুলেছে আর বৌদির ভাষায় 'পেটের মেয়ের দোষটা বুঝি চোখে পড়েনা,' অর্থাৎ মা রাখীর দিক টেনে কথা বলছে, ফলে অন্ধকারে তিনজনের বাকবিতণ্ডা চলতে লাগল ? স্নান করা আমার নাথায় উঠল, কোনক্রমে কলসী থেকে এক মগ জল নিয়ে পায়ে আর মুখে দিয়ে ঘরে এলাম।

তিনজনের গণ্ডগোল শুনে এবার বাবা আসরে নামলেন। ব্যাপারটা শুনে তাঁর মানে হল আজকের এই কলহের মূলে আমি।

অতএব, তিনি বললেন, 'এত রাত্রে বাড়ি ফিরে ওর গা ধোবার দরকার কী! এখন কী গা ধোবার সময়—অসুখ বিসুখ করে যেতে পারে। বাড়ির মেয়েরা গা ধোবে সে ঠিক আছে, কিন্তু ঐ দামড়া ছেলে এত গা ধোবে কেন?'

এরকম সময়ে আমি কখনও উত্তর দিই না। দোষটা আমার ঘাড়ে চাপিয়েও যদি ওদের ঝগড়া থামে তাহলেই বাঁচি। মেয়েদের ঝগড়া করতে দেখলে আমার খুব খারাপ লাগে। কিন্তু তাতে আর ওদের কী আসে যায়। আমি অন্ধকার ঘরে বসে ভাবি, হয়তো মালার সঙ্গেও একদিন এমন করেই জল নিয়ে, হ্যারিকেনের ফিতে কাটা নিয়ে ঝগড়া করবে। মাতে মালাতে, মালাতে-বৌদিতে, রাখীতে-মালাতে বিষম ঝগড়া হবে, আমি অফিস থেকে ফিরে সেই ঝগড়া শুনবো। কোনো পক্ষ নিতে পারবো না, শুধু শুনে যাব—শুনে যেতে যেতে ভাবব, এই আমার জীবন, এই আমার নিয়তি! দাদা যেমন ঝগড়ার সময় খবরের কাগজ মুখে নিয়ে নির্বিকার থাকে, আমাকেও তেমন হতে হবে।

রাত্রে খেতে বসে টের পাই, ঝগড়াটা থেমে গেলেও তার রেশটা থেকে গেছে। আমরা চুপচাপ খেয়ে উঠে যাই। অন্ধকারের মধ্যে রাত বাড়তে থাকে।

৫

সকালবেলা ঘুম ভাঙল বাবার গর্জনে। চোখ মেলে দেখি বারান্দায় বাবা, তার হাতে ইলেক্‌ট্রিকের বিল। নির্ঘাৎ বিলে টাকার অঙ্কটা বেড়ে গেছে। মা চা ছাঁকতে ছাঁকতে বলছে, 'এত যে লোড-শেডিং হয়, আলো জ্বলে না, তবু বিলতো কমে না। এর কী ব্যবস্থা!'

বাবা গলা ফাটিয়ে বললেন, 'সে ব্যবস্থা পরে, কিন্তু এই বিলের কী ব্যবস্থা হবে তাই ভাবো। বাহাত্তর টাকার বিল, ভাবা যায়? নিশ্চয়ই তোমরা হিটার জ্বালাও, নয়তো ইস্তিরি চালাও।'

আমি বাথরুমে যাচ্ছিলাম। আমাকে দেখিয়ে বাবা বললেন, 'এই লাটসাহেব আবার রাত্রে আলো জ্বালিয়ে নভেল পড়েন।'

কোন ইস্যু থেকেই আমার রেহাই নেই। অর্ধেক হপ্তাতো রাত্রে আলোই থাকে না, পড়বটা কী করে। কথাটা বাথরুমে দাঁড়িয়ে মনে মনে বললাম। বাবার সামনে বললে কেমন হতো সেটা ভাবতে পারছিনা। আমি মুখ ধুয়ে ফিরে আসতেই বাবা বললেন, 'বিলটা নিয়ে তুই যাবি, জিজ্ঞেস করবি এত বাড়ল কেন?'

আমি বিষণ্ণ মুখে বললাম, 'আমি কী করে যাব, অফিস আছে না? অন্য কাউকে বল।'

আমাব অফিসের ব্যাপারটা বাবার মনেই থাকেনা। অগত্যা ডাক পড়ল নব'র। মা সেই একই কথা আউড়ে যাচ্ছে, 'আলো নেই অথচ বিল বাড়ছে।'

দাদা মা-কে বোঝাবার ভঙ্গি করে বলল, 'বাতি নিভলেই সব সুইচ অফ করে রাখতে হয়। নইলে আলো আসার সময় মিটার জাম্প করে, মানে লাফায়।'

মা অবাক চোখে দাদার কথা শুনতে শুনতে বলে, 'তোদের মুখে এসব নতুন শুনছি। এত লাফালাফি তো আগে ছিল না। আর থেকে থেকে শুধু আমাদের মিটারটাই এত লাফাচ্ছে কেন?'

মা-র কথা কেউ গ্রাহ্য করল না। অফিস যাবার তাড়ায় সবাই ব্যস্ত, যে যার মতো নিজের নিজের কাজে ছোটাছুটি করতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

অফিসে এসে মনটা খুশীতে ভরে গেল। আজ অফিসের সোস্যাল ফাংশন, অতএব, কাজের কোন বালাই নেই। স্বয়ং বড়বাবু রিসেপশন কমিটির সভাপতি, অতএব, আদ্দির পাঞ্জাবী পরে তিনিও ইতিমধ্যেই ব্যস্ত হয়ে গেছেন ফাংশনের কাজে। বেলা তিনটের মধ্যে অফিস ফাঁকা হতে লাগল। চারটে নাগাদ আমি বেড়িয়ে এলাম। ফাংশনে

যাবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। অফিসের বাইরে এসে মনে হল, কী করা যায়? কোথায় যাই? মালাকে ফোন করব? যদি বাড়িতে না থাকে! যদি ওর মা ফোন ধরেন? ভাবতে ভাবতে লালদীঘি পেরিয়ে এসেছিলাম। ময়াল সাপের মতো এঁকে-বেঁকে দীঘির চারপাশ দিয়ে ট্রাম ঘুরছে। অফিস ছুটি হতে এখনও ঢের দেরী, তবুও ট্রামগুলো ফাঁকা যাচ্ছেনা। তার মানে এঁরা সব পার্মানেণ্ট ঘুঘু কর্মচারী। চাকরী জীবনের যদি কোন সুখ থেকে থাকে তা এদের জন্যেই। এরা বাড়ি যাবে, ভাল করে গা ধোবে, জলখাবার খাবে তারপর বৌয়ের সঙ্গে গল্প করতে আরম্ভ করবে। পাড়ার সিনেমায় এরাই ইভনিং শোগুলোকে হাউসফুল করে। মালাকে টেলিফোন করতে পারলে হয়তো একটা সিনেমা দেখা যেত। কিন্তু সে নানা হাঙ্গামা। ফোন ধরবে, মা-কে ম্যানেজ করবে তারপর এতটা পথ এসে সিনেমা দেখে আবার একা একা ফিরে যাবে। যদি পৌঁছে দেবার জন্যে সঙ্গে যেতে বলে তাহলে রাজী হতেই হবে, তার মানে বাড়ি ফিরতে সেই দশটা।

মালার চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলতে হল। ডেকার্স লেনে এসে চা খাবার জন্যে দাঁড়ালাম। সন্তোষের সঙ্গে এখানেই দেখা হয়ে গেল। চেহারাটা মুটিয়েছে, দিব্যি গোলগাল ফর্সা চেহারা। হাতে ভি-আই-পি স্যুটকেস। দু'পায়ের ফাঁকে সেটাকে চেপে রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়ে হাসল। চোখের ইশারায় কাছে ডাকল। পিয়ারলেস করে সন্তোষ এখন দারুণ পয়সা কামাচ্ছে। আমি কাছে যেতেই বলল, 'কী খবর, চাকরী পেয়েছিস শুনলাম।'

আমি ঘাড় নাড়লাম। সন্তোষ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'তা একদিন সেলিব্রেট কর খাওয়া-টাওয়া।'

আমি চায়ের অর্ডার দিয়ে বললাম, 'এখন প্রভিশন পিরিয়ড চলছে। শেষ হোক, খাওয়াবো।'

চা শেষ করে ব্যাগটা হাতে নিয়ে সন্তোষ বলল, 'একদিন বাড়িতে

আয়না, মা তোর কথা খুব বলে। কবে আসবি ?'

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বললাম, 'দেখি, যাব একদিন।'

সন্তোষ বলল, 'এখন আর বরানগরে থাকিনা। সল্টলেকে ফ্ল্যাট কিনেছি। একদিন চলে আয়। বাই দি বাই, সুভাষের সঙ্গে তোর যোগাযোগ আছে ?'

আমি সন্তোষ আর সুভাষ বঙ্গবাসীতে পড়বার সময় থ্রি মাস্কেটিয়ার্স ছিলাম। অন্যরা আমাদের তাই বলত। সুভাষ এখন রাজনীতি করে। অফিস পাড়ায় মাঝে মাঝে দেখা হয়। ওর চোখে এখনও স্বপ্ন, আশ্বিনের রোদ্দুরের মতো সেই স্বপ্ন সুভাষের সারা বুকে নেচে বেড়ায়। শোষণমুক্ত সমাজ তৈরিতে ওদের যে চেষ্টা আর সংগ্রাম তা নাকি অচিরেই ফলবতী হবে। হলে ভাল, কিন্তু সেটা কবে হবে সেকথা সুভাষ নিজেও জানেনা। আমি বললাম, 'দেখা হয় মাঝে মাঝে, একই রকম আছে। বদলায়নি।'

সুভাষের হয়ে কথাটা বললেও আসলে এটা আমার নিজেরই কথা। আমি মনে মনে সন্তোষের ওপর চটেছি। চটবার কোন উপযুক্ত কারণ নেই। তবুও ওর এই ফ্ল্যাট কেনা। গাড়ী মেইনটেইন করা, দামী সিগারেট খাওয়া এগুলো খুব গোপনে আমার ভেতরে একটা জ্বালা ধরাচ্ছিল। আমরা প্রায় একই বয়েসী, ছাত্র হিসাবে আমি ওর থেকে অনেক ভাল ছিলাম, তবু আমি এসব পারিনি। পারলে খুশী হতাম, কিন্তু পারিনি বলেই সন্তোষের পারাটা আমার ভাল লাগছে না। এটার নামই কী পরশ্রীকাতরতা ? হিংসা ? হয়তো তাই। কিন্তু এটা আমার হয়। একটা কেরিয়ার করার লোভ মনে মনে সবারই থাকে। যে পারে সে উতরে যায়, যে পারেনা, সে তখন মেকী আদর্শবাদী সেজে কেরিয়ারিষ্টদের গাল দেয়। যে লোক অফিসে বড় রকমের উন্নতি করতে পারেনা, সে ধরে নেয়, দুনিয়াশুদ্ধ লোকের উন্নতির মূলে কোন দুনম্বরী লাইন আছে। জীবন যখন একইভাবে, একই গতিতে বয়ে যেতে যেতে আমাকে বয়স্ক করে তুলবে তখন এই ব্যাধি আরো প্রবল হবে আমার মধ্যে। আমি

খুব সাধারণ বলেই আমার মধ্যে কমপ্লেক্স। শব্দটার প্রয়োগ সঠিক হল কিনা জানিনা, বোধহয় এইরকমই বলে। দুর্গাপুর ষ্টিল প্ল্যান্টের ইঞ্জিনিয়ার ছেলের সঙ্গে মালার মামা মালার সম্বন্ধ আনতে চাইছে। আমি মনে মনে মালার মামার ওপর তো চটছিই, তামাম ইঞ্জিনিয়ারদের ওপরও আমার রাগ। অথচ আমি জানি আমার বোন রাখীর সঙ্গে ওই রকম একটা সম্বন্ধ এলে আমার বাবা এবং মা'র সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেজায় খুশী হবো। রাখীর যদি কোন প্রেমিক থাকে, সে যদি হয় কোন কেরাণী,তদুপরি টেম্পোরারী ষ্টাফ ! তাহলে তার জন্যে রাখীকে অপেক্ষা করিয়ে রাখব না আমরা। অথচ নিজের বেলায়, আমি মালার মামার ওপর চটে যাচ্ছি।

মালা বলে, সম্বন্ধ আনা মানেই তো বিয়ে হয়ে যাওয়া নয়। তুমি এত ক্ষেপে যাচ্ছ কেন ? মামার দোষ কোথায়। সে কি জানে তোমার কথা।

জানলেও যে খুব একটা সুরাহা হবে তেমন ভরসা বিশেষ দেখি না। কিন্তু মুখে সেকথা বলিনা। মালা আমার রাগটা বুঝতে পারে। বলে, অযথা, রেগে গিয়ে লাভ নেই।

মালার জামাইবাবু নাকি জাঁদরেল সি. এ। ব্যাঙ্কের বড় অফিসার। বাড়ির দুটো জামাইয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক দেখা যাচ্ছে। এক সময়, অর্থাৎ প্রেমে পতিত হবার পর পরই এসব নিয়ে বেশ ভাবতাম। চাকরীটা পেয়েও যখন দেখলাম শ্রেণী চরিত্র বিশেষ বদলালো না তখন থেকে আর ভাবিনা। আজ হঠাৎ সন্তোষের কথায় এই সব ব্যাপার এসে গেল। উড়াল পুলের কাছে এসে নেমে পড়লাম। আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়া যাক। মা দেখে খুশী হবে। ষ্টেশনের ভেতরে ঢুকেই টের পেয়ে গেলাম আজ বড় রকমের গণ্ডগোল। গণ্ডগোল তো নিত্যকার ব্যাপার, আস্তে আস্তে সব সয়েও গেছে, তবে আজ একটু অন্যরকম মনে হল। কেন যে রেলে এমন হয় সে রহস্যটা ভাল জানিনা। কিন্তু আমার লাঞ্ছনা দিনের পর দিন বেড়েই চলে।

কোথায় নাকি কে তার কেটেছে, তাই তার মেরামত না হওয়া পর্যন্ত গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। তার কখন মেরামত হবে, আদৌ আজ হবে কিনা সে কথা ঈশ্বরই জানেন। আমি শুধু জানি, আজও বাড়ি পৌঁছতে দেরী হয়ে গেল—আজও!

৬

এই ভাবেই আমার দিন-রাত্রিগুলো আসে এবং চলেও যায়! কোথাও কোন ছায়া নেই, নিশ্চিত বলে কোন আশ্বাস নেই, অনন্ত আক্ষেপেব কোন সান্ত্বনা নেই। আক্ষেপ করা আমার সাজে কিনা জানিনা, তবুও ওটা থেকে যায়। হয়ত আমার বয়সী সব যুবকেব বুকেব মধ্যেই এটা বাসা বেঁধে আছে। কৈশোরে অনেক এলোমেলো ভাবতাম। স্কুলে রচনা লিখতে গিয়ে অনেক বার লিখেছি আমি বড় হয়ে সুভাষচন্দ্র বসু হতে চাই। কিন্তু আজ জানি, বুঝতে পারি সেটা হতে চাওয়া বোকামী। এ সময় এদেশের মাটিতে কোন বড় মাপের মানুষ জন্মায় না। দেশটা যখন ব্রিটিশের বুটেব তলায় ছিল তখন অনেক মানুষ জন্মেছে, বড় হয়েছে। এখন আমাব মতো ইডিয়েটরা জন্মায় আব সারা জীবন আক্ষেপে জ্বলতে জ্বলতে মরে। কিছু ধান্দাবাজ জন্মায় যারা আমার থেকে ভাল ভাবে বেঁচে থাকে। যৌবনে পা দিয়ে আর দশজনের মতো আমিও বিস্তর স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছি। কলেজ ম্যাগাজিনে প্রেমেব কবিতা লিখেছি। তাবপর সুভাষের পাল্লায় পড়ে যখন ছাত্র ইউনিয়ন করেছি তখন বুঝেছি প্রেম-ট্রেম নেহাৎ রোম্যান্টিক বিলাস। অতএব খান কয়েক সংগ্রামী কবিতা লিখে মনে হয়েছিল দেশের কাজ অনেকটা এগিয়ে গেল। এখন বুঝি, কোথাও কিছু এগোয় নি। চড় চড় করে তেলের দাম বাড়লে আমার সর্বশক্তিমান নেতারা আমারই মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে এবং সেই তেল কেনেও। কেন যে ভোটের পরেই সব জিনিসের দাম চড়ে যায় সেটা বুঝতে পারি না। হয়তো

বাবার কথাটাই ঠিক। আমি নিখাঁত একটি ইডিয়ট বলেই এসব আমার মাথায় ঢোকেনা। আসলে আমি বেশি কিছু চাইনি কখনও, আমার চাওয়াটা সামান্য ছিল বলেই আক্ষেপটা বেশি। ভারতের সংবিধান একজন নাগরিককে, আমার মতো একজন যুবককে কতটুকু কী দেবে বলে অঙ্গীকারবদ্ধ তা আমি জানি না। কখনও আমি স্বদেশের সংবিধানে পড়ি নি, চোখেও দেখিনি। আমি কখনও সল্টলেকে সরকারী ফ্ল্যাট আশা করিনা, বিনামূল্যে সরকার আমাকে পড়াবেন এমন দুরাশা কখনও ছিল না, আজও নেই, বিনা পণে, আমার বোনের বিয়ে হবে, কিংবা আমার জন্যে হাসপাতালে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত থাকবে এসব কথা কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি সময় মতো ট্রেনে চাপতে চেয়েছি, বসবার জায়গা চাইনি দাঁড়িয়ে সময় মতো শিয়ালদা পৌঁছতে চেয়েছি যাতে অফিসের হাজিরা খাতায় রোজ রোজ লেট না হয়। কলকাতায় টেলিফোন-গুলো সচল থাকুক, ট্রাম-বাস বিনা বাধায় সময় মাফিক চলাচল করুক, সারাদিন পর বাড়ি ফিরে গা ধোবার জন্যে এক বালতি জল আর একটু বিদ্যুতের আলো। ব্যস্ শুধু এইটুকুই চাই—এর বেশি কিছু কখনও চাইনি।

অথচ আমার দিনগুলো যেমন ঘামে ভেজা, রাতগুলোও তেমনই অন্ধকারে ডোবা। যেন, ঘোলাজলের মধ্যে ডুবে আছে আমার যাবতীয় ইচ্ছা সুখ আর স্বপ্ন। চোখের জলের স্বাদ নোনতা, ঘামের স্বাদও তাই। এক এক সময় অন্ধকার রাতে যখন সারা শরীর ঘামে ভিজে বিছানার চাদর, বালিশ সপসপ করে তখন মনে হয় আমার আত্মা বুঝি অন্ধকারে কাঁদছে। বাড়ির বাচ্চা মেয়ে দুটোর সর্বাঙ্গে ঘামাচি হয়ে জ্বালা করতে থাকে। গরমে প্রায়ই ওদের করুণ কান্না আর বউদির ধমক শুনতে পাই। মা সারারাত হাতপাখা চালিয়ে চালিয়ে হাওয়া খায়। নিজেকে আমার খুব অসহায় মনে হয়। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখি, বাড়ির জন্য মিনি জেনারেটর বিক্রি হচ্ছে। টাকার অঙ্কটা দেখে পিছিয়ে আসি। হঠাৎ হঠাৎ এই অন্ধকার হয়ে যাওয়াটা

আমার খুব প্রতীকি মনে হয়। আসলে সেই আদিম যুগেই বুঝি চলে যাচ্ছি আমরা, যখন সূর্য ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন আলো ছিল না। ভাগ্যিস সূর্য সরকারী সম্পত্তি নয়!

আজ সন্ধ্যায় বাড়ি এসে শুনেছি দাদার অফিসে সহসা লক আউট হয়ে গেছে। ফ্যাক্টরীতে গণ্ডগোল চলছিল, তারই পরিণতি এই লক আউট। বাড়িতে থমথমে পরিবেশ। মাস ফুরালে দাদার মাইনে বন্ধ, কিন্তু খরচেব স্রোত বন্ধ থাকবে না। খেতে বসে দেখলাম দাদা অন্যমনস্ক, চুপচাপ। কাল থেকে দাদার অফিস বেরুবার কোন তাড়া নেই। মাকে সব ব্যাপারটা বোঝানো যায় না। মা বলে, লক আউট আবার কি! নিজেদের অফিস নিজেরাই বন্ধ করে দিল, এবা কেমন লোকরে!'

বাবা মা-কে ধমক দিয়ে বলেন, 'তুমি থামবে! তোমার মুখে লক আউট হওয়া দরকার। প্রবলেমটা ভাবতে দাও।'

মা ধমক খেয়ে বাবার দিকে তীব্র চোখে তাকাল। বাবাকে ভাবতে দেখে বলল, 'তুমি ভাবতে বসলেই কী ওদের অফিসের তালা খুলে যাবে। ভেবে ভেবেই তো সংসারের এই হাল করেছ।'

মা গজগজ করতে রান্নাঘরে ঢোকে। বাবা খেতে খেতে ভাবতে থাকে। দাদাও সম্ভবত ভাবছে। আমার কিছু ভাবতে ইচ্ছা করে না। কেননা, আমি জানি, আমার দেশে লক আউটটাও একটা অনিবার্য ঘটনা। কোন আইনেই এটা বন্ধ হবার নয়। বোধহয় এটাও একধরনের ব্যবসাবুদ্ধি থেকে আসে। আজ থেকে যে এদেশের আরো বাইশ শো পরিবার নতুন করে অনাথ হতে বসল তার জন্যে কলকাতার বাতাসে কোন উদ্বেগের গন্ধ নেই। হয়ত আজই শ্রমমন্ত্রী কোনো বণিক সভায় রাত্রে নৈশ ভোজের আসরে বক্তৃতা দেবেন, মুখ্যমন্ত্রী পুষ্পপ্রদর্শনী উদ্বোধন করবেন এবং প্রধানমন্ত্রী দেশের স্বয়ম্ভরতার বিষয়ে সাংবাদিকের কাছে তাঁদের প্রচেষ্টার বিবরণ তুলে ধরবেন। কাল সকালে এক টাকা দিয়ে কাগজ কিনে সেইসব বক্তৃতার সচিত্র বিবরণ পড়ব।

আমার ঘরের মোমটা শেষ হয়ে এসেছিল। নতুন মোম নেই। আজই কেনা উচিত ছিল, কিন্তু কেনা হয়নি। দাদা তার সেই বিখ্যাত টর্চ জ্বালাবার চেষ্টা করছে। আলোতে নয়, টর্চের পেছনে ধাক্কা মারার শব্দে সেটা টের পাচ্ছি। বোধহয় রান্নু বুলবুলকে ঘুম থেকে তুলে পেচ্ছাপ করাবার জন্যে এখন আলোর দরকার। ঘুমে ঢুলুঢুলু মেয়ে দুটোর থুতনী গড়িয়ে ঘাম ঝরছে। বউদি বিরক্ত মুখে ওদের নিয়ে বাথরুমে গেল। আমি এক টুকরো মোম কিংবা হ্যারিকেন যে কোন একটার খোঁজে মার কাছে গেলাম। মা পাখার ডাঁট দিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছিল। আমার কথা শুনে বলল, 'মোম এখন কোথায় পাব। দিন থাকতে তো মোমের কথা কারো মনে আসে না। ঐ হ্যারিকেনটা নিয়ে যা।'

ঐ হ্যারিকেন মানে সেইটা, যা আলো দেয় না, শুধু ধোঁয়া ছড়ায়। কিন্তু হ্যারিকেন আনতে হল না, আলো এসে গেল। ঘরে এসে আলো এবং পাখা দুটোই চালিয়ে দিয়ে বসে রইলাম। বৌদি ঘরে এলো। খাওয়ার পর বৌদি আমাকে এলাচদানা দিয়ে সুপুরী খেতে দেয়। আজও দিল। বৌদির মনটা ভাল নেই। আমি আশ্বাস দেবার জন্যে বললাম, এত ভেবে কী করবে। আমরা তিনজন কাজ করি, একজন বসে গেল। কিন্তু যাঁদের শুধু একজনই রোজগার করে তাদের কথা ভেবো তো?

বৌদি ছোট্ট করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, মাস গেলে রান্নু-বুলবুলের স্কুলের মাইনে, মাষ্টারের বেতন, ওদের রোজ একটাকা করে টিফিন এসব তো বন্ধ করা যাবে না, অথচ……

বৌদি থেমে গেল। আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বৌদিকে দেখলাম। আমার মনে একটা বেপরোয়া ভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আমার মা'র মুখে যেমন দুঃখের ছায়া ভেসে থাকে, যা শুধু আমিই টের পাই, এখন বৌদির মুখেও সেই ছায়াটা দেখতে পেয়ে আমার ভেতরটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আমি সিগারেটে টান দিয়ে বললাম, তোমার ভাবনা কেন? সে আমরা ভাবব। তুমি ঘরে

যাও।'

বৌদি চলে যেতে আমাব মনে পড়ল আমাব প্রভিশন পিরিয়ড চলছে, মাসে মাইনে পাই—

মাইনের অঙ্কটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। মনে পড়ল এই অঙ্কটা শুনে মালার মা'র মুখটা কেমন হয়েছিল। একজন কেরাণীর বুকে এতখানি বেপরোয়া স্পর্ধা কেমন কবে এল? আমি কি বৌদির বিপন্ন মুখের ভেতর আমার মা-কে দেখেছিলাম না কি মালাকে? পৃথিবীর সব বিপন্ন নারীর মুখই কি একই বকম? বৌদির মুখ আমাকে বাইশ শো বউ, অথবা মা'র মুখকে মনে কবিয়ে দিয়েছিল—যাঁরা আজ অনির্দ্দিষ্টকালের জন্যে আরো গভীর অন্ধকারে ডুবে গেল। দাদার অফিসের কিম্বা ফ্যাক্টরীর কাউকে আমি চিনি না, কোনদিন দেখি নি। কিন্তু এখন ওঁদের সবাইকে আমার মা অথবা বৌদির মতো মনে হল। আমি বুকের মধ্যে যন্ত্রণা টের পেলাম। চোখ বুজে ফেলেছিলাম, তবুও দৃষ্টি অন্ধ হল না। সারাদিনের নানা ছবি টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল চোখেব ওপর। মাথার মধ্যে দুশ্চিন্তা থাকলে আমার এরকম হয়। ঘুম সরে যায় চোখের পাতা থেকে, গোটা শবীর জুড়ে দাপাদাপি করে একটা অন্ধ ক্রোধ অথচ সেটা কখনই শবীর ছেড়ে বাইরে আসে না।

বেলা বাবোটা নাগাদ বড়বাবু ডাকলেন। কাছে যেতেই ফোনটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার, হাসপাতাল থেকে।' আমি তাড়াতাড়ি ফোনটা তুলে নিতেই ওখান থেকে নব'র গলা পেলাম।

'দাদা, আমি নব, আর জি কর থেকে বলছি। মা বাথরুমে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। কোমরে ফ্যাক্‌চার হয়েছে। তুই তাড়াতাড়ি চলে আয়।'

বুকের মধ্যে ধক ধক আওয়াজ উঠছিল। ছুটি নিয়ে অফিসের বাইরে এলাম। পকেটে বেশি টাকা নেই, নইলে ট্যাক্সি করে যাওয়াই উচিত ছিল। অগত্যা ট্রাম ধরতে হল। আমার মনটা

যত জোরে ছুটছে, ট্রাম চলছে তার চাইতে অনেক আস্তে। বৌ-বাজারের মুখে এসে ট্রামটা আটকে গেল। উল্টোদিক থেকে ট্রাম লাইন জুড়ে বিশাল মিছিল আসছে। জানালা দিয়ে মুখ বার করে দেখতে চাইলাম মিছিলটা কাদের? কিছু বোঝা যাচ্ছে না—হয়তো কোন বন্ধ কারখানার শ্রমিক কর্মচারী, নয়তো গ্রামের কিষাণ, কিম্বা প্রাথমিক শিক্ষক। মিছিলের সব মুখগুলোই আমার এক রকম মনে হয়। ট্রামটার নড়বার উপায় নেই। ওয়েলিংটনের দিক থেকে শ্যামবাজারের একটা প্রাইভেট বাস আসছিল। ওরা ঠিক গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে চলে যেতে পারে—কিন্তু মিছিল শেষ হলেও ট্রামের এই দীর্ঘ সারি সহজে গতি ফিরে পাবে না। আমার ভেতরটা ছটফট করছিল। আমি নেমে পড়লাম। মিছিলের ওপাশে বাসটা দাঁড়িয়ে—মিছিলের লাইনে কোন ফাঁক রাখছে না ওরা। বাসটাও আমারই মতো থমকে দাঁড়িয়ে আছে এপাশে আসার জন্য। আমাদের মাঝখান দিয়ে মিছিলের সার চলেছে। হঠাৎ সুভাষের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। শ্লোগান দিতে দিতে মিছিলের পাশে পাশে যাচ্ছে সুভাষ। মুহূর্তের জন্যে হাসি বিনিময়। সুভাষ হাসল, আমি হাসতে পারলাম না। আমার মনে হল শহরের সমস্ত গতিকে থামিয়ে রেখে শুধু সুভাষরাই এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। —আমার রাগ হতে লাগল। আমি বুঝতে পারছিলাম না, কার এগিয়ে যাওয়াটা জরুরী, সুভাষের না আমার। আমার মা হাসপাতালে, আমি জানিনা মা কেমন আছে, কী করছে, মৃত্যু তার কতখানি কাছে অথবা দূরে, আমি মা'র কাছে যেতে চাই অথচ পথ আটকে রাখছে সুভাষরা। সুভাষদের মিছিলটা যতখানি সত্য, আমার কাছে আমার 'মা' তার চাইতে কম নয়। সুভাষরা লড়ছে বাইশশো পরিবারের জন্য। এখানে, ঠিক এই মুহূর্তে কোনটা ন্যায়, আমার এই রাগটা না সুভাষের ওই হাসিটা?

হাসপাতালে পৌঁছে দেখলাম নব পাগলের মতো ছোটাছুটি করে ডাক্তার-নার্সদের করুণা ভিক্ষা করছে। মাকে তখনও বেডে দেওয়া

হয়নি। কোমরের হাড় ভেঙ্গেছে শুধু এই তথ্যটুকু জানিয়ে ডাক্তাররা যে যার কাজে চলে গেছেন। মা যন্ত্রণায় চিৎকার করে কাঁদছে। আমাকে দেখামাত্র মা'র দু'চোখের কোল ছাপিয়ে জলের ঢেউ নামল। মা আমার হাতটা ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'বড্ড কষ্ট হচ্ছে রে, একটু ব্যবস্থা কর।'

আমি জানি আমার মতো সাধারণ লোকরা কলকাতার হাসপাতালে কোন পাত্তাই পায় না। চেনাশোনা লোক ধরতে হয়। এখানে আমার কোন চেনাশোনা নেই। আমিও নব'র মতো ডাক্তার-নার্সদের পেছনে ছুটতে লাগলাম। ওঁরা সবাই ব্যস্ত, কেউ দু' দণ্ড দাঁড়িয়ে আমার কথা শোনে না। সারাদিন অনেক রুগী দেখে আর রুগীর কান্না শুনে শুনে ওদের চোখ কান সয়ে গেছে। অবশেষে একজন দাঁড়ালেন! সব শুনে টুনে মা'র কাছে গিয়ে বললেন, 'কি হয়েছে? ব্যথা তো একটু হবেই। ব্যথা কমার ওষুধ দিয়ে দেব। ঘুমিয়ে পড়বেন।'

আমি যখন মা'র কাছ থেকে চলে এলাম তখনও মা যন্ত্রণায় কাঁদছে। ওষুধ খাওয়ার পর ডাক্তার এসে দেখবেন। কিন্তু মা-কে ওভাবে ফেলে রেখে আসতে আমার খারাপ লাগছিল। জীবনে আরও একবার বুঝলাম, আমি কত অসহায়। বারান্দায় থামের গায়ে হেলান দিয়ে শুকনো মুখে নব দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে বলল, 'মা এখনও কাঁদছে?'

আমি ঘাড় নাড়লাম। নব বলল, 'সেজন্যই মা'র কাছে থাকতে আমার খারাপ লাগছিল।'

আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'তুই আর বলাই বাড়ি চলে যা। আমি হাসপাতালে থাকবো।'

বলাই নব'র বন্ধু। ওরাই ট্যাক্সি করে মাকে এখানে নিয়ে এসেছে। নব বলল, 'তুই একা থাকবি?'

আমি ঘাড় নাড়লাম। নব বলল, 'তার চেয়ে বলাই চলে যাক। ও গিয়ে বাড়িতে সব খবর দেবে। বড়দা বরং কাল সকালে চলে

আসুক।

নব'র প্রস্তাবটা খারাপ নয়। দু'জনে থাকলে মনে অনেকটা জোর পাওয়া যায়। আমি নবকে বললাম, 'তোর সঙ্গে টাকা আছে?'

নব প্যান্টের পকেট থেকে বারোটা টাকা বার করে বলল, 'বাড়িতে টাকা ছিলনা, বৌদি লক্ষ্মীর ঘট ভেঙ্গে তিরিশ টাকা দিয়েছে আর মা'র কৌটো থেকে পনেরো টাকা পেয়েছি। ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে এই আছে।'

বলাইকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি আর নব থেকে গেলাম। হাসপাতালের বারান্দায় তখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু লোক ছিল। আস্তে আস্তে সে ভীড়টাও কমে গেল। নব জিজ্ঞেস করল, 'কিছু খাবি না।'

আমার খিদে ছিল না। যদিও সকালে ভাত খেয়ে অফিস বেরুবার পর আর কিছু খাইনি, তবুও একদম খিদে পাচ্ছে না। নব'র খিদে পেয়ে থাকতে পারে। ওকে বললাম, 'তোর কাছে যে টাকা আছে তাই দিয়ে কিছু খেয়ে আয়। আমি খাব না।'

নব রাজি হল না। আমরা দুজন বারান্দার সিড়িঁর ওপর পাশাপাশি বসলাম। আকাশে ঝকঝকে চাঁদ, কয়েকটি ক্ষীণ তারা আর কয়েক টুকরো ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ। সামনে কৃষ্ণচূড়ার গাছে হাওয়া লেগে পাতাগুলো এলোপাথারী কাঁপছে। মা'র মুখটা বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। হঠাৎ নব আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমাদের সামনে দিয়ে মৃদুস্বরে কথা বলতে বলতে কিছু লোক খাটিয়া সাজিয়ে একটা ডেডবডি নিয়ে চলে গেল। রাস্তার ওপর পড়ে রইল কয়েকটা সাদা খই, একটা রজনীগন্ধার ভাঙ্গা ডাটি আর আমাদের নাকে তীব্র হাহাকরের মতো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল অগরুর গন্ধ, যা শুধু শবযাত্রার স্মৃতিকে জাগ্রত করে—গন্ধের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুকে মনে করিয়ে দেয়। দৃশ্যটা হাসপাতালে আকছার হয়, তবু আজ এই সংক্ষিপ্ত শোকযাত্রা আমাদের দু'ভায়ের ভেতরে তোলপাড় করতে থাকে। নব আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল, এবার আস্তে

আস্তে ছেড়ে দিয়ে নিজের হাঁটুর ওপর মুখ গুঁজে দিল। আমি পেছন থেকে বুঝতে পারলাম নব কাঁদছে।

৭

অপারেশনের আগের দিন জানা গেল মাকে রক্ত দিতে হবে। আর. জি. কর-এ মা'র জন্য রক্ত পাওয়া গেল না। আমি ছুটলাম — মেডিক্যাল-এ। আমার অফিসের এক বন্ধু মেডিক্যাল থেকে রক্তের ব্যবস্থা করে দেবে, যেহেতু বিমল একজন ছাত্র। এগারোটায় অপারেশন করার কথা, দশটার মধ্যে রক্ত এনে অপারেশন থিয়েটারে জমা দিতে হবে। আমি আটটায় মেডিক্যাল কলেজের ব্লাড-ব্যাঙ্কের সামনে পৌঁছে দেখলাম বিমল তখনও আসেনি। বিমল আসবে শিবপুর থেকে। ঘড়ির কাঁটা লাফিয়ে লাফিয়ে এগুতে থাকল। আমি ব্লাড ব্যাঙ্কের সামনে পায়চারি করছি, ঘনঘন ঘড়ি দেখছি আর একটা উদ্বেগ আমার বুকের মধ্যে ভয়ঙ্কর ভাবে দাপাদাপি করে যাচ্ছে। আমি রক্ত নিয়ে গেলে তবে মা'র অপারেশন আরম্ভ হবে। দেখতে দেখতে নটা বেজে গেল। বিমলের পাত্তা নেই। আমি যেন ক্রমশ অসাড় হয়ে যাচ্ছিলাম। রাগ, দুঃখ অথবা উৎকণ্ঠা সব তালগোল পাকিয়ে গিয়ে আমাকে ক্রমশ পাথর করে তুলেছিল। দুঃশ্চিন্তা সহ্য করারও বোধ হয় একটা সীমা থাকে। সেই সীমা পেরিয়ে গেলে মানুষ কী পাগল হয়? আমি সিগারেটটা উল্টো করে ধরিয়ে ফেলেছিলাম। ফিল্টারের দিকটা পুড়ে গিয়ে বেদম কাশি উঠল। দু'চারজন লোক কাশির শব্দ শুনে বিরক্ত মুখে আমার দিকে তাকাল। আমি সিগারেটটা ফেলে দিয়ে রেলিঙের ধারে বসে পড়লাম। চোখ বুঁজে নিঃশ্বাস নিলাম। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টের পেলাম, আমার পা কাঁপছে, মাথা টলছে। রেলিঙ ধরে আবার বসতে যাব তখনই প্রায় ছুটতে ছুটতে বিমল এল। অপরাধীর মতো ওর মুখ। বলল, 'কিছু মনে

করিস না, দেবী করে ফেলেছিল। হাওড়া ব্রিজ জ্যাম, পুরো ব্রিজটা হেঁটে এসে বাস ধরেছি। বড়বাজার পেরোতে সাড়ে আটটা বাজিয়ে দিল।'

সাড়ে ন'টার মধ্যেই রক্তের ব্যবস্থা করে দিল বিমল। বোতলটা আমার হাত দিতে দিতে বলল, 'খুব সাবধান।' এবার ট্যাক্সি ধরার পালা। ট্যাক্সি পাই কিন্তু আর জি কর যেতে রাজী করাতে পারিনা। সবাই দক্ষিণে যেতে চায়। উত্তরে যাওয়ার যে কী মানা কে জানে। বিমল ট্যাক্সি ধরতে রাস্তার ওপাশে ছোটে, আমি এ পাশে। মেডিক্যাল কলেজে গাড়ি ঢুকলেই পেছনে পেছনে দৌড়ই, কিন্তু কেউই মিটার ডাউন করে না, সবারই নাকি ভাড়া আছে। এমারজেন্সির সামনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। রোগী নেমে যেতেই আমি সোজা ড্রাইভারের পায়ের সামনে বসে পড়লুম। আমার দু'হাতে রক্তের বোতল, চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে জলে, কথা বলতে গিয়ে কান্নাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল আরও। ড্রাইভার প্রথমটায় ঘাবড়ে গেল। পরে নিজেই দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'ঘাবড়াবেন না, যত তাড়াতাড়ি পারি পৌঁছে দেব।'

আমি পেছনের সিটে রক্তের বোতলটা আঁকড়ে নিয়ে বসলাম। বিমল ড্রাইভারের পাশে। গাড়ি চলল।

মির্জাপুরে দিয়ে গাড়ি ঢুকতে পারল না। রাস্তায় গাড়ির জট লেগে গেছে। ড্রাইভার গাড়ি ব্যাক করে মহাত্মা গান্ধী রোডে ঢুকতেই মির্জাপুর জ্যাম হওয়ার রহস্যটা বোঝা গেল।

মহাত্মা গান্ধী ধরে ছাত্র ও যুবকদের মিছিল আসছে। ড্রাইভার গাড়ি ঘোরাবার চেষ্টা করল। কিন্তু জায়গা নেই। তিন চার হাত ব্যাক করেই গাড়ি থেমে গেল। চারপাশে থই থই করছে গাড়ি। আমরা মাঝখানে আটকা পড়ে গেছি। মিছিলটা এগিয়ে আসছে। বেকারী, বন্ধ কলকারখানা খোলার দাবী, সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণ ইত্যাদি নানা কারণে এই মিছিল। বিমল আর আমি একই সঙ্গে ঘড়ি দেখলাম। দশটা বাজতে সাত মিনিট বাকী। আমার

মা'র রক্ত আমার হাতে ধরা, এই রক্তের মধ্যে আমার মা'র জীবন। অথচ সেই জীবন এখন থেমে আছে। সারা শরীর আবার ঘামতে শুরু করল আমার। আমি বুঝতে পারছি অপারেশন থিয়েটারের সামনে দাদা, বাবা আর নব এখন কীভাবে সময় গুনছে। আমি এখানে আটকে গেছি সেটা ওরা টের পাচ্ছে না। বাবা ভাবছে, ইডিয়টটাকে একদম রিলাই করা যায় না—ইরেসপন-সেবল। মা অপারেশন থিয়েটারের বাইরে শুয়ে ভাবছে, দিবা আমার জন্যে রক্ত আনতে গেছে, কিন্তু আসছে না কেন?

গল্পে পড়েছি বিদ্যাসাগর সাঁতরে দামোদর পার হয়েছিলেন মা-র কাছে যাবেন বলে। হায়রে বিদ্যাসাগর! উনবিংশ শতাব্দীর নমস্য পুরুষ। আপনি উত্তাল দামোদর দেখেছেন কিন্তু আশীর দশকের কলকাতা দেখেন নি, কলকাতার রাস্তায় সরকারী বাস কিম্বা ট্রেন চড়েন নি, মা'র জন্যে রক্ত আনতে গিয়ে মিছিল আর জ্যামে পড়েন নি। আমার মাতৃভক্তি নিয়ে গল্প হবে না, কিন্তু আমি যে একটা ইডিয়ট, ইরেসপনসেবল সে কথাটাই আবার প্রমাণ হয়ে যাবে।

বিমল জানালায় মুখ বার করে জ্যাম দেখছে। ড্রাইভার আমাকে সহানুভূতি জানাচ্ছে আর আমি আস্তে আস্তে আমার চেতনা হারাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে বোতলের রক্ত ধীরে ধীরে জমে যাচ্ছে—জমে জমে পাথর হচ্ছে। রক্তের অভাবে আমার মা একটু একটু করে মৃত্যুর থাবার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে।

আমি রক্তের বোতলটাকে জামার মধ্যে ঢুকিয়ে বুকে চেপে ধরলাম। বোধহয় নিজের শরীরের উষ্ণতা দিতে চাইলাম।

আমার অবসন্ন চেতনায় আমার বুকের মধ্যে থেকে মা কথা কয়ে উঠলেন, 'দিবা, এত দেরি করিস কেন? তাড়াতাড়ি আসতে পারিস না, একটু তাড়াতাড়ি……'

ঘটনাটা ঘটে গেল চোখের পলক ফেলার সঙ্গে সঙ্গে। অফিস থেকে ওরা এক সঙ্গে বেরিয়েছিল, রোজ যেমন বার হয়। বিকেলের দিকে বাসে কিম্বা মিনিবাসে ওঠার ধকল পছন্দ নয় বলে ওরা হেঁটেই শিয়ালদা পর্যন্ত আসে। তারপর যেকোন একটা ট্রেন ধরে উল্টোডাঙ্গায় নেমে তিন মিনিট হাঁটলেই ওদের ফ্ল্যাট। একই ফ্ল্যাট বাড়ির দোতলা আর এক তলায় ওদের নিজস্ব ফ্ল্যাট। বন্ধুত্বের সূত্রপাত অফিস থেকে, সেটা গাঢ় হয়েছে এই সরকারী ফ্ল্যাট কেনার সুবাদে। দোতলা থেকে নামতে নামতে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সুজিত হাঁক দেয়, 'বিমল, রেডি!'

এক তলার ঘরে বিমল রেডিই থাকে। জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বলে, 'এক মিনিট।'

হাতের নাগালে ট্রেন পেয়ে যাওয়া উল্টোডাঙ্গা থেকে খুব মুশকিল হয় না। তিনটে সেকশনের ট্রেন এই ষ্টেশনটা ছুঁয়ে যায়। মিনিবাস কিম্বা বাসের লাইনে দাঁড়ানোর চাইতে ট্রেনে যাওয়াই ওরা দুজন অনেক বেশি সুবিধাজনক মনে করায় মাসকাবারী টিকিট কিনে নিয়েছে। সুজিত হিসেব করে দেখেছে, তাতে খরচ অনেক কম লাগে। শিয়ালদা ষ্টেশনে নেমে ট্যাক্সির লাইনে দাঁড়ালে বিবাদীবাগ পর্যন্ত যাবার লোক অনেক জুটে যায়। শেয়ারে দেড় টাকা করে দিলে দিব্যি ট্যাক্সি চেপে অফিসের গেটের সামনেই নামা যায়। কিন্তু অফিস থেকে ফেরে পায়ে হেঁটে। গল্প করতে করতে বিবাদীবাগ থেকে শিয়ালদা হেঁটে যাওয়া এমন কিছু কষ্টকর ব্যাপার নয়। তাছাড়া সুজিত বিশ্বাস করে, হাঁটার চাইতে ভালো ব্যায়াম আর কিছুতেই হয় না। বিমলও হাঁটতে ভালবাসে। অন্তত ভিড়ের বাসে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝোলা কিম্বা মিনিবাসে ঘাড় কুঁজো করে

দাঁড়ানোর চাইতে হেঁটে যাওয়াতে অনেক বেশি আরাম। শুধু বর্ষাকালটা একটু অসুবিধে, নইলে আর কোন ঝামেলা সে বোধ করে না। ছোটবেলায় যে গ্রামে সে থাকতো সে গ্রামে কোন হাইস্কুল ছিল না। ওকে বাড়ি থেকে প্রায় আড়াই মাইল পথ হেঁটে গঙ্গার ধারে স্কুলে যেতে হতো। যাতায়াতে প্রায় পাঁচ মাইল পথ তখন রোজই হাঁটতে হতো বিমলকে। দু'জনের স্বভাবের মধ্যে শুধু একটাই অমিল ছিল। অফিস থেকে ফেরার পথে বৌবাজারে দাঁড়িয়ে সুজিত লটারীর টিকিট কিনতো আর বিমল দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে ভাবতো, সুজিতটা একটা রামবোকা! কেন যে প্রতি মাসে দশ-বিশ টাকা খরচ করে হরেক রকম লটারীর টিকিট কেনে ?

সুজিত ওকে বোঝাতো, 'লটারীর টিকিট কেনা কোন দোষের নয়। ধর যদি একবার ফার্স্ট প্রাইজ লেগে যায় তাহলেই রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাব।'

বিমল গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করতো, 'তুই কতদিন থেকে লটারীর টিকিট কিনছিস ?'

সুজিত এসব প্রশ্নে উৎসাহ পেত। রীতিমতো টগবগে গলায় সে জবাব দিতো, 'যখন টিউশনী করতাম তখন থেকেই কেটে যাচ্ছি।'

বিমল এবার তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করত, 'কখনও পেয়েছিস ?'

সুজিত হালকা গলায় বিমলের গুরুত্ব কমিয়ে দেবার জন্যে বলতো, 'তাতে কী হয়েছে। আমি পাই নি, কিন্তু কোনদিন তো পেয়ে যেতে পারি।'

বিমল পথ চলতে চলতে বলতো, 'এটাও এক ধরনের নেশা। হঠাৎ বড়লোক হবার নেশা। আমি কখনও লটারীর ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়া কোন লোককে চাক্ষুস দেখিনি।'

সুজিত রাগ করতো না। বন্ধুর দিকে সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বলতো, 'অপেক্ষা কর, আমি পেলে আমাকে চাক্ষুস দেখিস।'

ব্যাপারটা এর বেশি আর গড়াতো না। কেবল সুজিতকে

রাগিয়ে দিতে মাঝে মাঝে ওর বৌ কৃষ্ণার সামনে বলতো, 'তোমার ভাবনা নেই কৃষ্ণা। সুজিত তো একদিন লটারীর ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে যাবে তখন তোমরা ভালো দেখে একটা বাড়ি আর একটা গাড়ি কিনে নিও।'

কৃষ্ণা ঠোঁট বেঁকিয়ে জবাব দিতো, 'বিয়ের পর থেকেই তো দেখছি কেবল টিকিট কিনে যাচ্ছে। ওই টাকাগুলো মাসে মাসে আমার ঘটে ফেললে এতদিনে একটা ইনভারটার কেনার টাকা হয়ে যেত। লোডশেডিং-এর কষ্ট থেকে বাঁচতাম।'

বিমল কৃষ্ণাকে উসকে দিয়ে বলতো, 'ইনভারটার কি বলছো, যতটাকা সুজিত টিকিট কেনার পেছনে খরচ করেছে তাতে জেনারেটর হয়ে যেত।'

সুজিত তখন কৃষ্ণার দিকে না তাকিয়ে বিমলের বৌ নন্দিতাকে বলতো, 'নন্দিতা, তোমার কর্তাটিকে একটু বোঝাও। হঠাৎ একদিন যদি প্রাইজ লেগে যায় তাহলে বুঝবে লটারী মানুষকে রাতারাতি কোথায় নিয়ে যেতে পারে। আমার বড় জামাইবাবুর অফিসের পিওন পাঁচটাকার টিকিটে সাতলাখ টাকা পেয়ে গেছে। লোকটা এখন গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ায় আর ব্যাঙ্কের সুদের টাকায় সংসার চালায়।'

বিমল হাসতে হাসতে বলতো, 'তুই সাতলাখ টাকা পেলে নিশ্চয়ই গাড়ি কিনবি। তখন সেই গাড়ি করে আমাকে অফিসে পৌঁছে দিস তাহলেই আমার অনেক পয়সা বাঁচবে।'

বিমল পছন্দ না করলেও সুজিত লটারীর টিকিট কেনা থামায় নি। দু' তিন রকমের টিকিট প্রতি মাসেই সে কিনতো। সেদিনও অফিস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বৌবাজারের মুখে এসে দাঁড়াল সুজিত। বিমল জানতো, টিকিট কেনবার জন্যে সুজিত দাঁড়াবে। সুজিত দোকানের কাউন্টারে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল আর বিমল একটু দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগল। একটু পরেই কাউন্টার থেকে হন্তদন্ত হয়ে সুজিত ফিরে এলো বিমলের কাছে।

ওর সামনে হাত বাড়িয়ে বলল, 'পাঁচটা টাকা দেতো ?'

বিমল বলল, 'কী হবে ?'

সুজিত খুব ব্যস্ত গলায় বলল, 'কী হবে সেটা পরে শুনবি। দে-না পাঁচটা টাকা।'

বিমল চোখ কুচকে সুজিতকে লক্ষ্য করতে করতে হিপ পকেট থেকে পার্সটা বার করে আনল। পাঁচ টাকাব নোটটা বাব করার সঙ্গে সঙ্গে সুজিত ওর আঙ্গুলেব ডগা থেকে টাকাটা ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে আবার ছুটে গেল কাউন্টাররের দিকে। মিনিট সাতেক বাদে ফিরে এলো দুটো টিকিট হাতে নিয়ে! হোমিওপ্যাথী ওষুধের পুরিয়া যেমন ছোট-ছোট সাদা খামে পুবে দেয় তেমনই সাইজের দুটো প্যাকেট দু'হাতের তালুতে বেখে বলল, 'যে কোন একটা তুলে নে।'

বিমল এসব জিনিস একদম বিশ্বাস কবে না। অনিচ্ছা সত্বেও সুজিতের বাঁ হাতের খামটা তুলল। সুজিত ডান হাতেব খামটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে বাখতে বলল, 'ওটা যত্ন করে বেখে দে, ওটা তোর।'

বিমল অবাক গলায় প্রশ্ন কবল; 'তোর মানে ?' সুজিত চলতে চলতে জবাব দিল, 'মানে আবাব কি! তুই টাকা দিলি তোকে টিকিট কিনে দিলাম। এবার প্রাইজ লাগলে-তুই বড়লোক হয়ে যাবি।'

বিমল অপ্রসন্ন চোখে সুজিতেব দিকে তাকালো। বিরক্ত গলায় বলল, 'এটা ঠিক করিল না। ফালতু পাঁচটা টাকা জলে গেল।'

সুজিত জানত বিমল খুশি হবে না। ওকে খুশি করতেই কণ্ঠস্বর গাঢ় করে বলল, 'বন্ধুর জন্যে বন্ধুরা কত কিছু করে। তুই কি আমার অনুরোধে পাঁচটা টাকা জলে ফেলতে পারবি না।'

বিমল নিজের পার্সের ভেতরে টিকিটটা ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'আচ্ছা লোক তুই। শেষ পর্যন্ত আমাকেও ভেড়ালি। নন্দিতা আর কৃষ্ণা দুজনেই এবার আমাকে চেপে ধরবে।'

উড়ালপুলের তলা দিয়ে ওরা ষ্টেশনের চত্বরে এসে পৌঁছল। আকাশে মেঘ জমেছিল বিকেল থেকেই। এবার ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। বিমল তার ব্যাগের মধ্যে থেকে ছাতাটা বার করে বলল, 'তুই ছাতা আনিস নি?'

সুজিত নিজের মাথাটা বিমলের ছাতার নিচে ঢুকিয়ে নিয়ে বলল, 'দূর! ছাতা-ফাতা আনা পোষায় না। গত বছর দুটো ছাতা হারিয়েছিল। নন্দিতা ফায়ার হয়ে আছে।'

বিমল শাসন করার ভঙ্গিতে বলল, 'এদিকে তো মাসে মাসে লটারির টিকিট কিনে যাচ্ছিস আর একটা ছাতা কিনতে পারছিস না। তুই একটা ইডিয়ট।'

সুজিত চলতে চলতে নির্বিকার গলায় বলল, 'ইডিয়ট, রাস্কেল যাই বলিশ না কেন ছাতা-ফাতা কেনা আমার পোষায় না।'

ষ্টেশনে এসে ওরা জানতে পারল ওভার হেডে বিদ্যুৎ না থাকায় আপাতত কোন ট্রেন ছাড়া সম্ভব হচ্ছে না। ষ্টেশন জুড়ে থিক থিক করছে মানুষের মাথা। কোথাও ভালভাবে দাঁড়াবার জায়গা নেই। বাইরে বৃষ্টি পড়লে ষ্টেশনের ভেতরের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে যায়। শিয়ালদার চত্বরে বসে যারা আনাজ বেচে কিংবা ডিম ভাজা আর গেঞ্জি বিক্রি করে তারাও এখন উঠে এসেছে ষ্টেশনে। চারপাশে তাকিয়ে বিমল বলল, 'চল বাসে চলে যাই।'

সুজিত রুমাল দিয়ে ভেজা হাতের জল মুছতে মুছতে বলল, 'টিভিতে আজ খেলা দেখাবে। ভাবছিলাম বাড়ি ফিরে খেলাটা দেখবো।'

বিমল তাগাদা দেওয়ার সুরে বলল, 'ট্রেনের আশায় থাকলে খেলা দেখা হবে না। চল বাসে চলে যাই।'

বাসের জন্য ওরা ষ্টেশন ছেড়ে আবার বাইরে এলো। বাইরে তখন বৃষ্টির তেজ বেড়ে গেছে। থেকে থেকে দমকা হাওয়া ছুটে আসছে এলোমেলো ভাবে। বাসষ্টপের দিকে তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে হাওয়ায় ছাতাটা উল্টে গেল বিমলের। সুজিত ততক্ষণে

রাস্তা পেরিয়ে গেছে। বাস এসে দাঁড়িয়েছে। সুজিত চিৎকার করে ডাকল, 'বিমল, বিমল তাড়াতাড়ি।'

বিমল শুধু ডাকটাই শুনতে পেয়েছিল। ছাতাটা সোজা করবার চেষ্টা করতে করতে সে রাস্তা পেরিযে যাবার জন্য যখন পা বাড়িয়েছে ঠিক তখন, আচমকা ঘটে গেল ঘটনাটা।

উল্টোদিকের বাস ষ্টপে দাঁড়িয়ে একটা কোলাহল শুনল সুজিত। সেই সঙ্গে একটা মিনি বাসের প্রবল হুঙ্কার। সুজিত ত্বরিৎ গতিতে ছুটে এসে দেখল একটা ফাঁকা মিনি বাস উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে যাচ্ছে। ছু' পাশের দোকানে দাঁড়ানো লোকগুলো চিৎকাব করছে আর মাঝ বাস্তায় ওপব উপুড় হয়ে পড়ে আছে বিমল। ওর ছাতাটা পড়ে আছে ওরই হাত ছুয়েক দূরে। দামাল হাওয়ায় বাস্তার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে।

নীলরতন হাসপাতালের এমারজেন্সিতে নিয়ে আসার আগে পর্যন্ত সুজিত বুঝে উঠতে পারেনি কখন, কোন মুহূর্তে এতবড় ঘটনাটা ঘটল। ডাক্তাব সুজিতেব মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন কবলেন, 'আপনাব কে হয়?'

সুজিত পাংশু মুখে বলল, 'আমার বন্ধু! একই অফিসে কাজ করি, একই ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকি। একসঙ্গেই রোজ ফিরি।'

ডাক্তার ইশাবা করে সুজিতকে ভেতরে ডাকলেন। বিমলের হাত ঘড়ি, সোনার আংটি, বুক পকেট থেকে যাবতীয় কাগজপত্র এবং হিপ পকেট থেকে পার্সটা বার করে সুজিতের হাতে দিয়ে বললেন, 'এগুলো আপনার কাছে রাখুন।'

সুজিত জিনিসগুলো হাতে নিয়ে বলল, 'কেমন দেখলেন? খুব সিরিয়াস কি?'

ডাক্তার মাথা নেড়ে বললে, 'এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। ইনজ্যুরি কতটা সেটা ডিটেক্ট করতে সময় লাগবে। প্রোফিউস ব্লিডিং হচ্ছে।'

সুজিত হাসপাতালের বাইরে এসে দেখল বৃষ্টি থেমে এসেছে।

মেঘলা আকাশে ঘোলাটে চাঁদ দেখা দিয়েছে। রাস্তা জুড়ে বিশৃঙ্খল কলকাতায় নেমে আসছে রাত। সুজিত হাসপাতালের টেলিফোন থেকে বার বার চেষ্টা করতে লাগল তিনতলার সুভাষ সেনের ফ্ল্যাটে টেলিফোন করতে। ওর ঘরেই টেলিফোন আছে। ওখানে খবরটা পৌঁছে দিলে নন্দিতা এবং কৃষ্ণা দুজনেই জেনে যাবে। নন্দিতার হাসপাতালে আসা দরকার। টেলিফোনে ডায়ালটোন পাওয়া যাচ্ছে। নম্বর ঘোরাবার পরেই কট্ করে প্রতি বারই লাইনটা কেটে যাচ্ছে। বিরক্ত সুজিত ক্রুদ্ধ চোখে টেলিফোনটার দিকে তাকাল। রিসিভারটা তুলে নিয়ে আবার ডায়াল ঘোরাতে যাবার আগে পেছন থেকে একজন বলল, 'মিথ্যে চেষ্টা করছেন। আমি সাতবার চেষ্টা করার পর জেনেছি ওটা বিকল।'

সুজিত হাসপাতালের বাইরে এলো। একটা দোকানে গিয়ে কাতর গলায় বলল, 'দেখুন, আমার বড্ড বিপদ, একটা ফোন করতে চাই।'

দোকানদার সুজিতের দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল, 'তিন দিন থেকে ডেড হয়ে আছে।'

অসহায় সুজিত রাস্তায় নেমে এসে চারপাশে তাকালো। তার বুকের মধ্যে ক্ষ্যাপা হাওয়ার মতো একটা অস্থিরতা আর উদ্বেগ দাপাদাপি করছে। সে নিজেকে কখনও এতখানি বিপন্ন আর অসহায়বোধ করেনি। চার-পাঁচটা দোকান ঘুরতে ঘুরতে সুজিত বৌবাজারের কাছে এসে দূর থেকে লটারীর দোকানটা দেখতে পেল। দোকানটা তার চেনা। ওদের টেলিফোন আছে।

তিনবারের চেষ্টায় লাইনটা পেয়ে গেল সুজিত। সুভাষ সেনকে কথাটা বলতে গিয়ে সে টের পেল তার গলা কাঁপছে। বুকের মধ্যে একটা কষ্ট হচ্ছে তার। টেলিফোন নামিয়ে রেখে হাসপাতালের দিকে আসতে আসতে তার নন্দিতাকে মনে পড়ল। সে জানে না, হাসপাতালে এসে গেলে সে কেমন করে নন্দিতাকে ঘটনাটা বলবে।

নন্দিতাকে কিছু বলতে হল না। দূর থেকে বিমলকে দেখে সে

মুখে আঁচল চেপে কান্না থামাল। চোখের কোলে জল চিকচিক করছিল। মুখ ঘুরিয়ে সেটা মুছে নিয়ে বলল, 'কখন জ্ঞান ফিরবে?'

সুজিতের কাছে এই প্রশ্নের কোন জবাব ছিল না। সুভাষ সেন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে ফিরে এলেন। সুজিতকে ডেকে বললেন, 'কণ্ডিশন ভাল বুঝছি না। প্রচুর ব্লিডিং হয়েছে। মাথায় তিন-চার জায়গায় ফ্যাক্‌চার। ডাক্তার সন্দেহ করছেন, কিডনিটাও ড্যামেজ হয়েছে।'

সুজিত কথাগুলো শুনতে শুনতে নন্দিতার দিকে তাকাল। কৃষ্ণার পাশে নন্দিতা পাথরের মতো বসে আছে। ওর দৃষ্টি অনেক দূরে ছড়ানো।

সুজিত চাপা গলায় সুভাষ সেনকে বলল, 'এসব কথা নন্দিতা বা কৃষ্ণাকে বলবেন না। আমি কাল বড় ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলব। দেখা যাক কী হয়।'

সুভাষ সেন চশমা খুলে নিয়ে বেঞ্চিতে বসা নন্দিতা আর কৃষ্ণাকে দেখলেন। তারপর বললেন, 'রাত্রে একজন কেউ থাকলে ভাল হয়। কখন কী দরকার পড়ে, মাঝে যদি কোন···'

সুভাষ সেন কথা শেষ করলেন না। সুজিত বলল, 'আপনি ওদের নিয়ে চলে যান। আমি রাত্রে থেকে যাচ্ছি।'

সুজিত ওদের ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলো। খানিকক্ষণ পর সিগারেটের প্যাকেট বার করতে গিয়ে তার মনে হল, নন্দিতার হাতে বিমলের জিনিসগুলো দিয়ে দিলে হতো। তার প্যাণ্টের পকেটে বিমলের পার্স, ঘড়ি আর সোনার আংটিটা থেকে গেছে। কথাটা এতক্ষণ তার একেবারেই মনে পড়েনি। সুজিত সিগারেট ধরাতে ধরাতে ভাবল, কাল সকালে নন্দিতা এলে এগুলো ওর হাতে দিয়ে দিতে হবে।

হাসপাতালে বারান্দায় বসে সুজিত দেখল তার হাতঘড়িতে এগারোটা বাজতে পাঁচমিনিট বাকি। অথচ বিমলের ঘড়িতে ঠিক

এগারোটা। বিমলের ঘড়িটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে সে ভাবল, বিমল সব সময় ওর ঘড়ি পাঁচ মিনিট ফার্স্ট রেখে দিত। অফিসে দেরি করে পৌঁছতে বিমলের খুব আপত্তি ছিল। ও চাইতো সব কাজটাই সময় মতো হোক। ষ্টেশনে এসে ট্রেন লেট থাকলে বিমল ছটফট করতো। শিয়ালদা থেকে ট্রেন ছাড়তে দেরি করলে বিমল মনে মনে গজরাতো। সুজিত ওকে ঠাট্টা করে বলতো, 'তোর এদেশে জন্মানোই ভুল হয়েছে।'

বিমল বিরক্ত মুখে বলতো, 'স্কুল ফাইনালের সিলেবাসে আমাদের একটা প্রবন্ধ পড়তে হতো নিয়মানুবর্তিতার ওপর। তাতে লেখা ছিল, ট্রেনের সময় বিমানের সময় এসব দেখে নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা করতে হয়। এখন সেই প্রবন্ধটার কথা মনে হলে হাসি পায়। ওসব ফালতু শেখানো হতো।

সুজিত উঠে দাঁড়াল। বিমলের মুখটা আজ এত বেশি করে মনে পড়েছে কেন? আগে তো কখনও বিমলের কথা এমন করে মনে পড়েনি। সুজিত নিজেকে বিমলের ভাবনা থেকে সরিয়ে নিতে চাইছিল। বাইরে বেরিয়ে এসে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকালো। চাঁদের আলো ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আকাশ জুড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ গড়িয়ে যাচ্ছে অলস গতিতে। সন্ধ্যের দিকে যে বাতাস ছিল এখন সেটা থেমে গেছে। রাস্তা ফাঁকা হয়ে আসছে ক্রমশ। যাবার আগে কৃষ্ণা সুজিতের হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বলে গেছে, 'হোটেলে খেয়ে নিও।'

কৃষ্ণার কথাটা মনে আছে, কিন্তু খাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই সুজিতের। হাসপাতালের নিজস্ব একটা গন্ধ থাকে। এই গন্ধটা সুজিতের সহ্য হয় না। শরীর গোলাতে থাকে। ওদিকের ফুটপাথে কয়েকটা দোকান তখনও খোলা। সুজিত রাস্তা পেরিয়ে দোকান থেকে সিগারেট কিনল। গা গোলাচ্ছিল বলে একটা পান খেল। সিগারেট ধরিয়ে ফিরে এলো হাসপাতালের বারান্দায়। আস্তে আস্তে গোটা শহরটা নিঝুম হয়ে গেল। কেবল মাঝে-মাঝে

এক-একটা ট্যাক্সি আর অ্যাম্বুলেন্স এসে রোগী নামিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। রাত তিনটে নাগাদ ওয়ার্ডবয় এসে সুজিতকে ডেকে নিয়ে গেল এমারজেন্সি ওয়ার্ডের ভেতরে। রাত্রের ডাক্তার লাল চাদরে বিমলের শরীরটা ঢেকে দিয়ে সুজিতকে বলল, 'সরি! আপনি আমার সঙ্গে আসুন। বডি পোস্টমর্টেমে পাঠাতে হবে।'

সুজিত বলল, 'সে কি! সেখানে পাঠাবেন কেন?'

ডাক্তার নিজের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'সেটাই নিয়ম! আমরা এসব কেসে তাই করে থাকি।'

সুজিত তর্ক করল না। বিমলের দিকে একবার তাকাল। ওর মুখ দেখা যাচ্ছেনা। ডাক্তার লাল চাদরে ওর সর্বাঙ্গ ঢেকে দিয়েছে। এবার সিস্টার আর ওয়ার্ডবয় মিলে ওর শরীরটা আড়াল করে রাখবার জন্যে কাপড়ের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিচ্ছে। সুজিত এগিয়ে গিয়ে চাদব তুলে বিমলকে একবার দেখতে চাইল। তার মনে হল, সন্ধ্যে পর্যন্ত যে মানুষটা তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে পথ হেঁটেছে তাকে আর এ জীবনে সে কোনদিন তার পাশে পাশে হাঁটতে দেখবে না। সুজিত এগিয়ে যাচ্ছিল। বিমলের শরীর ততক্ষণে আড়াল করে ফেলেছে সিস্টার। সুজিত বারান্দায় এসে বসল। তার চোখের সামনে ভেসে আসতে লাগল নন্দিতা, টুকাই আর বিমলের মুখ। যেন অ্যালবামে রাখা একটা ছবি। অ্যালবামের পাতাগুলো হাওয়ায় উড়ছে। ছবিগুলো উঠে আসছে চোখের সামনে। বিমলের ছেলে টুকাই ছুটে আসছে বিমলের দিকে।

সুজিত তাকিয়ে থাকতে পারল না। দেয়ালে মাথা রেখে সে চোখ বুজল। তার চোখ জ্বালা করছে। বন্ধ চোখের পাতা ভাসিয়ে একটা কষ্টের স্রোত নেমে আসছে গালবেয়ে। সুজিত দাঁতে রুমাল কামড়ে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল। কষ্টের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার সময় তার ছিলনা। সকালের প্রথম ট্রেন ধরেই তাকে পৌঁছতে হবে বাড়িতে। কিন্তু কাকে প্রথম জানাবে এই দুঃসংবাদটা? নন্দিতাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে কে বলবে, বিমল আর নেই!

নিজের ফ্ল্যাটের সিঁড়ি দিয়ে চোরের মতো পা টিপে সুজিত তার ঘরের দরজায় এলো। একটু ভেবে নিয়ে কলিংবেল টিপল। কৃষ্ণা দরজা খুলে দিয়েই আচমকা প্রশ্ন করল, 'তুমি! কোন খবর আছে বুঝি!'

সুজিত প্রায় টলতে টলতে ঘরে এলো। ধপ করে সোফায় বসে পড়ে বলল, 'বিমল মারা গেছে। আজই ওর বডি মর্গে পাঠানো হবে।'

খোলা দরজায় পেছন ফিরে কৃষ্ণা দাঁড়িয়েছিল। ওর শরীর কাঁপতে আরম্ভ করল। দরজা ধরে মেঝের ওপর বসে পড়ে বলল, 'নন্দিতা জানে?'

সুজিত মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'এখনও জানাই নি।'

মশারির মধ্যে সুজিতের পাঁচ বছরের মেয়ে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে স্থির চোখে বাবা আর মা'কে দেখছে। বুঝতে পারছে না, এখন, এসময় মেঝেতে বসে মা কাঁদছে কেন! পিঙ্কি ভয় পেয়ে হঠাৎ কেঁদে উঠল।

সুজিত উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে বিমলের রিস্টওয়াচ, সোনার আংটি আর পার্স বার করে রেখে বলল, 'এগুলো বিমলের, নন্দিতাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।'

কৃষ্ণা খর চোখে জিনিসগুলোর দিকে তাকাল। চাপা ভৎর্সনার সুরে বলল, 'এখনই এসব বুঝিয়ে দেওয়ার সময় নয়। আলমারীতে তুলে রাখ। তিনতলার সুভাষবাবুকে ডাকো। আমি একা নন্দি-তার সামনে যেতে পারব না।'

কৃষ্ণার কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল। সুজিত জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। বাইরের অন্ধকার গলে যাচ্ছে। পুবদিকের আকাশে অস্পষ্ট রক্তিম আভা। রাস্তার আলোগুলোকে এখন ম্লান আর বিষন্ন দেখাচ্ছে। সুজিত উঠে এসে জানালার সামনে দাঁড়াল। শেষরাতের হাওয়ায় একটা ঠাণ্ডা আমেজ টের পাওয়া যাচ্ছে।

সারারাত সিগারেট খেয়ে খেযে জিভটা এখন তেতো। সুজিত জানালা থেকে চোখ সরাল। কৃষ্ণা মশারীর ভেতরে ঢুকে মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে ব্যস্ত। সুজিত ক্লান্ত গলায় বলল, 'আমি সুভাষবাবুর কাছে যাচ্ছি। দরজটা বন্ধ করো না।'

বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সুজিত তিনতলায় উঠে এলো। দরজার বেল টিপে অপেক্ষা কবতে লাগল। শেষরাতের ঘুমটা বোধহয় বেশি গাঢ় হয়। সুজিত আবার বেল টিপল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়েও সে বুঝলে পারল ভিতবেব ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। দরজা খোলবার অন্যে কেউ এগিয়ে আসছে। যে আসছে তাব পায়ের শব্দটা এখান থেকেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। দরজা খুলে দিয়েই সুভাষ সেন বোধ হয় সুজিতকে দেখে টের পেযে গেলেন, সুজিত কোন ভাল খবব আনে নি। সদ্য ঘুম ভাঙ্গা চোখের পাতা থেকে আলস্য ঝেড়ে ফেলে চাপা গলায জিজ্ঞেস করলেন, 'বিমলবাবু বোধহয় .....'

সুভায সেনের কথা শেষ হবাব আগেই সুজিত বলল, 'বিমল নেই। রাত তিনটে দশে চলে গেছে। ডাক্তারী নিয়মে ওর বডি মর্গে পাঠাবে।'

সুভায সেন মাথা নিচু কবলেন। মুখ ন তুলেই বললেন, 'ওর স্ত্রীকে জানিয়েছেন ?'

সুজিত মাথা নেড়ে বলল, 'না এখনও জানাইনি। আপনার সঙ্গে পবামর্শ করতে এলাম।'

সুভাষ সেন চোখ তুলে সুজিতের দিকে তাকালেন। গম্ভীর মুখে বললেন, 'জানাতে তো হবেই। আপনি ঘরে যান, আমি তৈরি হয়ে আসছি।'

বাইরে তখন দিনের আলো ফুটেছে। এক ঝাক কাক উড়ে এসে নেমেছে বিমলেব ফ্ল্যাটের সামনে সবুজ মাঠের ওপর। কলকাতা এয়ারপোর্টের দিকে উড়ে যাচ্ছে রূপোলী ডানার একটা বিমান। আকাশ থেকে গড়িয়ে নেমে আসছে তার চলার শব্দ। শব্দটা

একটা কম্পন তুলে দিয়ে মিলিয়ে যাবার পরেই সুজিত দরজার বাইরে থেকে ডাকল, 'নন্দিতা, নন্দিতা।'

দরজা খুলে দেবার আগে জানালা খুলে দিয়ে উঁকি মারল টুকাই। সুজিতকে দেখে ফিক করে হেসে ফেলে টুকাই বলল, 'কাকু, বাবা আজ তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে না। বাবার অসুখ, হাসপাতালে আছে।'

সুজিত হাসবার চেষ্টা করে দেখল তার মুখের পেশী থরথর করে কাঁপছে। এক ফোটা হাসিও সে চেষ্টা করে টুকাইয়ের জন্য ঠোঁটে আনতে পারল না। নন্দিতা দরজা খুলে দিয়ে অদ্ভুত চোখে ওদের দিকে তাকালো। সুভাষ যেন অন্যদিকে তাকিয়ে নিজেকে অকারণে ব্যস্ত রাখতে চাইছেন। সুজিত আস্তে আস্তে নন্দিতার দিকে তাকালো। বিস্ময়, ভয় আর জিজ্ঞাসা এই তিনটেই এখন মাখামাখি হয়ে আছে নন্দিতার চোখে। সুজিত এক পা এগিয়ে নন্দিতার সামনে এলো। ওর চোখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'চল ঘরে গিয়ে বলি!'

নন্দিতা দরজা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে টুকাই তখনও জানালার ওপর গ্রীল ধরে দাঁড়িয়ে সামনের সবুজ মাঠে কাকেদের জটলা দেখছিল। ঘরের মধ্যে এসে সুজিত বলল, 'কৃষ্ণা আসছে! তোমাদের নিয়ে এখনই একবার হাসপাতালে যেতে হবে।'

'কেন?' প্রশ্নটা বেরিয়ে এলো নন্দিতার গলা চিরে, ঠিক আহত আর্তনাদের মতো।

সুজিত নন্দিতার মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। ঘরের অন্যদিকে চোখ রেখে বলল, 'কথাটা তোমাকে তো বলতেই হবে। তুমি তো জান, ভাগ্যের ওপর কারো হাত নেই। আমরা না চাইলেও এমন অনেক কিছু ঘটে, ঘটে যায়। সেটাকে মেনে না নেওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই।'

কথাগুলো বলতে বলতেই সুজিত টের পেল বড্ড মামুলি শোনাচ্ছে। অথচ সত্যি কথাটা বলবার আগে এই মামুলি ভূমিকা-

টুকু এখন তার বিশেষ প্রয়োজন। নন্দিতার চোখের দিকে না তাকালেও অনুভবে সে ধরতে পারছে নন্দিতাব দুই চোখে আর্ত জিজ্ঞাসা সহস্র সূঁচের মতো তাকে বিদ্ধ করে রেখেছে। সে নন্দিতার দিকে সবাসরি না তাকিয়ে কথাগুলো বলে গেল।

নন্দিতা অদ্ভুত চোখে এগিয়ে এলো। সুজিত জানে ওই দৃষ্টির সামনে দাঁড়ানো বড কঠিন। নন্দিতা সুজিতেব হাতটা ধবে বলল, 'কী হযেছে পরিষ্কাব করে বলুন। আমি কিছু বুঝতে পাবছি না। বিমল কেমন আছে?'

সুজিত নিজেব হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে নন্দিতাব কাঁধে বাখল। নন্দিতা স্থিব দাঁড়িয়ে। সুজিত বলল. 'তুমি ভেঙে পড়ো না। বিমল নেই। বিমল রাত তিনটে দশে চলে গেছে।'

নন্দিতার শবীর হঠাৎ কেঁপে উঠে স্থিব হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য সে মুখ তুলে তাকালো সুজিতের মুখেব দিকে। নন্দিতার ঠোঁট কাঁপছে। তারপরই নন্দিতা হঠাৎ ছিটকে দূবে চলে গেল। তার দুই চোখে প্রবল অবিশ্বাস। সেই অবিশ্বাস থেকে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে চিৎকার কবে বোধহয় কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু পারল না। বিছানাব ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে সে গোঙবাতে লাগল। নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে নন্দিতার গোঙবানীব আওয়াজটাকে ঢেকে দিল একটা বেলইঞ্জিনের তীব্র শব্দ। তারপব ঘড় ঘড় ঘটাং শব্দের ক্লান্ত ধাবাবাহিকতা টেনে চলতে লাগল একটা মালগাড়ি। কৃষ্ণা ততক্ষণে ঘবে এসে নন্দিতার পাশে বসেছে। ওর পিঠে হাত রেখে কিছু বলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সুজিত কোন কথাই শুনতে পেল না। মালগাড়িটা শব্দ তুলে তখনও ষ্টেশন পেরিযে যাচ্ছে।

২

তিনদিন পর সুজিত অফিসে এলো। বিমলকে নিয়ে অফিসে আজ একটা শোকসভার আয়োজন হয়েছে। এটা না থাকলে আজও

অফিসে আসতো না সুজিত। মর্গ থেকে বিমলের বডি পেতে অনেক দেরী হয়ে যেত যদি না বিমলের অফিসের দিক থেকে সবাই এসে তদ্বির না করতো। একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে তিনটে দিন কেটে গেছে সুজিতের। অফিস থেকে তিনটে নাগাদ বেরিয়ে বৌবাজার দিয়ে একা-একা হেঁটে আসার সময় বিমলকে বার বার মনে পড়ছিল সুজিতের। তার পাশ দিয়ে তারই সঙ্গে অসংখ্য লোক হেঁটে যাচ্ছে অথচ আশ্চর্য, তাদের কেউ বিমল নয়। ঘটনাটা এখনও ভাবলে অবিশ্বাস্য মনে হয় সুজিতের। মাত্র এক মিনিট, বোধহয় তাও নয়, আধ মিনিটের মধ্যেই সর্বনাশটা ঘটে গেল। সুজিত যদি দৌড়ে আগে রাস্তাটা না পেরিয়ে যেত, কিংবা রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে যদি বিমলকে না ডাকতো তাহলে বোধহয় দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। যদিও এই ঘটনায় সুজিতের কোন ভূমিকা নেই, তবুও কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে এইভাবে বিমলকে ডাকাটা উচিত হয়নি। হয়তো তার ডাক শুনেই বিমল এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে রাস্তা পার হওয়ার আগে সতর্ক হতে পারেনি। সুজিত মনে মনে জানে, সবার কাছে ঘটনাটার বিবরণ দেবার সময় বিমলের নাম ধরে ডেকে ওঠার ঘটনা-টাকে সে চেপে গেছে। এমন কি কৃষ্ণাকেও বলেনি, সে আগে রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে বিমলকে ডেকেছিল, 'বিমল, বিমল তাড়াতাড়ি।'

এই 'তাড়াতাড়ি' শব্দটার মধ্যেই একটা অপরাধ জড়িয়ে আছে। সে যদি তখন বিমলকে তাড়া না দিত, যদি দু'জনে একই সঙ্গে রাস্তা পেরিয়ে আসতো কিংবা বিমলের ছাতাটা উল্টে যাবার পর বিমল যখন একাই সেটাকে ঠিক করতে ব্যস্ত ছিল তখন যদি সে বিমলের পাশ থেকে দৌড়ে চলে না এসে বিমলকে সাহায্য করত তাহলে হয়তো কিছুই ঘটতো না। 'তাড়াতাড়ি' শব্দটাই সম্ভবত বিমলকে ভেতরে ভেতরে নাড়া দিয়ে থাকবে। ওই শব্দটাই তাকে এমন উত্তেজিত করে তাড়া দিয়েছিল যে, সে শুধু বন্ধুর ডাকটার দিকেই মন রেখে ছুটে আসছিল। দু'দিকে তাকিয়ে সতর্ক হবার কথা তার মনে হয়নি। সুজিত হাসপাতালে বিমলকে নিয়ে আসার সময়ই

ভেবেছিল এই দুর্ঘটনার পেছনে খুব সূক্ষ্মভাবে তার একটা ভূমিকা কাজ করছে। সেই কারণেই এখন পর্যন্ত সে কাউকে, বলতে পারেনি বরং গোপন করে গেছে যে. সে বিমলকে ডেকেছিল, 'বিমল, তাড়াতাড়ি।'

কৃষ্ণা গতকাল রাত্রেই প্রথম জিজ্ঞেস করেছিল, 'ব্যাপারটা কি তোমার চোখের সামনে ঘটেছে?'

সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত ছিল বলে সুজিত তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারেনি। সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলেছিল, 'ঘটনাটা যখন আমার চোখে পড়ল তখন বিমল রাস্তায় পড়ে আছে। আমি দেখলাম ওর শরীরের চারপাশে রক্ত।'

কৃষ্ণা বিষণ্ণ গলায় প্রশ্ন করল, 'মিনিবাসটা তখন কোথায়?'

জলন্ত সিগারেট শুদ্ধ হাতটা কপালের কাছে তুলে আনল সুজিত। হাতের আঙুলগুলো কপালে বোলাতে বোলাতে ক্লান্ত এবং পরাজিত গলায় সুজিত বলল 'ইনফ্যাক্ট মিনিবাসটাকে আমি দেখতেই পাইনি। আমার নজর তখন বিমলের দিকে।'

কৃষ্ণা চুপ করে থাকল খাণিকক্ষণ। সুজিত অন্যমনস্কভাবে সিগারেটে টান দিল। কৃষ্ণা উদাস গলায় বলল, 'একেই বলে নিয়তি। যার যেখানে মৃত্যু লেখা থাকে সেখানেই সেটা ঘটবে। তোমরা তো পাশাপাশি কিম্বা আগু-পিছু হেঁটে রাস্তা পার হচ্ছিলে, অথচ বাসটা ঠিক বিমলকেই—'

কৃষ্ণা থেমে গেল। সুজিত বুঝতে পারল, কৃষ্ণার গলা ধরে আসছে। বিমল সিগারেটের ছাই ঝেড়ে নিয়ে বলল, 'বিমলের মাথায় ছাতি ছিল। একই ছাতির নিচে দু'জনে হেঁটে আসছিলাম। বাসটাকে দেখে দু'জনে রাস্তা পার হওয়ার জন্য একই সঙ্গে দৌড়েছিলাম। হাওয়ায় ওর ছাতাটা উল্টে যেতে ও বোধহয় মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আমি রাস্তা পেরিয়ে ওপারে গিয়ে দাঁড়াতেই হট্টগোল শুনি। তারপর তো…'

সুজিত গত রাত্রের কথাটা মনে মনে ভাবতে গিয়ে দেখল,

কৃষ্ণাকেও সে বলতে পারেনি বা বলতে চায়নি, সে হঠাৎ দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে ওপারে গিয়ে ডেকেছিল, বিমল তাড়াতাড়ি। এই শব্দটুকুর গায়ে সুজিতের একবিন্দু অপরাধ খুব ক্ষীণভাবে লেপ্টে আছে। কিন্তু এটা কি সত্যিই কোন অপরাধ? এটা তো খুব স্বাভাবিক একটা আচরণমাত্র। তবু কেন বার বার মনে হচ্ছে ওই একটা শব্দ বা ডাকই বিমলকে ভেতরে ভেতরে তাড়া দিয়ে অসতর্ক করেছিল।

সুজিতের মনের মধ্যে ঘূর্ণি হাওয়ায় পাক খেতে থাকে কেবলমাত্র ওই একটা দৃশ্য আর নিজের গলার একটা ডাক। ফুটন্ত ভাতের হাড়ির ঢাকনা যেমন করে হাড়ির ভেতরের বাষ্পের চাপে বার বার খুলে পড়তে চায়, সুজিতের মনের মধ্যে অপরাধবোধের ধাক্কাটা বার বার তার ভেতরের শান্তিটাকে নাড়িয়ে দেয়, শোক অথবা দুঃখের স্মৃতিটাকে আরও মর্মান্তিক করে তোলে। সুজিত নিঃশব্দে ঘামতে থাকে।

অন্যমনস্কের মতো অভ্যাসের টানে সে হেঁটে আসতে আসতে হঠাৎ বৌবাজারের মুখে এসে থমকে দাঁড়াল। লটারীর দোকানের সামনে এলে বিমলকে বেশি করে মনে পড়ে। আজ থেকে তিনদিন আগেও তারা এই দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। বিমল কখনও লটারীর দোকানের ভেতরে ঢোকেনি। সুজিতের ইচ্ছে হচ্ছিল না সে লটারীর দোকানের ভেতরে ঢোকে। কিন্তু দোকানটার দিকে তাকিয়ে সে অবাক হল। দোকানটা ফুল দিয়ে সাজানো। কাউণ্টার থেকে টেপ রেকর্ডারে গান বাজানো হচ্ছে।

সুজিত দোকানের সামনে এল। কাউণ্টারে বেশ ভিড়। কাউ-ণ্টারের মাথার উপর সাদা পিচ বোর্ডে একটা নম্বর লাল কালিতে লেখা। বোর্ডটা ফুল দিয়ে সাজানো। টিকিটের নম্বরটার দিকে তাকিয়ে সে কিছু একটা ভাবল। ভাবতে ভাবতেই সুজিতের বুকের মধ্যে হঠাৎ ফিনকি দিয়ে রক্ত লাফিয়ে উঠল। তার শরীর জুড়ে তির তির করে কাঁপতে লাগল একটা উত্তেজনা। ইতিপূর্বে তার চল্লিশ

বছরের জীবনে এমন উত্তেজনা আর কখনও আসেনি।

সুজিত ঝড়ের বেগে ষ্টেশনে এল। একটা ট্রেন তখনই ছাড়ছিল। অন্যদিন হলে সে কখনও বাড়ি ফেরার জন্য দৌড়ে ট্রেন ধরত না। কিন্তু আজ ধরল। ট্রেন চলতে শুরু করলে তার মনে হল, ট্রেনের গতি অন্যদিনের চাইতে আজ যেন অনেক কম। পাঁচ মিনিট সময়ও আজ তার কাছে অনেক বেশি মনে হচ্ছিল। নিজের ঘরে এসে সুজিত চারপাশে তাকালো। পিঙ্কি খাটের ওপর বসে লুডোর গুটি নিয়ে একা একা খেলছে। কৃষ্ণা বাথরুম থেকে ঘরে এসে সুজিতকে দেখল। তার পায়ের পাতা ভেজা। পাপোসের ওপর পা ঘষতে ঘষতে বলল, 'অফিস ছুটি হয়ে গেল বুঝি?'

সুজিত ভেতরের উত্তেজনা চেপে রেখে শান্ত গলায় বলল, 'না। মিটিং-এর পর আমি চলে এলাম। ভাল লাগছিল না।'

কৃষ্ণা চলে যাচ্ছিল। সুজিত পেছন থেকে ডাকল। কৃষ্ণা ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'কিছু বলছ?'

সুজিত বলল, 'না, মানে কোথায় যাচ্ছো?'

কৃষ্ণা উত্তর দিল, 'চা করতে যাচ্ছি। চা খাবে নিশ্চয়ই।' সুজিত ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বলল, 'নন্দিতাদের ঘরে কারা যেন এসেছে। তুমি জানো?'

কৃষ্ণা ছোট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ওর দাদারা এসেছে?'

সুজিত বলল, 'বিমলের ঘড়ি, আংটিগুলো ফেরত দিয়ে দিয়েছ?'

কৃষ্ণা মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'না। এখনও দেইনি। সেদিনের পর থেকে যা ঝড় গেল। সময় পেলাম কোথায়। ও সব জিনিস তুমি হাতে করে এনেছো তুমিই বুঝিয়ে দিয়ে এসো। ও কাজ আমি পারব না।'

সুজিত চোখের কোন দিয়ে কৃষ্ণাকে দেখে নিয়ে বলল, 'আজই ওগুলো দিয়ে আসতে হবে। তুমি একবার নন্দিতার ঘরে গিয়ে দেখে এসো তো বাইরের লোকজন কারা কারা আছে।'

কৃষ্ণা আপত্তি করার ভঙ্গিতে বলল, 'এ আর দেখার কী

আছে তুমি গিয়ে জিনিসগুলো বুঝিয়ে দিয়ে এসো।'

সুজিত একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'বেশ! তুমি বার করো।'

কৃষ্ণা আলমারির ভেতর থেকে একে একে জিনিসগুলো এনে টেবিলে রাখল। সুজিত স্থির চোখে প্রত্যেকটা জিনিস দেখছে। তার ভেতরে দমফাটা উত্তেজনা। বুকের মধ্যে নদীর ঢেউয়ের মতো রক্তের উথাল-পাথাল চলছে। সুজিত প্রথমে হাতঘড়ি আর আংটিটা নিল। পার্সটা নিতে গিয়ে তার আঙুলগুলো এক সেকেণ্ডের জন্যে শুধু কাঁপল। আস্তে আস্তে পার্সটা খুলল। বাঁদিকে বিমলের ছবি। ডানদিকের কোনে মান্থলি টিকিট। পার্সের ভেতরে দশটাকার একটা নোট। দু' টাকার চারটে। সুজিত পার্সের ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে দিল। বিমলের ফটোটার দিকে চোখ পড়তেই সুজিত মুখ ফেরাল। তার আঙুল কেঁপে উঠল মুহূর্তের জন্য। তারপর চোখ বুজে কয়েক সেকেণ্ড স্থির দাঁড়িয়ে থাকল সুজিত। আলমারী বন্ধ করে কৃষ্ণ স্বামীর দিকে দেখল। সে জানে শোক ভুলতে সময় লাগে বিমলের ব্যবহার করা জিনিসগুলো হাতে নিয়ে বিমলের স্মৃতিট স্বামীর মনে আবার ফিরে এসেছে। কৃষ্ণা শুধু অস্ফুটে বলল, 'ভেবে লাভ নেই। মন খারাপ করে কষ্ট পেয়োনা। যে যাবার সে যাবেই। সবই তো কপাল।'

চট করে পার্সটা বন্ধ করে দিল সুজিত। জিনিসগুলো ফিরিয়ে দিয়ে ওপরে উঠে এসে বলল, 'যাক, একটা ঝামেলা মিটল। বিমলের জিনিস ওর বৌকে দিয়ে এলাম। নন্দিতা বোবার মতো হাত বাড়িয়ে জিনিসগুলো নিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেঁদে ফেলল। আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না।'

সুজিত অফিস চলে যাবার পর কৃষ্ণা রান্নার পাট চুকিয়ে স্নান করতে গেল। পিঙ্কি অনেক আগেই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কাজের লোকটা রান্নাঘরের কোনে খেতে বসেছে। কৃষ্ণা স্নান সেরে এসে সবে খেতে বসবে ঠিক তখনই অফিস থেকে সুজিত ফিরে এল। কৃষ্ণা ভাবেনি আজও সুজিত অফিস থেকে চলে আসবে এবং এত

তাড়াতাড়ি। তবে কি অফিসেই যায়নি নাকি শরীর খারাপ বলে বাড়ি চলে এসেছে। কিন্তু কথাটা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে সে থমকে গেল। সুজিতের চোখে মুখে খুশির উত্তেজনা। সে ঘরময় যেন ছুটে বেড়াতে চাইছে।

কৃষ্ণা কিছুই বুঝতে না পেরে বলল, 'হঠাৎ চলে এলে? কী ব্যাপার?'

সুজিত নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে কৃষ্ণাব কাছে এলো। কৃষ্ণার ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, 'চুপ! দারুণ ব্যাপার ঘটেছে অথচ চিৎকার করে বলতে পারছি না। বিমলটা যদি থাকত তাহলে—

কৃষ্ণা চোখ কুচকে তাকাল। বলল, 'কী এমন দারুণ ব্যাপার?'

সুজিত কৃষ্ণার কাঁধে হাত রেখে চাপা অথচ উত্তেজিত গলায় বলল, 'তুমি শুনলে আনন্দে পাগল হয়ে যাবে। আমি, আমি লটারীর ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে গেছি। সাত লাখ টাকা!'

কৃষ্ণার চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল। কথা বলতে গিয়ে তার কথা জড়িয়ে গেল। অবিশ্বাস আর আনন্দ এক সঙ্গে মিশে গেলে যেমন হয় কৃষ্ণার মধ্যে এখন তাই হচ্ছে। বিশ্বাস করতে পারছে না অথচ অবিশ্বাস করবার কারণও নেই। সুজিত লটাবীর টিকিটটা তার সামনে মেলে ধবেছে। সেই দোকান থেকে আনা প্রাইজের ছাপানো তালিকা। কৃষ্ণা একবার, দু'বার, তিনবার •স্বরটা মেলাল। প্রতিবারই মিলে যাচ্ছে আর তাব শরীরের মধ্যে তুবড়ি ফেটে যাওয়ার মত আনন্দ আর বিস্ময়ের বিস্ফোরণ ঘটে যাচ্ছে। আলোর ফুলকির মতো শিরায় শিরায় ছড়িয়ে যাচ্ছে সম্পূর্ণ অচেনা একটা উত্তেজনা আর শিহরণ। আনন্দের এমন বুকফাটা অনুভব এ জীবনে সে আর কখনও পায়নি। কৃষ্ণা দু'হাতে সুজিতের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আজই জানলে?'

সুজিত খাটের ওপর পিঙ্কির দিকে তাকালো। পিঙ্কি ঘুমিয়ে আছে। সুজিত নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল,

'অফিস যাবার পথেই জানলাম। অফিসে আর যাইনি। টিকিটটা এখনই ব্যাঙ্কের লকারে রেখে আসতে হবে।'

কৃষ্ণা ব্যস্ত হবার ভঙ্গিতে বলল, 'তুমি একা যেও না। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

ব্যাঙ্কের লকারে টিকিটটা রেখে ফিরে আসবার সময় সুজিত বলল, 'এখনই কথাটা কাউকে বলতে হবে না। নন্দিতাকেও নয়। এই শোকের মধ্যে এমন একটা খবর বলতে যাওয়া ভালো দেখাবে না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার আগে সুজিত বিমলের ঘরের দিকে তাকালো। ঘরের দরজা আধখানা খোলা। ভেতর থেকে নন্দিতার গলা ভেসে আসছে। সুজিত হঠাৎ থেমে গেল।

কৃষ্ণা বলল, 'কি হল? থামলে কেন?'

সুজিত মনে মনে কিছু একটা ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে উত্তর দিল, 'নন্দিতার সঙ্গে একটু দেখা করে আসি।'

নন্দিতা খাটের ওপর বসে। সামনে চেয়ারে নন্দিতার দাদা। সুজিতকে দেখে নন্দিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন! অফিস যাননি বুঝি।'

সুজিত চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'গিয়েছিলাম, কিন্তু কাজে মন বসাতে পারছি না বলে চলে এসেছি।'

নন্দিতা চুপ করে থাকল। নন্দিতার দাদা বলে উঠলেন, 'সেটাই তো স্বাভাবিক। আপনারা তো ছিলেন যমজ ভাইয়ের মতো। বিমল আর নন্দার মুখে আপনার কত গল্প যে শুনেছি।'

নন্দিতা মাথা নামিয়ে রেখেছে। চোখ নিচের দিকে। ওর গোটা শরীর জুড়ে থমকে আছে এমন এক বিষণ্ণতা যে ওর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। সুজিত চলে যাবে কিনা ভাবছিল। কৃষ্ণা এতক্ষণে ওপরে উঠে গেছে। সুজিত চারদিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'টুকাই কোথায়?'

নন্দিতা চোখ না তুলেই জবাব দিল, 'পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে।'

নন্দিতার দাদা এবার ঘুরে বসলেন। সুজিতের মুখোমুখি হয়ে

হয়ে বললেন, 'আজ আপনাদের অফিসে গিয়েছিলাম। ফ্ল্যাট কেনবার জন্যে অফিস থেকে আর প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে বিমল যত টাকা ধার করেছে তাতে তো এখন আর খুব বেশি টাকা নন্দিতার পাওয়ার আশা নেই। তাই বলছিলাম, ফ্ল্যাটটা বেচে দিয়ে ও বরং আমার ওখানে থাকুক। টাকাগুলো ব্যাঙ্কে রাখলে যা সুদ পাবে তাতে ওর চলে যাবে। তাছাড়া আমি তো আছি। ছেলেটাকে তো মানুষ করতে হবে।'

সুজিত ঠিক বুঝতে পারল না, এ ব্যাপারে তার কী বলা উচিত হবে। নন্দিতার দাদা কি তার মতামত চাইছেন? সুজিত নন্দিতার দিকে তাকাল। নন্দিতা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর মুখ দেখে মনের কথা বোঝা যাচ্ছে না।

খানিক বাদে সুজিত উপরে উঠে এলো। কৃষ্ণা বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়েছিল। সুজিতকে দেখে বলল, 'ওর দাদা এসেছিল বুঝি!'

সুজিত বলল, 'হ্যাঁ! নন্দিতা খুব প্রবলেমে পড়ে যাবে।'

কৃষ্ণা সোজা হয়ে বসে বলল, 'কিসের প্রবলেমে?'

সুজিত কৃষ্ণাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে বলল, 'মেয়েটার গোটা জীবন চলবে কেমন করে? শুধু ফ্ল্যাট থাকলেই তো হবে না।'

কৃষ্ণা বুকের আঁচল ঠিক করে নিয়ে বলল, 'কিন্তু নন্দিতা দাদাদের ওখানে যাবে না। ভাইদের গলগ্রহ হতে ওর আপত্তি আছে। ও নিজে চাকরী খোঁজার চেষ্টা করবে।'

সুজিত সিগারেট ধরিয়ে নেভা কাঠিটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর সিগারেট টেনে বলল, 'চাকরী তো আর মশা-মাছি নয় যে হাত বাড়ালেই পেয়ে যাবে। চাকরী না পেলে কী হবে তাই ভাবো।'

কৃষ্ণার মন জুড়ে আজ সুখের ঝড় বইছে। এ সময় অন্য কোন ভাবনা মনে বসতে চায় না। বিছানা থেকে উঠে বসতে বসতে তাই বলল, 'আমি ভেবে কী করব! ওর দাদারা আছেন, ওরা যা ভাল

বুঝবেন তাই হবে।'

সুজিত নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগল। হঠাৎ সে ঘুরে বসে কৃষ্ণাকে বলল, 'আচ্ছা ধর, যদি এমন হয় লটারী থেকে পাওয়া টাকাগুলোর কথা বলে যদি কিছু টাকা আমি ওকে দিতে চাই?'

কৃষ্ণা বিছানার ওপর উঠে বসেছিল। এবার স্থির চোখে সুজিতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল 'কত টাকা?'

সুজিত মনে মনে অস্বস্তিবোধ করছে। কৃষ্ণার দিকে না তাকিয়ে সে বলল, 'ধর যদি লাখ খানেক, না-না, অত নয়, অন্তত হাজার পঞ্চাশেক টাকা যদি নন্দিতাকে দিই তাহলে কেমন হয়?'

কৃষ্ণার চোখ কঠোর হচ্ছিল। এবার চোখের সঙ্গে গলার স্বরেও সেই কাঠিন্য নেমে এলো। সুজিতকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমার টাকা তুমি যাকে খুশি দিতে পারো। তবে এতটা আদিখ্যেতা না করাই ভাল। লোকে অন্য রকম ভাববে।'

সুজিত অবাক চোখে কৃষ্ণাকে লক্ষ্য করছিল। তেমন ভাবেই বলল, 'অন্যরকম ভাববে মানে?'

কৃষ্ণা খাট থেকে নেমে যেতে যেতে বলল, 'বন্ধুর বিধবা বৌকে নিয়ে আদিখ্যেতা করলে লোকে অন্য রকম সন্দেহ করবে। সেটা আমার সহ্য হবে না। নন্দিতার বয়সটা তো বুড়িয়ে যায় নি। এবার থেকে একটু হিসেব করে চলো। অত ঘন ঘন ওদের ঘরে যখন-তখন যাওয়ার দরকার নেই।'

কৃষ্ণা পাশের ঘরে চলে গেল। সুজিত অবাক চোখে কৃষ্ণাকে চলে যেতে দেখল। তার মন জুড়ে একটা অন্য রকম বোধ দাপাদাপি করছে। এই বোধটাকে সে চেনে না, তার নাম জানে না। কৃষ্ণার মনেও বোধ হয় নন্দিতাকে নিয়ে একটা আশঙ্কা জন্মেছে। ওদের ঘরে যাওয়া, নন্দিতার সঙ্গে কথা বলা এগুলোর অর্থ কয়েকদিন আগে যেমন ছিল আজ কি সেটা পাল্টে যাচ্ছে? সুজিত জানে না, বুঝতে পারে না, নন্দিতা মেয়ে বলেই কি কৃষ্ণা ভেতরে ভেতরে ভয় পাচ্ছে। অথচ কয়েকদিন আগেও যখন সুজিত তরল গলায় কৃষ্ণাকে চটিয়ে

দেবার জন্য বলতো, 'নন্দিতার মতো অমন গায়ের রঙ বাঙালী মধ্যবিত্ত মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যায় না। ফিগারটাও দারুণ। বিমলটা সত্যিই লাকি।'

কৃষ্ণা তখন ঠাট্টাটা ধরতে পারতো। কনুই দিয়ে সুজিতের পাঁজরে খোঁচা মেরে বলতো, 'বিছানায় বৌয়ের পাশে শুয়ে অন্য মেয়ের কথা ভাবতে তোমার লজ্জা করে না।'

সুজিত উত্তর দিত, 'লজ্জা করবে কেন? কত সাহেব শুয়ে শুয়ে সোফিয়া লোরেন আর এলিজাবেথ টেলরের কথা ভাবে তা জানো। আমি তো স্কুলে পড়ার সময় তিন রাত জেগে জেগে সার্কাসে ট্রাপিজের খেলা দেখায় তেমন একটা মেয়ের কথা ভেবেছিলাম।'

কৃষ্ণা সুজিতের বুকে আলতো করে ঘুষি মেরে বলেছিল, 'তুমি একটা বদ্। ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের স্বপ্ন দেখ।'

সুজিত বুকে রাখা কৃষ্ণার হাতটা নিজের মুঠোয় নিয়ে আলতো করে চাপ দিয়ে বলেছিল, 'সেটাই মানব চরিত্রের স্বাভাবিক লক্ষণ। আমি তো ইমপোটেন্ট কিংবা হোমো সেক্সচুয়াল নই। ঘর সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসও নেই নি! সুন্দরী মেয়ে দেখলে তাকে নিয়ে ভাবতে ভালো লাগে, দেখতেও ভাল লাগে। যেদিন লাগবে না, বুঝব সত্যি বুড়ো হয়ে গেছি।'

কৃষ্ণা সুজিতের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে বলে উঠতো, 'অন্য মেয়ের কথা থাক। যে মেয়েটাকে পাশে পেয়েছো এখন শুধু তার কথা ভাবো। সেও কিন্তু ফ্যালনা নয়।'

সেদিন যা ছিল শুধুই ঠাট্টা আজ কি সেইটাকে ভেতরে ভেতরে সত্যি করে তুলছে কৃষ্ণা। কৃষ্ণা ঘরে ফিরে আসতেই সুজিত বলল, 'টাকাটা না হয় তুমিই হাতে করে দেবে। তাতে তো দোষ নেই। নন্দিতা তো তোমারও বন্ধু।'

কৃষ্ণা চোখ কুচকে তাকালো। তার চোখের দৃষ্টি যত তীক্ষ্ণ হতে লাগল ততই সেই দৃষ্টির মধ্যে ফুটে উঠতে লাগল একটা সন্দেহ। কঠিন গলায় সে বলল, 'তোমার এত দাতা হবার শখ হয়েছে কেন

বলোতো। আর তোমার দেওয়া এতগুলো টাকা নন্দিতাই বা হাত পেতে নেবে কেন ? ওঁরও তো একটা আত্মসম্মান বোধ আছে।'

কথা শেষ করেই কৃষ্ণা ঘুরে দাঁড়িয়ে আলমারি খুলতে লাগল। সুজিত দম বন্ধ করা অস্বস্তি নিয়ে কৃষ্ণার দিকে তাকালো। তার বুকের মধ্যে কোথাও একটা কাঁটা বিঁধে আছে, যার নিঃশব্দ যন্ত্রণা আর অবিরাম রক্তপাত থেকে তার রেহাই নেই। নিজের ভেতরটা যে মানুষ দেখতে পায় না আজকের দিনে বোধ হয় তারাই যন্ত্রণাহীন সুখের জীবন ভোগ করতে পারে। অথচ আশ্চর্য, যা নিজে দেখতে পাই, তা অন্যকে দেখাতে পারি না। কৃষ্ণার ব্যবহার, তার ঋজু গলার স্পষ্ট কথা সুজিতকে ভেতরে ভেতরে আহত করেছে। সে ঈষৎ কঠিন গলায় বলল, 'ঘটনাটা যদি উল্টো হতো, তাহলে ?'

কৃষ্ণা আলমারির ভেতরে কিছু একটা খুঁজছিল। মুখ না ঘুরিয়েই জবাব দিল, 'তাহলে কী ?'

সুজিত এবার আরও স্পষ্ট করে কৃষ্ণাকে বুঝিয়ে দেবার জন্য বলল, 'যদি বিমলের মতো আমার মৃত্যু হতো আর আমার মতো বিমল যদি লটারী পেয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা তোমাব হাতে দিতে আসতো তাহলে তোমার কেমন লাগতো ? তুমি বিমলের এই অ্যাটিচুডটাকে সন্দেহ করতে না বিমলকে ফিরিয়ে দিতে ?'

কৃষ্ণা সহসা ঘুরে দাঁড়ালো। সরাসরি চোখ রাখল সুজিতের চোখের ওপর। কৃষ্ণার দুই চোখে রাগ ঝলসাচ্ছে। সে চাপা গলায় ভর্ৎসনার স্বরে বলল, 'আমাকে তুমি কী ভাবো! আমার কোন বোধ-বুদ্ধি নেই। বিনা স্বার্থে, শুধু নিঃস্বার্থ উপকারের তাগিদে কেউ কাউকে অতগুলো টাকা দেয় না।'

স্থির গলায় সুজিত বলল 'আমি যে দিতে চাইছি তার পেছনে কী স্বার্থ আছে বলে তুমি মনে কর ?'

কৃষ্ণা আলমারি বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'তুমি বোকা আর অনভিজ্ঞ তাই দিতে চাইছো। তুমি কেন বুঝছো না, তোমার এই দেয়াটা ওঁর আত্মীয়রা ভাল চোখে দেখবে না। ওরা এর মধ্যে অন্য অর্থ

খুঁজবে। নন্দিতার পক্ষে সেটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। মায়ের পেটের ভাইকে কেউ অতগুলো টাকা দিয়ে আজকের দিনে সাহায্য করে না। বন্ধুর যুবতী বিধবা স্ত্রীকে দিলে তার কী মানে দাঁড়াবে সেটা অনুমান করতে পারছো?'

সুজিত চুপ করে গেল। কৃষ্ণা যা বলেছে সে কথাগুলো হয়তো মিথ্যে নয়। মানুষের মন সব কাজের মধ্যেই উদ্দেশ্য খুঁজে বেড়ায়। কথাটা জানাজানি হলে এই দাতব্যের অন্য অর্থও বার করবে অনেকে। কিন্তু অন্যরা কী ভাববে সে ভাবনায় নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারছে না সুজিত। সমাজ, সামাজিক মানুষের চুলচেরা বিচার, আত্মীয় প্রতিবেশীদের অন্যায় সন্দেহ এবং ব্যাখ্যা সব কিছু ছাপিয়ে বিমলের মুখেব সেই ছবিটা তার মধ্যে থেকে থেকে ভেসে উঠছে। বৌবাজারের মুখে উড়ালপুলের কাছটায় বিমল দাঁড়িয়ে। বিমলের সামনে সুজিতের দুটো হাত বাড়ানো। দুটো হাতে সাদা কাগজের খামে পোরা দুটো লটারীর টিকিট। সুজিত বলছে, 'যে কোন একটা তুলে নে।'

সুজিতের বাঁ হাতের টিকিটটা তুলে নিচ্ছে বিমল। সেদিন, সেই মুহূর্তে কেউই জানতো না, তাচ্ছিল্যভবে বিমল যা তুলে নিয়ে পার্সের ভেতরে ঢোকালে সেটা নিছক এক টুকরো ছাপা কাগজ নয়—জীবনের পরম সৌভাগ্যকে সে তুলে নিল। সেই সৌভাগ্য এখন সুজিতের লকারে বন্দী হয়ে আছে। কিন্তু তার হাতটা যে বার বার ম্লান হয়ে যাচ্ছে সুজিতরে কাছে। এই মলিনতা অসহ্য বলেই সুজিত মুক্তির পথ খুঁজছে। অথচ তার সামনে এখন কোন পথই যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। কৃষ্ণা অথবা কৃষ্ণাদের মতো কেউ না কেউ দু'চোখে সন্দেহ আর ঠোঁটে ভৎর্সনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সুজিত মনে মনে ভাবল, আসল সত্যটা কি কৃষ্ণাকে জানিয়ে দেবে? ঘটনাটা জেনে যাবার পর কৃষ্ণা কি মত বদলাবে? কিন্তু-'কিন্তু' শব্দটা বড় মারাত্মক। সে সব সময় সব ইচ্ছার পথ আটকে দাঁড়ায়। এখনও দাঁড়াল। যে মিথ্যাকে নিজে জেনে শুনে

বাঁচিয়ে রেখেছে আজ সেটা ভেঙ্গে দিলে বিশেষ করে এই পরিস্থিতিতে সেটা কি কৃষ্ণা বিশ্বাস করবে? হয়তো ভাববে, এটা সুজিতের তৈরি করা কোন চতুর খেলা। হয়তো, নন্দিতাকে টাকা দেবে বলেই সুজিত এখন মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। কৃষ্ণার ভেতরে সন্দেহ আরও গাঢ় হবে। নন্দিতার কানেও কথাটা পৌঁছে যাবে অন্য ভাবে। নন্দিতা ভাবতে পারে, অন্তত ভাবা স্বাভাবিক, যে তাঁর অসহায় অবস্থাকে করুণা করে ভিক্ষা দিচ্ছে সুজিত আর ভিক্ষাটা আসছে একটা ছল চাতুরীর মাধ্যমে। যদি কৃষ্ণা প্রশ্ন করে, চোখে চোখ রেখে জানতে চায়, প্রথম দিনেই কথাটা আমাকে বলো নি কেন? এখন সবাইকে জানিয়ে দেবার পর তুমি বলছো—

সুজিতের কপালে ঘাম জমতে শুরু করল। সে মনে মনে হিসেব করে দেখল বিমল তার সংসারের জন্য বিশেষ কিছুই রেখে যেতে পারেনি। ফ্ল্যাট কেনার টাকাটা এখনও অফিসের মাইনে থেকে কাটছে। পুরো টাকাটা কেটে আর হয়তো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

সুজিত উঠে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বাইরে তাকালো। ভেতরে অথবা বাইরে কোথাও এখন এক কণা শান্তি নেই। ঘরের মধ্যে কৃষ্ণা শাড়ি বদলে তৈরি হচ্ছে। বোধ হয় বাইরে কোথাও যাবে। কৃষ্ণা কোথায় যাবে সেটা জানার কোন আগ্রহ বোধ করল না সুজিত।

কৃষ্ণা দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, 'আমি বেরুচ্ছি। আজ দোকানে গিয়ে ফ্রিজটা পছন্দ করার কথা ছিল।'

সুজিত জবাব দিল না। কৃষ্ণা দরজা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগল। ওর পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে নিচে নেমে মিলিয়ে যেতে থাকল।

দরজা বন্ধ করে সরে এসে আবার সিগারেট ধরাল সুজিত। নন্দিতা এবং কৃষ্ণা দুজনের মুখটা এখন পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছে সে। তার মনে পড়ছে, একটু আগে কৃষ্ণা বলেছিল, 'নন্দিতারও তো

একটা আত্মসম্মান বোধ আছে।'

মনে মনে শুধু ভাবল, নিশ্চয়ই আছে। নন্দিতার আত্মসম্মান-বোধ থাকাটাই স্বাভাবিক। সেজন্যেই ওকে একবার জিজ্ঞেস করা দরকার, 'নন্দিতা তোমার আর টুকাইয়ের কথা ভেবে আমি যদি কিছু টাকা তোমাদের দেই, তোমরা কি ফিরিয়ে দেবে? এ টাকাটা আমার রোজগার করা নয়। আমার ভাগ্য আমাকে হঠাৎ পাইয়ে দিয়েছে। আমি আমার ভাগ্য দিয়ে তোমার দুর্ভাগ্যকে একটু আড়াল করতে চাইছি।'

মরীয়া হয়ে নিচে নেমে গিয়েও আবার ওপরে উঠে এলো সুজিত। কথাটা বলবার জন্য তার বুকের মধ্যে একটা কষ্ট কেবলই ছটফট করছে অথচ সে বলতে পারছে না। বুকের মধ্যে যন্ত্রণা নিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল। একদিন, দু'দিন, তিন দিন চলে যাবার পরও সে দেখল কথাটা সে বলে উঠতে পারছে না। নিজেকে তৈরি করে নিয়ে আজ আবার নিচে নামল। নন্দিতার বন্ধ দরজার দিকে চোখ রেখে ভাবল, বুকের কষ্টটাকে হালকা করতে না পারলে তার শান্তি নেই। বন্ধ দরজাটা আস্তে করে খুলে গেল। সুজিত ভাবেনি, সে না ডাকতেই নন্দিতা দরজা খুলে দাঁড়াবে। নন্দিতা দরজা খুলে সুজিতকে দেখে হাসল তারপর তাকে চমকে দিয়ে বলল, 'আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।'

সুজিতের গলা বুঝে আসছিল। সে কোন মতে বলল, 'আমার কাছে? কেন?'

নন্দিতার চোখে একবিন্দু হাসির আভা। নন্দিতা বলল, 'সুখবরটা কৃষ্ণা আজই দিল। আপনার এতদিনের আশা এবার সার্থক হল। আপনি সত্যিই ভাগ্যবান।'

সুজিতের শরীর কাঁপতে আরম্ভ করল। তার মনে হল, ওই দুরন্ত মিনিবাসের অজস্র চাকা এখন তাকেই পিষ্ঠ করে ক্রমাগত ছুটে যাচ্ছে অন্ধকারের দিকে। সে নন্দিতার চোখের সামনে দাঁড়াতে পারছে না। নন্দিতা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'একি এত

ঘামছেন কেন ? শরীর খারাপ ?'

সুজিত মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'প্রেসারটা বোধহয় বেড়েছে।'

নিজের ঘরে ফিরে আসতে আসতে সুজিত ভাবল, না আজকেও সে কথাটা বলতে পারল না। যে কথাগুলো বলবে বলে সে মনে মনে তৈরি হয়ে নিচে নেমেছিল সেই কথাগুলো ঘরে এসে আবার মনে মনে আওড়ালো সুজিত।

সন্ধ্যের কিছু পরে, যখন অন্ধকার ঘন হতে শুরু করে ঠিক তখন টেম্পো করে নতুন সোফা আর ডিভান কিনে ফিরে এলো কৃষ্ণা আর ওর ভাই অজয়। ওরা ওপরে ঘর সাজাতে ব্যস্ত। সুজিত নিচে নেমে নন্দিতার দরজায় দাঁড়াল। বাইরে থেকে সন্তর্পনে টোকা দিল। দরজা খুলে দিল নন্দিতা। সুজিত দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

নন্দিতা অবাক চোখে সুজিতকে দেখছে। সুজিত বুঝতে পারছে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয়না। সে ভেতরে এলো। ঘরের মধ্যে ওরা দুজন মুখোমুখি। সুজিতের সামনে সেই কঠিন মুহূর্ত। সুজিত নন্দিতার চোখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে নিতে বুঝল, সে বোধহয় এবারও পারবে না। সত্যিই পারল না।

নন্দিতার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলোই গুছিয়ে বলতে পারল না সুজিত। নন্দিতা আরও অবাক চোখ তুলে সুজিতের দিকে তাকাল। ওর চোখ ভিজে আসছিল।

সুজিত বলল, 'তুমি আমাকে ভুল বুঝো না নন্দিতা। আমি দয়া দেখাতে চাইছি না। দাতা সাজতেও আমার আগ্রহ নেই। আমার বিবেক আমাকে খোঁচাচ্ছে। টাকাটা নিলে আমি শান্তি পাব।'

নন্দিতা ম্লান হাসল। হাসিটা ঠোঁটে ধরে রেখে বলল, 'আমার খুব অবাক লাগছে। এতগুলো টাকা শুধু শুধু আমাকে কেন দেবেন। আর যে ঋণ শোধ করবার ক্ষমতা নেই তা আমি নেব কেমন করে।'

সুজিত ওকে বাধা দিয়ে বলল, 'তোমাকে শোধ করতে হবে না

নন্দিতা। এটা আমার পক্ষ থেকে টুকাইকে দিচ্ছি।'

নন্দিতার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। জানালার দিকে সরে যেতে যেতে বলল, 'আমি অক্ষম। আমাকে ভুল বুঝবেন না। এতগুলো টাকা আপনার দেওয়ার ক্ষমতা থাকলেও আমার নেওয়ার উপায় নেই। লোকের কাছে, আত্মীয়স্বজনদের কাছে আপনার এই মহত্বের অর্থ কদর্য হবে। তাতে আমাদের অশান্তি বাড়বে। সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। ভাগ্য আপনাকে জয়ী করেছে, সেই জয়ে আমার কোন অধিকার নেই। আমার তুর্ভাগ্যকে মেনে নিতেই হবে।'

সুজিত আস্তে আস্তে উঠে এলো। দরজা পেরোতে গিয়ে দেখল নন্দিতা দরজার কাছে সরে এসেছে। সুজিত বেরিয়ে গেলেই হয়তো সে দরজা বন্ধ করে দেবে। সুজিত নন্দিতার মুখের দিকে তাকাল। ভেজা যুঁইফুলের মতো দেখাচ্ছে নন্দিতার মুখটাকে। দরজা পেরিয়ে আসতে সে মনে মনে বলল, 'আমার ভাগ্য নয় নন্দিতা, আমি অন্যের ভাগ্যকে চুরি করেছি। একটু প্রায়শ্চিত্ত করতে পারলে শান্তি পেতাম। অথচ……'

নন্দিতা আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে দিল। সুজিত বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবল, টাকার অনেক মহৎ-শক্তি আছে। সে মানুষকে অনেক দেয়, দিতে পারে—শুধু এক বিন্দু শান্তি ছাড়া। অথচ এখন ওই এক বিন্দু শান্তির জন্যই তার বুক শুকিয়ে উঠছে—এই সরল সত্যটা কৃষ্ণা এবং নন্দিতা কেউ বুঝল না, কাউকে বোঝাতে পারল না সুজিত।

সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়াল সুজিত। সিঁড়ির মাথায় আজ আলো নেই। এই অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে তাকে ওপরে উঠতে হবে। সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখতে গিয়ে তার মনে হল রোজকার চেনা সিঁড়িটা আজ যেন অন্ধকারে খাড়া হয়ে গেছে। এখন খাড়া সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে নিজের ঘরে তাকে যেতে হবে। তার শরীর ঘামতে লাগল। পা তুটো কাঁপছে। সে তু'হাতে শক্ত করে সিঁড়ির হাতল ধরে দাঁড়িয়ে ঘামতে ঘামতে ভাবল—সে ওপরে উঠতে পারবে কি ?

মাঝ রাত্তিরে দরোজার কড়া নাড়ল রতন। খুব আস্তে আস্তে দু'বার, তারপর চারপাশ দেখে নিয়ে একটু জোরে আর একবার। রতন জানতো, যত রাতই হোক, দুর্গা ঘুমোবে না, ঘুমোবার কথাও নয়। সন্ধ্যের অনেক আগেই দুর্গার কাছে খবর পৌঁছে গেছে। অতএব, সে নির্ঘাৎ জেগে থাকবে। তৃতীয়বার কড়া নেড়েই সে দরোজার ফাঁকে কান পাতল। ঘরের মধ্যে দুর্গার উঠে বসার শব্দ শোনা গেল।

বাইরে তখন মাঝ রাতের ঘন অন্ধকার। দূরে শ্যাওড়াগাছের মাথায় হাওয়া আর তাতেই একটা ভৌতিক শব্দ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে এখন আর চোখ বেশিদূরে চলেনা, অন্ধকারে হারিয়ে গিয়ে ভোঁতা হয়ে যায়।

দরজা খুলতে গিয়ে দুর্গা একটু থমকালো। দরোজার গায়ে মুখ রেখে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে।'

বাইরে থেকে একইভাবে উত্তর দিল রতন, 'আমি, রতন।'

দরোজার ডালাটা চটপট নিঃশব্দে খুলে দিতেই রতন এক লাফে ঘরের মধ্যে চলে এসে নিজেই দরোজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ডালাটা তুলে দিল।

নিজের স্বামীকে দুর্গা দেখছিল এমনভাবে, যেন অচেনা অতিথি। তার চোখে ভয় এবং বিস্ময় সমানগতিতে বাড়ছিল। রতন বৌয়ের দিকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'অমন করে দেখছিস কি? এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। যা নেবার নিয়ে নে।'

দুর্গা রতনের মুখের ওপর চোখ রেখে বলল, 'এখনই? এত রাতে!'

দুর্গাকে কথা শেষ করতে দিল না রতন। তার ভেতরে

একটা প্রবল ব্যস্ততা তাকে উত্তেজিত করে রেখেছে। সে চাপা গলায় বলল, 'রাতেইতো বেরুতে হবে। ভোর রাত্রের ট্রেনে কেটে পড়তে হবে। আলো ফুটলে যাবি কেমন করে।'

কাপড়ের পুঁটলী বাঁধাই ছিল। মেঝের ওপর সেটা তুলে নিতে নিতে দুর্গা বলল, 'আমার বড্ড ভয় করছে।'

ঘরের কোনে মাটির কলসী ছিল। গেলাসে জল গড়িয়ে নিতে নিতে রতন বলল, 'রাতে-রাতেই গাঁ ছাড়তে না পারলে ভয়টা আরও বেশি। শালা পঞ্চায়েত সূয্যি ওঠার আগেই পুলিশ নিয়ে আসবে।'

পুঁটলীটা বুকের কাছে তুলে আনতে গিয়ে দুর্গা থমকালো। গোটা ঘরের দিকে তাকাতে গিয়ে তার কান্না পাচ্ছিল। মাটির দেওয়ালে সেই কবে বিয়ের সময় গোবর আর কড়ি দিয়ে ছাপ দেওয়া হয়েছিল দেড়বছরেও তার দাগটা শুকোয়নি। দুর্গার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। দেড়বছর আগে পলাশডাঙ্গা থেকে বৌ হয়ে এবাড়িতে ঢুকেছিল, আর আজ মাঝরাতে চোরের মতো নিঃশব্দে সেই ঘর ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে দেশান্তরী হতে হচ্ছে দুর্গাকে। এই ঘরের মধ্যে অনেক দুঃখ আর অনাহার ছিল, তবুও এই ঘরই তো কখনও কখনও স্বর্গ মনে হতো। দেড়বছরের স্মৃতিওতো কম নয়। এত চট করে সেই সুখ আর দুঃখের ঘরটা ছেড়ে চলে যাওয়া তো বড় কম নয়।

দুর্গাকে থামতে দেখে রতন তাড়া দিল, 'চল, আর দেরী করিস না।'

কথা শেষ করেই রতন দুর্গার হাত ধরে টান দিল। দুর্গার মনে পড়ল তার মায়ের কথা। মা বলত, স্বামীর সঙ্গে মেয়েরা নরকেও যেতে পারে, যমের মুখেও যেতে পারে। কিন্তু মাটির ঘরের এই আশ্রয় ছেড়ে মধ্যরাতের অন্ধকারে সে যে কোথায় যাচ্ছে সেটাই তো দুর্গা ভাল করে জানেনা। এখানে থাকলে স্বামীর বিপদ হবে এই ভেবেই তাকে চলে যেতে হচ্ছে। কিন্তু স্বামী তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সে কথা বলেনি। রতন যখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দরোজায় তালা লাগাচ্ছিল, তখন অন্ধকারেই পুঁটলীর ওপর মুখ চেপে

দুর্গা কেঁদে উঠল।

কাঁচা রাস্তা ছেড়ে ওরা যখন বেলতলার মাঠে নেমে এল তখন অন্ধকার অনেকটা সয়ে এসেছে। আকাশে অনেক তারা, একফালি চাঁদ মাঝ আকাশ পেরিয়ে গেছে। মাঠের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মাঝরাতের শুকনো বাতাস। এতরাতে, তবুও বাতাসে এতটুকু কোমলভাব নেই। রতন পেছন ফিরে দুর্গার কোল থেকে পুঁটলীটা নিয়ে বলল, 'ওটা আমায় দে, তোর চলতে কষ্ট হচ্ছে।'

কষ্ট হচ্ছিল রতনেরও। ফসলের মাঠ জলের অভাবে ফুটিফাটা হয়ে আছে। আশপাশের নদী নালা শুকিয়ে খাঁ খাঁ করছে। গোটা কদমগড় জুড়ে দৈত্যের মতো দাপাদাপি করছে রাক্ষুসে খরা। সতীদের ইঁদারার জল শুকিয়ে গেছে মাসখানেক আগে। গেল হপ্তায় ঝাঁক বেঁধে শকুন নেমেছে পল্লীর বিলের ধারে। সেই বিল এখন শুকনো মাঠ। ওখানে যে কখনও জল ছিল সেটা আজ আর বোঝবার উপায় নেই। এমন সব্বোনেশে খরা গাঁয়ে এর আগে নাকি কেউ দেখেনি। চারকুড়ি বয়স হল মাধব মণ্ডলের। বটফল গাছের ছায়ায় বসে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা নাড়তে নাড়তে সে বলে, 'বুঝলিরে রতন, প্রাপে পাপে বসুন্ধরা পূর্ণ না হলে এমন খরা হয়না। মাটির রস শুকিয়ে ফসলের মাঠ এখন বাঁজা। পুব পাড়ায় মড়ক লেগেছে। ভেদবমিতে হপ্তায় একটা দুটো করে চলে যাচ্ছে। সবাই যাবে আগু-পিছু, কেউ থাকবে না।'

রতন খুব মন দিয়ে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করে না। সে জানে এর মধ্যে কোন নতুন কথা নেই। বছর চার আগে তার বাপও ভেদবমিতে ভুগে স্বগে গেছে। মা গেছে তারও আগে। তাকে ভেদবমিতে ভুগতে হয়নি। নিমুনে হয়ে এগার দিন বিছানায় থেকে তবে মরেছে। বাবার কথাটা বরং বেশি মনে আছে রতনের। লোকেরা বলল, হাকিমগঞ্জে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যা, তোর বাপ বেঁচে যাবে। সেখানে কলকাতার পাশ করা ডাক্তাররা রয়েছে, মরা মানুষ বাঁচিয়ে দিতে পারে। লোকের কথা বিশ্বাস করেছিল রতন। কিন্তু

কদমগড় থেকে হাকিমগঞ্জের স্বাস্থ্যকেন্দ্র চারক্রোশ দূর। অতদূরে এমন কাহিল বাপটারে নিয়ে যাবে কেমন করে? অনেক ছোটাছুটি করে হোসেন চাচার গরুর গাড়িটা পাওয়া গিয়েছিল। লোকটার দিল ছিল। বলল, 'কুছ পরোয়া নেই। আমি গাড়ি আনছি। চল আমি নিয়ে যাব তোর বাপকে।'

হোসেন চাচার চেষ্টার খামতি ছিলনা, তবু শেষ রক্ষা হলনা। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমেই ডাক্তারের খোঁজে গেল রতন। তখন সন্ধ্যে হব-হব করছে। গাছগাছালীর মাথার দিকে অন্ধকার। অন্ধকার জঙ্গলে ছড়ানো-ছেটানো কয়েকটা জোনাকীর আলো। ডাক্তারকে পেলনা রতন। সে তখন বাড়িতে। অগত্যা বাড়িতে দৌড়তে হল। রতনের কান্নাকাটিতে বিরক্ত ডাক্তারবাবু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এলেন আধঘণ্টা বাদে। হোসেন চাচা আব রতন তুজনে ধরে গরুর গাড়ি থেকে যখন রোগীকে ডাক্তারেব সামনে এনে শোয়ালো তখনই চোখ কুঁচকে উঠল ডাক্তারের। গম্ভীর মুখে নাড়ি দেখলেন. বাপের ঘুমন্ত চোখের পাতা আঙুল দিয়ে টেনে ফাঁক করে চোখের দিকে তাকিযে বললেন, 'এ কাকে এনেছেন? এর আব কোন চিকিৎসা হবে না—মারা গেছে।'

কথা শেষ করেই ডাক্তার তার ঘরে চলে গেলেন। শোকে, তুঃখে, খানিকক্ষণ পাথরের মতো স্থির থেকে রতন সহসা হাউ হাউ করে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল ডাক্তারের দরজায়।

'ও ডাক্তারবাবু, আপনি আমার বাপেরে বাঁচিয়ে দ্যান, আমার আর কেউ নাই, আপনার পায়ে পড়ি, বাপরে বাঁচায়ে দ্যান।'

রতনের কান্না শোনার সময় ডাক্তারের ছিলনা। দরোজার ওপর লুটিয়ে পড়া রতনকে পাশ কাটিয়ে সে চলে গেল রোগীদের ঘরে। কিন্তু ব্যাপারটার এখানেই শেষ নয়। কান্না থামার পর রতন যখন তার বাবার পায়ের কাছে এসে বসল, দূরের অন্ধকার আর চৈত্রের দামাল হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দের মধ্যে দিয়ে বাবার

স্মৃতিগুলো তখন তার মনের মধ্যে অবিরত আসা যাওয়া করছে, একটা দুরন্ত কষ্ট ঠেলে উঠতে চাইছে গলা দিয়ে। তখনই হোসেন চাচা ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরে এসে বলল, 'রতন তোর বাপরে তো এরা নিয়ে যেতে দেবেনা, বলছে, তোর বাপেরে মরাকাটা ঘরে পাঠাতি হবে, জানতি হবে ক্যামনে মরণ হল। ওখান থেকে ছাড়া পেলে তবে তুই পোড়াতে পারবি।'

হোঁচট খেয়ে রতনের পিঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল দুর্গা। রতনের ভাবনাটা থেমে গেল। বাঁ হাতে দুর্গাকে ধরে বলল, ভাগ্যিস, মাটিতে পড়ে যাসনি।'

দুর্গা রতনের কাঁধে ভর দিয়ে একটা পা তুলে একবার হাত বুলিয়ে অন্ধকারেই পরখ করে দেখল চোট লেগেছে কিনা। তারপর পা নামিয়ে বলল, 'পড়ে যাচ্ছিলাম বলেই তো ধরে ফেললাম। এখন পড়ে গিয়ে পেটে চোট লাগলে সর্বনাশ হয়।'

রতন নিজের ভাবনায় ডুবেছিল। দুর্গার কথাটা ধরতে পারেনি বলে বলল, 'সর্বনাশ হয় কেন?'

দুর্গা চলতে চলতে রতনের হাতে চিমটি কেটে বলল, 'তুই যেন ন্যাকা। তোরই জিনিসতো পেটে বয়ে বেড়াচ্ছি। পড়ে গেলে ক্ষতি হবে না।'

রতন দুর্গার হাতটা শক্ত করে ধরে আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ ছাওয়া অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছে। মাঠের ওপরে ইস্টিশনের আলোগুলো বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে এখান থেকে। দিনের বেলা এখান থেকেও ইস্টিশনের ওপরের সবুজ পাহাড়গুলো নজরে আসে। এখন অন্ধকারে সেগুলো দেখা যাচ্ছেনা।

দুর্গার হাতটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে চলতে চলতে রতনের অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। পলাশডাঙা থেকে কদমগড়ে আসতে হলেও একটা ছোট মাঠ পেরোতে হবে। বর্ষার সময় জলে -কাদায় মাখামাখি হয়ে থাকে। হোসেন চাচার গরুর গাড়ি পড়বি তো পড় পড়ল সেই কাদার গাড্ডাতেই। গাড়ির ভেতরে বর-বৌ

সেজে রতন আর দুর্গা বসে। ওদিকে গাড়ির চাকা গেল কাঁদায় গেঁথে। হোসেন চাচা গরুকে যত মারে, গাড়ির চাকা যেন তত গেঁথে যেতে থাকে কাদার মধ্যে। অবশেষে কাপড় গুটিয়ে জুতো নতুন বৌয়ের কাছে জমা রেখে রতনকে নামতে হল। একা হোসেন চাচা পারবে কেন। কাদায় নেমে যত গাড়ি ঠেলে ওপরে বসে নতুন বৌ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে তত হাসে। অবশেষে গাড়ির চাকা উঠল, কিন্তু রতনের আর গাড়িতে ওঠা হলনা। হাঁটু অবধি কাদায় দুটো পা একেবারে থিকথিকে। এ অবস্থায় নতুন বৌয়ের পাশে বসবে কেমন করে। অগত্যা হেঁটে আসতে হল গ্রামের মুখ পর্যন্ত। গাঁয়ে ঢুকতেই মতিদের বাড়ি। ওদের ইদারার জল তুলে পা ধুয়ে তবে উঠতে হল গাড়িতে।

রাতে বিছানায় শুতে এসে দেখল দুর্গা তখনও হাসছে। রতন ভেতরে ভেতরে লজ্জা পেলেও মুখে সেভাব দেখাল না। বলল, 'ফুলশয্যের দিন অমন হাসছিস কেন?'

হাঁটুর ওপর নাক ঘষতে ঘষতে দুর্গা বলল, 'তোমার পা দুখানার দিকে তাকালেই হাসি পেয়ে যায়।'

রতনের মনে পড়ে যাচ্ছে সেই রাতের কথা। খোঁপায় জরির ফিতে, লালটুকটুকে শাড়ি, কানে রূপোর ঝুমকো দুল, আর হাতে গিল্টিকরা চুড়ি। হাত নড়লেই যা ঝমঝম করে বাজে। দুর্গার চোখে মোটা করে কাজলটানা। পায়ে বোধহয় রূপোর নূপুর। রতন খপ করে নূপুর শুদ্ধ্ দুর্গার পা চেপে ধরে। দুর্গা জিভ কেটে পা সরিয়ে নিতে নিতে বলে, 'এমা, সোয়ামী হয়ে বৌয়ের পায়ে হাত দিলে। আমার পাপ হবে না।'

দুর্গা মুখ ফেরাতেই রতন দেখল ওর নাকেও একটা বাহারী নাকছবি। ঠোঁটের ফাঁকে সাদা দাঁত। রতন টের পেল তার শরীরের মধ্যে একটা দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস ভারী এবং দ্রুত হচ্ছে। দুর্গা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দ হাসল। নাকটা বার দুই ফুলে উঠল।

দুর্গার হাতের ওপর জোরে চাপ পড়তেই সে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'আঃ লাগে না বুঝি।'

রতন হাতটা ছেড়ে দিয়ে আবার আলতো করে ধরল। বলল. 'এবার একটু পা চালিয়ে চল। ওই তো ইস্টিশনের আলো।'

দুর্গা ক্লান্ত গলায় বলল, 'এই ভারী পেট নিয়ে চলতে কষ্ট হয় না বুঝি। তোমার সঙ্গে হেঁটে কি আমি পারি।'

দুর্গার ক্লান্ত গলার স্বরে বুঝি আকুতি ছিল। রতনের মন বিষণ্ণ হয়ে গেল। বলল, 'আমি তো বুঝি, কিন্তু তোর আর তোর পেটের ভেতরে যে আছে তার জন্যেই তো আজ পালাতে হচ্ছে। এ গাঁয়ের মুখে আমি পেচ্ছাপ করি। রিলিফের মুখে সাতবার লাথি মারি। কলকাতায় গিয়ে চটকলে কাজ পেলে দেখবি, তোর আর কোন কষ্ট থাকবে না।'

রতনের কথা শেষ হবার আগেই দূরের রেলস্টেশন থেকে মালগাড়ির তীব্র হুইসিল বেজে উঠল। তারপর একটানা গাড়ি চলার একটা শব্দহীন আওয়াজ। রতন দুর্গার হাত ধরে একটু টান দিল। বলল, 'আয়, আর একটু খানি পা চালিয়ে আয়।'

অন্ধকার মাঠ পেরিয়ে ষ্টেশনের পাথর বসানো রাস্তায় নেমে গেল রতন আর দুর্গা। আকাশের গায়ে তখন শেষরাতের অবসন্নতা। এলোমেলো বাতাসে একটা পোড়া পোড়া গন্ধ। ওরা পেছন ফিরে দেখল ওদের গ্রাম, ওদের বাড়ি, ওদের ফেলে আসা সব চিহ্ন অন্ধকারে মিশে গেছে। রতন আস্তে আস্তে ষ্টেশনের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বলল. 'চল, পেছনে তাকিয়ে লাভ নেই।'

কথাটা বলল বটে রতন, কিন্তু বুঝল শুধু চোখ ফিরিয়ে নিলেই সব স্মৃতি মুছে দেওয়া যায় না। মনের মধ্যেও একজোড়া চোখ থাকে, তাকে ফেরাবে কেমন করে। সে কারও ইচ্ছের চাকর নয়। তার দৃষ্টি সব উসকে দেয়, টাল-মাটাল করে তোলে সবটাকে। শেষরাতের ফিকে অন্ধকার গ্রামের ছবিটাকে যতই আবছা করে রাখুক, মনের ভেতরটাতো দিব্যি আলো করে রেখেছে সেই অদৃশ্য

চোখজোড়া। যেন চৌকিদারের হাতের টর্চের মতো সেই চোখ ক্রমাগত আলো ফেলে যাচ্ছে অন্ধকারে বন্ধ দরজাগুলোর ওপর।

বাপকে হারিয়ে বেজায় ভেঙ্গে পড়েছিল রতন। ঘর-গেরস্থালী কিছুই ভাল লাগছিল না তার। ঘরেরও কোন ছিরিছাঁদ নেই। ভুবনের মা বলতো, ঘরে মেয়েমানুষ না থাকলে সে ঘরে অলক্ষীর বাস হয়। তা রতন তো এখন দিব্যি জোয়ান, বিয়ে-থা করলেই পারে, সংসারের হাল ফেরে।

বিয়ে করলেই সংসারের হল ফিরে যাবে এমন কথা মানতে রতন রাজি নয়। সে জানে হাল ফেরাতে হলে টাকার দরকার। মধু গোঁসাইদের জমিতে লাঙ্গল চালিয়ে দু'বেলা ভাতই জোটেনা, তা টাকা আসবে কোত্থেকে। গোঁসাইঠাকুর এমনিতে বেজায় ভালো। দিনরাত ঠাকুরের নাম করছে। বাড়ির উঠোনে অষ্টধাতুর যুগলমূর্তি, সেই রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে মালা জপছে, কীর্তনের দল এনে গান গাওয়াচ্ছে, অথচ হাতের আঙুল দিয়ে একটা পয়সাও গলে না। পাত পেতে মাসে একবার পাড়াশুদ্ধু লোককে খিচুরী গেলাবে অথচ হাত পেতে চাইলে দু'সের চাল ধার দেবেনা। মধু গোঁসাইয়ের জমিতে এ গাঁয়ের অনেকেই লাঙ্গল মারে। রতন কিছুদিন লাঙ্গল চালিয়েছিল, কিন্তু সেখান থেকে ওকে সরিয়ে এনে বসিয়ে দিয়েছে পাটগুদামে। থাক থাক পাটের গাঁট বোঝাই হয়ে আছে গুদাম-ঘরে। সেগুলো ওজন করা, সাজিয়ে রাখা আর গরুর গাড়ি বোঝাই করে গঞ্জে চালান দেওয়াই রতনের কাজ। দিনগুলো নেহাৎ খারাপ কাটছিল না। নিজের বলতে রতনের কেউ ছিলনা, দুপুরে গোঁসাই-বাড়িতে প্রসাদ পেত আর রাত্রে ভুবনের মা রেঁধে দিত রতনকে। হপ্তা পেলে যখন যেমন হতো টাকা দিয়ে দিত বড়মাসীর হাতে। ভুবনের মাকে বড়মাসী বলত রতন। রাত্রে খেতে বসত ভুবন আর রতন একসঙ্গে। বড়মাসী বলত, 'তা, ওরে রতন, গোঁসাইবাড়ির পেসাদ খেয়ে আর কদ্দিন কাটাবি। একটা মেয়ে দেখে দিচ্ছি বিয়ে কর। সংসার করতে হবেতো, বংশ রক্ষে না করলে চলবে কেন?'

বংশ রক্ষেটা খুব জরুরী কিনা সেটা অবশ্য রতন বোঝেনা। সে জানে খেয়ে না খেয়ে যেমন করে দিন কাটছে তেমন করেই দিন কেটেছিল তার বাপের। একদিন ভেদবমিতে ভুগে রতনও তার বাবার মতো নেতিয়ে যাবে, তার ছেলে তাকে নিয়ে যাবে হাকিমগঞ্জের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। নিভু নিভু দিনের আলোয় তার দেহটা নামানো হবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বারান্দায়। ডাক্তার দেখে রায় দেবেন, মারা গেছে। মরে যাওয়াটা কোন ঘটনা নয়, কেমন করে মরল সেইটাই বড্ড জরুরী। তাই রতনের শরীরটা যাবে সরকারেব মরাকাটা ঘরে। ডাক্তাররা কেটে, চিরে দেখবে, লোকটা কেমন করে মবল। এইভাবেই বংশ লোপাট হবে এক এক করে। কিন্তু ভুবন আর বড়মাসী যেন নাছোড়বান্দা। অবশেষে একদিন কথাটা বলে ফেলল গোঁসাইজীকে।

মন্দিবে আরতি শেষ হতেই গোঁসাইজী নাম জপতে অন্দরে যাচ্ছিলেন সিঁড়ির পাশে রতন দাঁড়িয়েছিল। রতনকে দেখে বললেন, 'কীরে, কিছু বলবি মনে হচ্ছে ?'

রতন মুখটা নিচু করল। পায়ের আঙ্গুল দিয়ে উঠোনের মাটি খুঁটতে খুঁটতে বলল, 'আমার বে' ঠিক হয়েছে, আমি বে' করব।'

গোঁসাইজী যেন আহ্লাদে আটখানা। সিঁড়ি থেকে নেমে বললেন, সেকিরে এতো দারুণ খবর রে। তা করে বে' ?'

রতন মুখ নিচু করেই উত্তর দিল, 'আসছে মাসের দশ তারিখে।'

পানের পিকটা উঠোনের কোণে ফেলতে ফেলতে বললেন, 'মেয়ে কোন গাঁয়ের ? কাদের ঘরের ?'

রতন বলল, 'পলাশডাঙ্গার বনমালী নস্করের ভাইঝি।'

গোঁসাইজী বললেন, 'ভাইঝিই হবে। কারণ, বনমালীর নিজের কোন মেয়ে নেই। মেয়েটার বাপ মরেছে সাপের ছোবলে। সন্ধ্যেরাত্তিতে গেড়িভাঙ্গা কেউটে কেটেছিল মাঠের মধ্যে। এক ছোবলেই গোটা শরীর বিষিয়ে গেল। তা যাহোক, বিয়ে করছ

সেতো খুব ভাল। করে ফেল।'

কথা শেষ করে গোঁসাইজী বারান্দায় উঠছিলেন। রতন পেছন পেছন এল। বারান্দায় এসে বলল, 'একটা নিবেদন ছিল বাবু।'

গোঁসাইজী প্রসন্ন চোখে রতনের দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন, 'বল, বলে ফ্যাল।'

রতন একবার চোরা চোখে গোঁসাইজীর মুখ দেখে নিয়ে বলল, 'আমার মা'র একজোড়া কানপাশা বাবা আপনার কাছে বন্ধক রেখেছিল। মা'র ইচ্ছে ছিল ওটা আমার বৌকে দেবে। তা ওটা যদি আমারে ফিরায়ে ছ্যান তাহলে...।'

গোঁসাইজীর মুখ আরও প্রসন্ন হল! বললেন, 'মানুষের ইচ্ছেটাই সব নয়রে পাগলা, রাধাগোবিন্দের যা ইচ্ছা তাই হবে। ওটা তোর বাপ বহুকাল আগে বিক্রি করে টাকা নিয়ে গেছে। ও জিনিস কি আর আছে আমার কাছে।'

গোঁসাইজী আর দাঁড়ালেন না। ঠাকুরের নাম করতে করতে ভেতরে চলে গেলেন। রতন জানত এই রকমই হবে। বাবা টাকা নিয়ে বিক্রি করেছিল কিনা সে কথা আজ আর জানবার উপায় নেই। অথচ গোঁসাইজীকে মিথ্যেবাদী বলবার সাহস এ গাঁয়ের কারো নেই। রতন বুকের মধ্যে থমথমে আক্রোশ নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। ভুবনের মা সব শুনে বলল, 'আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি ও জিনিস তোর বাবা বিক্রি করেনি। কুড়িটা টাকার জন্যে বন্ধক দিয়েছিল। তাও গোঁসাইজী কুড়ি টাকা দেয়নি, পনেরো টাকা দিয়েছিল মাত্র।'

কিন্তু কানপাশার জন্যে রতনের বিয়ে আটকে থাকেনি। পলাশ-ডাঙ্গার দুর্গা রতনের ঘরে এল। সংসারের অনেক জ্বালা সেটা বিয়ের পর আস্তে আস্তে বুঝতে শিখল রতন। এতদিন নিজের একটা পেট দিব্যি চলে যাচ্ছিল, এখন দুটো পেটের ঝক্কি সে সামলায় কেমন করে। গোঁসাইবাড়িতে আর দুপুরে খায় না রতন, কিন্তু তাই বলে মাইনে বাড়েনি। বিয়ের সময় কদমগড় জলে ডুবুডুবু। তার পরের

বছরেই জলের আকাল দেখা দিল। ডোঙ্গা করে জল সেঁচে সেঁচে মাঠ ভিজোতে হয়। ইঁদারার জল তিলতিল করে নেমে গেল নিচের দিকে। সবাই বলে কদমগড়ে খরা আসছে। দুর্গা বড় বড় চোখে রতনকে শুধোয়, 'হ্যাঁগো গাঁয়ে নাকি খরা আসছে?'

জল দেওয়া ভাতের জলটুকু চুমুক দিয়ে খেতে খেতে রতন বলে, 'হুঁ।'

মুখের কাছ থেকে থালা নামিয়ে রতন বলে, 'তোরে কে খবর দিল?'

দুর্গা মাটির ওপর থেকে ভাতের দানা খুঁটে খুঁটে থালার ওপর ফেলল, মুখ নিচু করেই জবাব দিল, 'সবাই বলছে।'

রতন চোয়াল শক্ত করে বলল, 'সব শালাই বলে খরা আসছে, খরা আসছে, অথচ ঠ্যাকাবার মুরোদ নেই কারো'।

গোটা বছরটা চলে গেল আগুন ছড়িয়ে। দু'চারদিন কয়েক ফোঁটা জল আকাশ ঝরলো, মাটিতে পড়বার আগেই তা যেন মিলিয়ে যায়। কিন্তু এই বছরটা এল আরও ভয়ঙ্কর হয়ে। গত বছরের শুকনো মাটি ফেটে হাঁ হয়ে গেল। গোটা গা জুড়ে দীর্ঘশ্বাসের মতো বয়ে যেতে লাগল গরম বাতাস। গাছের পাতা পুড়িয়ে দিল আকাশের আক্রোশ। বটফল গাছের ছায়ায় বসে হাঁটুর মধ্যে মাথা নাড়ে মাধব মণ্ডল আর বলে, পাপে বসুন্ধরা পূর্ণ হয়ে গেছে। সব জ্বলে-পুড়ে যাবে।

যাচ্ছিলও তাই। তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল পেটের আগুন। ওখানেও যেন ভয়ঙ্কর খরা। গোঁসাইজীর গুদামে পাটের সঙ্গে সঙ্গে ধানের বস্তা লুকিয়ে রাখে রতন। কিন্তু হাত পেতে চাইলে এক মুঠো চাল দিতে চায়না। গোঁসাইজী বলেন, 'সময় এলে তোকে আমিই দেখব রতন। এখন তুই আমারে ছ্যাখ।'

ঠিক একরম সময়েই ঘটনাটা ঘটে গেল। দুর্গার পেটে সন্তান এল। খিদে বাড়তে লাগল। খাবার যত কমে দুর্গার খিদে তত

বাড়ে। বড়মাসী রতনকে বোঝায়, 'এখন অত রাগ করিসনে রতন, পোয়াতী মেয়েদের খিদে বেশি হয়। পেটের মধ্যে আরও একজন বাড়ছে যে।'

রতন বোঝে, সে জানে, খেতে না পারলে পেটের ছেলে শুকিয়ে যাবে পেটের মধ্যেই। বৌ-বাচ্চা দুটোই যাবে যমের দরজায়। কিন্তু খাবার কোথায়? রোজ-রোজ হাঁড়ি চড়বে কেমন করে। দু'বেলা ভাত না পেয়ে দুর্গা যখন কাহিল, রতনের মাথার মধ্যে তখন আগুন জ্বলে উঠল। তার বুকের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল সেই পুরনো প্রশ্নটাই, বন্যায়, খরায় কিংবা আকাশে বছর বছর শুধু আমরাই কেন মরব। শুধু আমাদের বৌদের পেটের সন্তান কেন শুকিয়ে মরবে?'

ক্রোধে অন্ধ হয়ে রতন এল গোঁসাইজীর বাড়িতে। মন্দিরে পূজো সবে শেষ হয়েছে। গোঁসাই দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে পূজারীর সঙ্গে কথা বলছেন। রতন মন্দিরের দিকে তাকাল। দরজাটা ভেজানো। কিন্তু সামনে থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে অষ্টধাতুর বিগ্রহকে। সোনায় মোড়া উজ্জ্বল রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি। সামনে মিহিচালের ভাতের থালা চূড়ার মতো করে সাজানো। তার চারপাশে নানা রকমের ব্যবস্থা। রতন যখন আগে দুপুরে এবাড়িতে প্রসাদ পেত তখন এই গোবিন্দভোগ চাল তার পাতে পড়েনি কখনও। তার জন্যে বরাদ্দ ছিল কলাইয়ের ডাল আর মোটা দানার ভাত। অষ্টধাতুর বিগ্রহ খাক বা না খাক, এই ভোগ চেটেপুটে গেলেন গোঁসাইজীরা। রতন সিঁড়ি ভেঙ্গে মন্দিরের দরজার সামনে এল। দরজার চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে গিয়েই তার সব গোলমাল হয়ে গেল। মনের মধ্যে কোন ভক্তির বন্যা এলনা, ভোগের সুগন্ধটা ঝট করে নাকে এসে লাগতেই পেটের ভেতরে খিদে নামক জন্তুটা হামলে উঠল। সে এক ভয়ঙ্কর দাপট! রতন সহসা চোখ তুলে মন্দিরের মধ্যে তাকাল। দেয়ালে ননীচোর গোপালের বালক মূর্তি। মা যশোদার কোলে শিশু কৃষ্ণ।

রতনের মাথার মধ্যে রক্তের বিস্ফোরণ ঘটে যাচ্ছে! দুর্গার পেটে দানা নেই। পেটের ছেলে শুকিয়ে যাচ্ছে। যে গাঁয়ে মানুষের পেটে দানা জোটে না, সে গাঁয়ের বিগ্রহ কেন বসে বসে ভোগ খাবে? রতন বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল মন্দিরের মধ্যে। সামনেই ছিল চূড়ো করে সাজানো গোবিন্দভোগ চালের ভাতের থালা। রতন সেই থালা দুই হাতে তুলে ধরল বুকের কাছে, তারপর একলাফে উঠোনে পড়েই দৌড় লাগাল।

ঘটনাটা ঘটে গেল একমিনিটের মধ্যে। রতন মন্দিরে ঢুকে যেতেই গোঁসাইজী ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু এতটা যে ঘটবে সেটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। ভাতের থালা নিয়ে রতন ছুটছিল আহত জন্তুর মতো। তার পেছনে ধেয়ে আসছিল একটা কোলাহল। কিন্তু রতন সেদিকে গ্রাহ্য করছিল না—তার মন জুড়ে ভেসে উঠছিল গর্ভবতী এক মায়ের ক্লিষ্ট, ক্ষুধার্ত মুখ।

ভাতের থালা দুর্গার হাতে সঁপে দিয়ে রতন বলল, 'হাঁড়িতে ভাত ঢেলে থালা ফেরত দে। তাড়াতাড়ি।'

গোঁসাইজীর লোকেরা শূন্য থালা হাতে রতনকে টানতে টানতে এনে ফেলল মন্দিরের চাতালে। ফোঁটা-তিলক কাটা গোঁসাইজীকে এবার দেখা গেল অন্য চেহারায়। যে পাটের দড়ি বানাতে ওস্তাদ ছিল রতন, সেই দড়ি দিয়েই তাকে বাঁধা হল। পায়ের খড়ম খুলে গোঁসাইজী শুরু করলেন পয়লা, তারপর যে যেমন পারল মেরে চলল রতনকে। সদরের দরজায় দাঁড়িয়ে দুর্গা দেখল। ভুবনের মা দুর্গাকে ধরে রেখেছিল জোর করে।

প্রায় অচৈতন্য রতনকে ধরে আনল ভুবনরা। শুইয়ে দিল ঘরের বারান্দায়। কাজটা যে রতন ভাল করেনি সেটাও বলে গেল সবাই। এতবড় পাপ গাঁয়ের কেউ ক্ষমা করবে বলে মনে হয় না।

আস্তে আস্তে দিনের আলো মরল। গাছের পাতা থেকে দিনের আলো খসে গিয়ে অন্ধকার জমাট বাঁধল। বাঁশ ঝোপের ভেতর থেকে শেয়াল ডেকে উঠল। বারান্দায় শুয়ে অন্ধকার জঙ্গলে

জোনাকীর আলোর বিন্দুগুলো দেখতে দেখতে রতন ডাকল, 'দুর্গা—'

মাথার কাছেই হাঁটু মুড়ে দুর্গা বসেছিল। উত্তর দিল, 'এই তো আমি।'

রতন বলল, 'তুই দুপুরে খেয়েছিস ?'

দুর্গা ঘাড় নেড়ে জবাব দিল, 'কেমন করে খাব। তোমারে ওরা ধরে নিয়ে গেল, আর আমি বসে বসে খাব।'

কথাটা মনে মনে মানল রতন। উঠে বসতে বসতে বলল, 'এবার তো আমি ঘরে এয়েছি। এবার খা।'

দুর্গা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ওটা আমার খেতে ভয় করছে। তাব চেয়ে চল যাই ফেরত দিয়ে আসি।'

চোখ জ্বলে উঠল রতনেব। বলল, 'ফেরত দিলে কি আমার পিঠের দাগ ফেরত নেবে।'

দুর্গা বলল, 'তুমি এমনটা করলে কেন ? সবাই তো বলছে কাজটা ভাল কবোনি।'

উঠে বসেছিল রতন। এবার বাঁশের খুঁটির সঙ্গে হেলান দিয়ে শরীবটা এলিয়ে নিয়ে বলল, 'সবাই বলেছে বলেই অন্যায় হয়ে গেল তাই না ? যে গাঁয়েব মানুষেব পেটে দানা নেই, পোয়াতী বৌয়ের পেটের ছেলে শুকিয়ে মরে, সেই গাঁয়ে আমাদের মেহনত কবা ফসলের ভোগ বসে বসে দেবতা খাবে, এটা বুঝি খুব ন্যায়! খিদেব পেটে ভক্তি আসেনা—'

ভয় পেয়ে রতনের মুখে হাত চাপা দিল দুর্গা। বলল, 'অমন কথা বলতে নেই, পাপ হয়।'

রতনকে নিয়ে পঞ্চায়েতে বিচার বসল। পঞ্চায়েতের প্রধান মাথা গোঁসাইজী, তিনি চেয়ারে বসে আছেন। যাঁরা বিচার করবেন তাঁরা সবাই চেয়ারে। যাঁরা বিচার শুনবেন তাঁরা মাটিতে বসে বা দাঁড়িয়ে। রতন আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে। দুর্গাকে নিয়ে উঁচু টিলার ওপর বড়মাসীরা দাঁড়িয়ে আছে। রতন দেখল, যাঁরা বিচার করবেন তাঁদের কারো মুখেই খিদের কষ্ট নেই। অতএব, সে বুঝে

গেল তার বিচারটা কেমন হবে। বিগ্রহের প্রসাদ চুরির অভিযোগের সঙ্গে মন্দিরের রূপোর থালা চুরির চেষ্টাও জুড়ে দিয়েছে পূজারী। গোঁসাইজী নিজে কোন অভিযোগ আনেননি। অভিযোগ এনেছে পূজারী। পিছু পিছু লোক ছুটে না গেলে রূপোর থালাটা রতন নির্ঘাৎ চুরি করে ফেলত এই অভিযোগটা খ্যানখ্যানে গলায় জোরের সঙ্গে বলে গেল পূজারী ঠাকুর।

রতন ভেবেছিল ভুবন আর হোসেন চাচার কথা মতো সব দোষ স্বীকার করে নিয়ে পঞ্চায়েতের কাছে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তার মত বদলে গেল। পঞ্চায়েতের সামনে গলা উঁচু করে সে বলে ফেলল, 'পেটে খিদে নিয়ে গ্রামের মানুষ মুখ বুঁজে থাকতে পারে, কিন্তু আমি থাকবো না। খরায় যেখানে তেষ্টার জল মেলে না, সেখানে রাধাকৃষ্ণের ভোগের জন্য গোবিন্দভোগ দেওয়া পাপ। ঠাকুরের খাবার আমি কেড়ে খেয়েছি, খাইয়েছি আমার বৌকে। পঞ্চায়েতের মন্দিরের বিগ্রহ তো নালিশ করেনি, যার খাবার আমি খেয়েছি। নালিশ করছে পূজারী মশাই, যার কোন ক্ষতি আমি করিনি।'

কিন্তু এসব কথায় পঞ্চায়েত খুশী হয়না, বিচার থেমে থাকেনা। অতএব, পঞ্চায়েতের বিচারে রতনের সাজা হল। গোঁসাইজীর কাছ থেকে কাজ গেল, উল্টে একমাস বেগার খেটে দিতে হবে মন্দিরের জন্যে।

গণ্ডগোলের শুরু সেই থেকেই। রতন সাফ-সাফ জানিয়ে দিল, আমি খেটে দেব শুধু মন্দিরের জন্যে, গোঁসাইজীর কোন কাজ আমি করব না। কিন্তু মন্দিরের কাজ মানেই তো গোঁসাইজীর কাজ। ঠুকঠাক গণ্ডগোল লেগেই রইল। ততক্ষণে গোটা গাঁয়ের ওপর প্রবল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে খরা। গ্রাম-গঞ্জ পুড়ে ছারখার। গ্রামের মানুষ পালাচ্ছে গ্রাম ছেড়ে। যতদূর চোখ যায় কোথাও জলের দিশা দেখতে পায় না রতন। আকাশ যেন উপুড় করে আগুন ঢালছে কদমগড়ের ওপর। কেউ কেউ বোঝায়, গ্রাম ছেড়ে যাবি কোথায়?

গিয়ে করবি কি? এখানে থাকলে তবুও দু'একটা দানা পাবি। শহর থেকে রিলিফ আসছে।

রিলিফের আশায় আশায় দিন গোনে রতনও। দেখতে দেখতে সাতটা দিন কেটে গেল। খিদের শরীর কুঁকড়ে যেতে থাকে দুর্গার। রতন বৌয়ের উপোসী পেটে হাত বুলোয় আর বলে, সবুর কররে, সবুর কর, রিলিফ আসছে, শহর থেকে রিলিফ এলে দুঃখ ঘুচবে!'

অবশেষে সেই রিলিফ এল। গোটা গাঁয়ে যেন উৎসব লেগে গেল। সকাল বেলাতেই খবরটা দিল ভুবন। দুর্গাকে বলেই রতন দৌড় লাগাল। দক্ষিণপাড়ার লোকদের রিলিফ দেবে গৌসাইজীর অফিসবাড়ি থেকে। রতন পৌঁছে দেখল বিস্তর লোক লাইনে দাঁড়িয়ে গেছে। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই মাধব মণ্ডলের, তবু লাইনে বসে ধুকছে। ছেলে কোলে বিস্তর বৌরা ঘোমটা টেনে রোদে দাঁড়িয়ে আছে। রতনও লাইনে দাঁড়াল। খানিকবাদে রতন যখন প্রায় অফিসবাড়ীর বারন্দার কাছে এসে গেছে তখন লাইন থেকে ওকে ডেকে নিল পঞ্চায়েতের একজন। বলল, 'তুই মিথ্যেই দাঁড়িয়ে আছিস। লিস্টি থেকে তোর নাম খুঁজে পাচ্ছিনা। তুই রিলিফ পাবিনা।'

'কেন?' যেন গর্জে উঠল রতন।

লোকটা বলল, 'তুই ভেতরে গিয়ে গৌসাইজীকে একটু বল, পায়ে-টায়ে ধরে ক্ষমা চা, তাহলেই পেয়ে যাবি।'

রতন আগুন চোখে লোকটার দিকে তাকাল। তারপর গর্জে উঠে বলল, 'রিলিফ দিচ্ছে সরকার, ওটা গৌসাইজীর বাবার সম্পত্তি নয়। গোটা গাঁয়ের লোক পাবে, আমি কি গাঁয়ের বাইরে?'

মালা জপতে জপতে গৌসাইজী অফিস-ঘর থেকে বেরুলেন। বললেন, 'এত গোল করছে কে? ও, তুই!'

রতন গোঁসাইজীর সামানে গিয়ে বলল, 'আমি কেন রিলিফ পাব না? রিলিফের মাল কি আপনার সম্পত্তি?'

গোঁসাইজী একটু অবাক চোখে দেখলেন। পরে বললেন,—

গায়ের লোকেরা পাবে, কিন্তু পঞ্চায়েত যাকে চোর বলে জানে তাকে রিলিফ দেওয়ার নিয়ম নেই। ঝামেলা না করে চলে যা।'

চলে যাবার জন্যে তো রতন আসেনি। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে সে দেখল, পরক্ষণেই চিৎকার করে বলে উঠল, 'তোর নিয়মের কাঁথায় আগুন। আমাকে রিলিফ দিতেই হবে।'

প্রচণ্ড গর্জন করে রতন ঝাঁপিয়ে পড়ল টেবিলের ওপর। কাগজ-পত্র কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল গোঁসাইজীর মুখের ওপর। তারপর চালের বস্তা থেকে কয়েক খাবলা চাল গামলাতে তুলেই ছুট লাগাল। পঞ্চায়েতে শাস্তি পাওয়ার পরও রতন যে এরকম একটা কাণ্ড করতে পারবে এটা কেউ ভাবতেই পারেনি। ঘটনা ঘটে যাবার পরও সবাই হতবাক হয়ে রইল খানিকক্ষণ। দু'একজন রতনের পিছু ধাওয়া করতে চেয়েছিল, গোঁসাইজী হাত তুলে নিষেধ করলেন। অফিস ঘরে এসে বললেন, 'এখুনি সাইকেলে করে থানায় যাও। গিয়ে বড়বাবুকে বল সরকারী রিলিফের মাল লুট হয়ে গেছে। লুটেরার নাম রতন দাস। গাঁয়ের যারা দেখেছে সবাই সাক্ষী দেবে।'

দরজার পাশে বাশবাগানের মধ্যে রতন লুকিয়েছিল। ভুবন জানতো রতনকে এখানেই পাওয়া যাবে। ভুবন এল হাঁফাতে হাঁফাতে। বলল, 'রতন সব্বোনাশ বাধিয়ে এসেছিস। থানা থেকে দারোগা বাবু এসেছে, তোর নাম লিখে নিয়েছে, কয়েকজন সাক্ষীও দিয়েছে তোর বিরুদ্ধে। তুই খামোখা কেন মাথা গরম করে রিলিফের চাল লুটতে গেলি।'

রতন শুকনো বাঁশপাতা আঙ্গুলে জড়াতে জড়াতে বলল, 'আর গোঁসাইজী যে রেতের বেলা বস্তা বস্তা রিলিফের মাল নিজের গুদামে তোলে সে ব্যালা পুলিশ আসে না কেন?'

ভুবন বলল, 'সে সব কথার জবাব আমি জানিনে। কিন্তু তোর এবার কী হবে? পুলিশ তোর বাড়ি ঘুরে বলে গেছে তোরে সকালে থানায় যেতে। না গেলে পুলিশ এসে বেঁধে নিয়ে যাবে। পুলিশে

ধরলে আঠারো ঘা। এবার তোর কী হবে তাই ভাব।'

রতনের যেন ভাবাই ছিল। সে চট করে জবাব দিল, 'আমার কথা আমি ভেবে নিয়েছি। এ গাঁয়ে থাকে কোন শালা। দুগগারে নিয়ে আমি শহরে চলে যাবো, চটকলে কাজ করবো। তুই দুগগারে চুপিচুপি বলে রাখিস ও যেন তৈরি থাকে। আমি রাতের বেলা যাবো।'

ট্রেনের জানালা দিয়ে মুখ বার করল রতন। রোদে পোড়া মাটি দ্রুত সরে যাচ্ছে ট্রেনের জানালা থেকে। বোধহয় অনেকটা পথ চলে এসেছে। যখন ট্রেনে ওঠে তখন ছিল অন্ধকার। এখন দু'পাশের মাঠের ওপর ঝকঝকে রোদ। দুর্গার দু'চোখে এখনও ভয় আর আশঙ্কা। সোয়ামীর হাত ধরে মাঝরাতে ভিটে ছেড়েছে, কিন্তু কোথায় চলছে সেটা সে জানে না। একবার ভেবেছিল পলাশডাঙ্গায় ফিরে যাবে। স্টেশনে এসে রতনকে বলেও ছিল, কিন্তু রাজী হয়নি। নিজের ভিটেতে না পেলে পুলিশ পলাশডাঙ্গায় একবার যাবেই। তার চেয়ে কলকাতা হাজার ভালো। ম্যালা লোক, তার মধ্যে কে যে কদমগড়ের রতন দাস সে খোঁজ পাওয়া দেবতাদেরও কম্ম নয়। ওখানে গঙ্গার পাড়ে নাকি হাজারো চটকল। গতরে খাটতে পারলে অনেক পয়সা কামানো যায়। কৈবর্তদের পাড়ার দুটো ছেলে চটকলে কাজ পেয়েছে। দিব্যি আছে। সুখে আছে। কোন সুখের আশায় পোড়া কদমগড়ে থাকবে। কী দিয়েছে কদমগড় তাকে?

ট্রেনটা আস্তে আস্তে মস্তবড় একটা স্টেশনে ঢুকে গেল। রতন দুর্গাকে ঠ্যালা দিয়ে বলল, 'ওঠ, এবার নামতি হবে, কলকাতা এসে গেছে।'

রতনের হাত ধরে দুর্গা স্টেশনের বাইরে এসে দেখল বড় রাস্তার ওপর বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে আছে। গান গেয়ে গেয়ে একদল ছেলেমেয়ে চলেছে কৌটো ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে। রতন দাঁড়িয়ে থাকল। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই বুঝল গাঁয়ে খরা হয়েছে বলে শহরের বাবুরা মিছিল করে চাঁদা তুলতে বেরিয়েছে। এই চাঁদার টাকায় চাল কেনা হবে,

যে চালের অর্ধেক যাবে গোঁসাইজীর গুদামে আর অর্ধেক পাবে গাঁয়ের লোক। রতন আর দুর্গার চোখের সামনে দিয়ে মিছিলটা চলে যাচ্ছে। রতনের ইচ্ছে হল একবার চেঁচিয়ে ব্যাপারটা বলে। কিন্তু সাহসে কুললো না।

দুর্গা বলল, 'এবার কোথায় যাবে ?'

রতন পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে বলল, 'কৈবর্ত পাড়ার রাখালের ঠিকানা এনেছি। প্রথমে রাখালের কাছে যাবো, তারপর দেখি কী হয়।'

ঠিকানা ধরে খুঁজতে গিয়ে রতন বুঝল এটা কদমগড় নয়। এখানে কেউ কাউকে চেনে না। তবুও জনে জনে জিজ্ঞেস করে দুপুর নাগাদ রতন খুঁজে পেল রাখালকে। বাজারের মতো একটা জায়গা। তারই একটা অন্ধকার গলির মধ্যে ছোট ছোট খান কয়েক ঘর। সেই ঘরেরই একটাতে থাকে রাখাল। রতনকে দেখে রাখাল অবাক। বলল, 'তুই এখানে কেন ?'

রতন বলল, 'তোমার কাছে এলাম। বলেছিলে না, কলকাতায় এলেই চটকলে চাকরা পাওয়া যায়। তাই চাকরী করতে এলাম।'

রাখাল মনে মনে ঢোক গিলল। গাঁয়ে গিয়ে এরকম কথা বলেছিল বটে, কিন্তু রতন যে সত্যি সত্যি বৌ নিয়ে চাকরীর আশায় চলে আসবে এমনটা সে ভাবে নি। তাছাড়া এখন তো চাকরীর কোন কথাই ওঠে না। তার নিজের কারখানাই বন্ধ হয়ে আছে দেড়মাস যাবৎ। রাখাল বলল, 'এমন হুট করে এলে কি চাকরী হয় !'

'কিন্তু আমি যে তোমার ভরসাতেই ভিটে ছেড়ে এলাম।' রতনের গলায় আকুল আবেদন।

রাখাল বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলল, 'দেখি কী করা যায়।'

তারপর একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'তোরা উঠেছিস কোথায় ?'

রতন বলল, 'এখানেই তো উঠলাম। এছাড়া আর জায়গা কোথায়।'

রাখাল মনে মনে চমকে উঠল। কিন্তু রতনকে কিছু বুঝতে দিলনা। বলল, 'তাহলে বোস। জিরিয়ে নে। পরে দেখা যাবে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল রতন। রতন দেখল এতক্ষণে দুর্গার মুখেও হাসি ফুটেছে।

কিন্তু সে হাসি মিলিয়ে গেল দুপুর গড়বার পরে পরেই। সনাতন রতনকে ছাদে ডেকে নিয়ে বলল, 'তুই হঠাৎ চলে এসে মুশকিল বাঁধালি। সঙ্গে দুর্গা না থাকলে গাদাগাদি করে না হয় দু-পাঁচটা দিন থেকে যেতে পারতি। আমরা চারজন এই ঘরে থাকি। এর মধ্যে দুর্গা থাকবে কোথায়?'

সমস্যাটা রতনকে ভাবিয়ে তুলল। অচেনা শহরে কোথায়ই বা যাবে। সনাতন ছাড়া কাউকে তো চেনেই না রতন। গলা শুকিয়ে আসছিল। ঢোক গিলে বলল, 'তোদের চটকলে যদি একটা কাজ জুটিয়ে দিস, তাহলে না হয়—

বিরক্ত মুখে সনাতন মাথা নাড়ল। বলল, 'তোর শালা মগজে গোবর। শুনলি না কারখানা দেড়মাস যাবৎ বন্ধ হয়ে আছে। কবে খুলবে কে জানে।'

রতনের বুকের মধ্যে অসহায়বোধটা গুড়গুড় করে উঠল। যেন আষাঢ়ের মেঘ ডাকছে! সে কেবল বলল, 'তাহলে?'

দেশলাই জ্বেলে বিড়ি ধরাতে ধরাতে সনাতন বলল, 'সেইজন্যেই তো বলছি, কালকেই ফিরে যা। এখানে কিছু হবে না, উল্টে বেঘোরে মারা পড়বি।'

ফিরে যাবার কথা রতন ভাবতেই পারে না। গোটা ব্যাপারটা সনাতন জানে না বলে অক্লেশে ফিরে যাবার পরামর্শ দিচ্ছে। রতন নিজের মাথার চুলে খাবলা দিয়ে বিলি কাটতে কাটতে বলল, 'আমার ফিরে যাবার পথ নেই। আমাকে এখানেই থাকতে হবে।'

সনাতন চোখ কুঁচকে তাকিয়েছিল রতনের দিকে। রতন ওকে গাঁয়ের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতেই সনাতনের কপালে চিন্তার রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল। পোড়া বিড়ি ঘষে ঘষে নেভাতে ব্যস্ত ছিল। সে

কাজটা শেষ করে বলল, 'আজকের রাতটা না হয় কোন রকমে বলে করে ব্যবস্থা করব, কিন্তু তারপর ?'

রতন বলে ফেলল, 'আমি কিছু ভাবতে পারছি না, তুই যা ভাল বুঝিস কর। দয়া করে আমায় বাঁচা, দুর্গার পেটের ছেলেটাকে বাঁচা।'

সনাতন উঠে দাঁড়িয়ে ছাদের ওপর খানিক পায়চারি করল। তারপর রতনের দিকে ফিরে বলল, 'যদি হিম্মৎ থাকে তাহলে এখানে বেঁচে থাকা যায়। কিন্তু হিম্মৎ না থাকলে মরতে হবে।'

সনাতন একথা দিয়ে যে ঠিক কী বোঝাতে চাইল সেটা রতন বুঝল না। সে বোকার মতো সনাতনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সন্ধ্যে গড়াবার অনেক পরে একে একে সনাতনের বন্ধুরা এল। সনাতন ওদের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা কইল ওরা ঘরের দিকে বার দুই তাকিয়ে ছাদে উঠে গেল। ঘরের মধ্যে দুর্গা আর রতন মুখোমুখি বসে ভাবতে লাগল, আজকের রাতটা নাহয় কাটল, কিন্তু কাল ? সনাতনের চটকল বন্ধ হয়ে গেছে, রোজগারের পথ বন্ধ, থাকবার জায়গার মেয়াদও মাত্র একরাত্রির। দুর্গা ভাবতে ভাবতেই এক সময় মেঝের ওপর শুয়ে পড়ল। ওর উঁচু পেটেব দিকে তাকিয়ে মাথার মধ্যে দুঃশ্চিন্তাব আগুন লকলক করে জ্বলতে থাকল। কদমগড়ের মাঠ-ঘাট, বাঁশ বাগান, পল্লীর বিল, মাঠের ওপর দিয়ে শোঁ শোঁ করে ছুটে আসা চৈত্রের দামাল হাওয়া, সব আস্তে আস্তে ভেসে উঠেছে চোখের ওপর। পোড়া গাঁটার জন্যে বড্ড মায়া জমে আছে বুকের মধ্যে। তবু ফেরার উপায় নেই। ফেরার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে গোঁসাইঠাকুর। তাঁর হাতের মালা যেন সাপের খোলস।

সনাতনের ডাকে ঘুম ভাঙল রতনের। দোকান থেকে গেলাসে করে চা আর পাঁউরুটি এনেছে। দুর্গার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'সকালে এই জোটাতে পারলাম, খেয়ে নাও।'

দুর্গার হাতে জিনিসগুলো দিয়ে সনাতন রতনের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'তোর থাকবার একটা ব্যবস্থা বোধহয় হয়ে যাবে। দুপুরবেলা আমার সঙ্গে যাবি।'

সনাতন আর তার বন্ধুদের চেষ্টায় থাকবার একটা ব্যবস্থা হল। খালের ধারে এক দঙ্গল খোলার ঘর। ঘরগুলো এত নিচু যে মাথা হেঁট করে ভেতরে ঢুকতে হয়। দিনেরবেলাও ঘরে সূর্যের কণা মাত্র আলো ঢোকেনা, লম্ফ জ্বালাতে হয়। ওই বস্তির মধ্যে দিয়েই চলে গেছে এক জোড়া রেল লাইন। লাইনের দু' পাড়ে গায়ে গায়ে লাগানো ঘর। একপাশে খাল অন্য পাড়ে কারখানার উঁচু পাঁচীল। ঘরের ভাড়া প্রতি মাসে পঁচিশ টাকা। ভাড়া শুনেই রতন চোখ কপালে তুলল। সনাতন হাত দিয়ে ওকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গি করে বলল, 'ভাড়া নিয়ে এখনই তোকে ভাবতে হবে না। পল্টুদা সব বলে রেখেছে। আসছে হপ্তায় পল্টুদা তোকে নিয়ে যাবে, মিলে বোতল ধোওয়ার কাজ। দু' টাকা চার আনা রোজ। মাইনে পেলে তবে ভাড়া দিবি।'

রতন মনে মনে হিসেব কষে ফেলল। শুকনো মুখে বলল, 'কিন্তু তাতে তো।'

সনাতন চোখ টিপে বলল, 'আগেই বলেছি, হিম্মৎ থাকলে এখানে টিকতে পারবি, না থাকলে ফুটে যাবি। এবার যা ভাল বুঝবি করবি।'

কদমগড় ছেড়ে এ এক নতুন রাজ্যে এসে পড়ল রতন। এই বস্তিতে রতনের বয়েসী অনেক ছেলে। ওরা কখন কাজ করে, কখন ঘুমোয়, কখন খায় সেটা রতন বুঝতে পারে না। কালো রঙের খাটো খাটো হাফ প্যান্ট পরে তার ওপর লুঙ্গি জড়িয়ে নিয়ে সারাদিন রেলপাড়ের বটতলায় বসে তাস খেলছে, আড্ডা দিচ্ছে, না হয় বটতলার চায়ের দোকানে গুলজার করছে। বস্তির কয়েকজন মেয়ে, বৌ আর বুড়ো বেতের ঝুড়ি বানায়, কেউ কেউ গাছের

বাকলের মতো এক রকমের কাঠ কিনে এনে বিক্রি করে। ওরা বলে কাঠ পাতা ওই কাঠ দিয়ে নাকি দই খাবার চামচে তৈরি হয়, আরো কিসব নাকি বানায়। এরা বানায় না শুধু বস্তা করে নিয়ে এসে মহাজনদের না হয় কারখানায় বিক্রি করে। কয়েকজন কাজ করে রতনদের কারখানায়। টিনের দোতলা ঘরের মধ্যে কারখানা। ওখানে ডাঁই করে রাখা আছে নানা মাপের শিশি বোতল। জলে ভিজিয়ে ওদের গা থেকে কাগজ খুলে নিয়ে ভাল করে সাফ-সুফো করে শুকিয়ে আবার সাজিয়ে রাখতে হয়। এই বোতল চলে যায় অন্য কারখানায়। সেখানে বোতলের গায়ে আবার রঙ বেরঙের কাগজ লাগানো হবে। বেঁচে থাকবার জন্যে কত রকমের কাজ জুটিয়ে নিচ্ছে কলকাতার লোকেরা। কদমগড়ে যেমন কয়েকজন বড়লোক আর সবাই গরীব, এই শহরেও তেমন ব্যাপার। এখানেও কিছু লোক ধনী, আর বেশির ভাগ লোক গরীব। পৃথিবী জুড়ে গরীবদের দলটাই কেবল বাড়ছে। বস্তির লোকগুলোকে রতন বুঝতে পারে না। ওরা ভাল না মন্দ কিছুই বোঝা যায়না। দিনে-রাতে কয়েকবার ওই লাইনের ওপর দিয়ে চার-পাঁচ বগিওলা মালগাড়ি যাতায়াত করে। গাড়ির আওয়াজ পেলেই বাস্তির ঘরগুলো থেকে দল বেঁধে ছেলে-মেয়েরা ছুটে যায় লাইনের পাড়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে থাকে। গাড়িটা খুব আস্তে আস্তে যায়, ড্রাইভার লাইনের পাশে দাঁড়ানো লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলে, তারপর যেমন আস্তে আস্তে এসেছিল তেমন আস্তে আস্তেই চলে যায়। গাড়ি চলে যেতে ছেলে-মেয়েরা লাইনের ওপর থেকে কয়লা কুড়োয়। এখানকার কেউ কয়লা কেনেনা। গোটা বস্তিটাকে জিভের ডগায় নামিয়ে রেখেছে পদ্মপিসি। পদ্ম যে কার পিসি কে জানে, কিন্তু ছেলে, বুড়ো সবাই ডাকে পিসি বলে। গায়ের রঙ কোন এক সময় ফর্সা ছিল, কিন্তু এখন তামাটে। বয়স পঞ্চাশের ওদিকে, তবুও শরীরের বাঁধুনী বেশ মজবুত। গোটা চারেক ঘরের মালিক ওই পদ্মপিসি। রতন পদ্মপিসির ভাড়াটে। অবিরত পান-

খেয়ে দাঁতগুলো তেঁতুল বীচির মতো রঙ পেয়েছে। সবাই বলে পদ্মপিসি নাকি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও পান চিবোয়। নতুন ভাড়াটের সঙ্গে পদ্মপিসি আলাপ করতে এল সাত সকালে।

দুর্গা সবে ঘুম থেকে উঠেছে। গোটা শরীর ঘামে জবজবে। বারান্দায় বসে আঁচল দিয়ে গলার ঘাম মুছছিল। এমন সময় পদ্মপিসি হাঁক ছাড়ল, 'কই গো নতুন ভাড়াটে, রাত পোয়ালো ?'

দুর্গা গায়ের কাপড় ঠিক করে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। পদ্মপিসি বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক, থাক, ভারী পেটে অত হুটহাট করে ওঠবোস করতে নেই, বোসো।'

আঁচল থেকে টিনের কৌটো বার করে আবার একটা নতুন পান মুখে পুরে বললো, 'তোমার বর কই, রতন না মদন কী যেন নাম।'

ঘরের ভেতর থেকে রতন সব শুনতে পাচ্ছিল। বাড়ি ঠিক করার দিন পদ্মপিসির সঙ্গে প্রথম আলাপ। যেদিন সনাতনের সঙ্গে এবাড়িতে এল সেদিন দ্বিতীয়বার আলাপ। সেটা বেশ মনে আছে রতনের। দুর্গাকে আপাদমস্তক দেখেই বলে উঠেছিল, 'আঃ কপাল, একেবারে পেট বাধিয়ে নিয়ে এয়েছে।'

তারপর একবার পল্টুর দিকে আর একবার রতনের দিকে কুতকুত করে তাকিয়ে নিয়ে বলেছিল, 'তা হ্যাঁ বাবা, হিন্দু মতে বিয়ে করা মাগ তো, নাকি ভাগিয়ে নিয়ে এসেছ। পেট খসিয়ে কেটে পড়বে।'

পল্টু পদ্মপিসিকে রতনের ব্যাপারটা বোঝাতেই ফিক করে হেসে পদ্মপিসি বলল, 'ওসব কথায় চিঁড়ে ভিজবে না বাবা পল্টু। বলি রোজগারের ব্যবস্থা কি ?'

পল্টু কখনও নরম সুরে, কখনও ধমকে পদ্মপিসিকে বাগ মানিয়েছিল। দিনকয়েক যেতেই রতন বুঝল পিসি খুব খারাপ মানুষ নয়। কথা দিয়ে জল ফোটায় বটে, কিন্তু ভেতরে কোন বিষ নেই। পিসির গলা পেয়ে রতন বাইরে এল। রতনকে দেখে পিসি পানের পিক ফেলে বলল, 'তা হ্যাঁরে গু'খেগোর ব্যাটা, এত বেলা অব্দি পড়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছিস, তোর মাগটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছিস।

এসময় ভাল, মন্দ খাওয়াতে হয়, না হলে ছেলে বিয়োতে গিয়ে টেঁশে যাবে।'

রতন আঁজলা করে মুখে জল দিতে দিতে বলল, 'সবই তো জানি, কিন্তু পাব কোত্থেকে। যা পাই তোমার ঘরের ভাড়া দিতেই তা শেষ হয়ে যাবে।'

পদ্মপিসি মুখ বেঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাসল। বলল, 'তা বলে ঘরের ভাড়া ফেলে রাখলে চলবেনা। হপ্তা পেলেই কিছু কিছু করে দিয়ে যাবি। চিরকাল তো বোতল ধুয়ে চলবে না, ওটা একটা লোক দেখানো কাজ। রোজগার করতে হলে পল্টুদের দলে নাম লেখাতে হবে।'

পল্টুদের একটা দল আছে সেটা রতন এতদিনে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু সেই দলের কাজটা যে কি সে কথা বুঝতে পারে না। রতনের গা ছমছম করে। পদ্মপিসির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকায়। পদ্মপিসি দুর্গাকে দেখছে। দুর্গা পিঠের এলো চুল পিঠের ওপর থেকে তুলে খোঁপা করে বাধতে ব্যস্ত। কাপড়ের নিচে ওর ভারী বুকের দিকে পদ্মপিসি তাকিয়ে আছে।

আবার একটা পান মুখে দিয়ে পিসি বলল, 'দিব্যি খাসা বৌ জুটিয়েছিস তুই। একেবারে কুমোরটুলীর ছাঁচে গড়া। সামলে রাখিস বাপু, নইলে শেয়াল-শকুনের নজর পড়বে।'

'পিসি!' ভয় পাওয়া গলায় দুর্গা যেন চাপা আর্তনাদ করল।

পদ্মপিসি ফিক করে হেসে ফেলে বলল, 'আমি থাকতে তোর ভয় নেই। আমি সোঁদরবনের বাঘিনী, আমার কাছে শেয়াল-শকুন ঘেঁষতে সাহস পায়না।' পানের পিক ফেলে উঠে দাঁড়াল পদ্মপিসি।

রতন বলল, 'তোমার ভরসাতেই তো বৌটারে একা রেখে কাজে যাই। মনে মনে জানি তুমি আছ।'

পদ্মপিসি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওরে আমার পিরীতের কাঁঠালরে, যেন পদ্মপিসির ভরসাতেই বৌটারে পোয়াতী বানিয়েছিস। যা যা কাজে যা, ন্যালা খ্যাকড়া করিসনে।'

কথা শেষ করেই পদ্মপিসি আবার হাঁক ছাড়লেন, 'ওরে কেষ্ট, তোর বাপটা হাপের টানে আছে না গ্যাছে।'

কথা বলতে বলতেই নিমিষে পিসি উধাও। সনাতনের কাছে পদ্মপিসির কিছু কিছু গল্প শুনেছে রতন। সোঁদরবনের দিকে কি একটা গ্রামে থাকতো পদ্মপিসি। চোদ্দ বছর বয়সে প্রেমে পড়েছিল লঞ্চের এক জোয়ান খালাসীর। ষোল বছর বয়সে তার সঙ্গে পালিয়ে চলে আসে কলকাতার রাজাবাজারে। বছর দুই একসঙ্গে ছিল। পদ্মপিসির পেটে সন্তান আসতেই খালাসী বেপাত্তা। তখন আশ্রয় পেল রেললাইনের পাশে এই বস্তিতে। বস্তির মালিক ছিল এক মুসলমান। লোকে বলে তার কাছেই থাকত পদ্মপিসি। ছেলেটা হাঁটতে-চলতে শেখার পর একদিন এই লাইনেই কয়লা কুড়োতে গিয়ে বেমক্কা কাটা পড়ল। ওই মুসলমানের কাছ থেকেই খান কয়েক ঘর বাগিয়েছে মাসি। সেগুলো ভাড়া খাটিয়ে তার চলে যায়। এছাড়া আরও কী থেকে যে মাসির রোজগার সে কথা সনাতন খুলে বলেনি!

কিন্তু মাস পেরোতে না পেরোতেই এই বস্তির অনেক রহস্য রতনের কাছে জলের মতো পরিস্কার হয়ে যেতে লাগল। ওই যে এক জোড়া রেললাইন, যেখান দিয়ে দিনে-রাতে চার-পাঁচবার মালগাড়ি যাতায়াত করে ওটাই হল গোটা বস্তির বাঁধা লক্ষ্মী। মাঝ-রাতে গাড়ির আওয়াজ, দরজা ভাঙ্গার শব্দ তারপর রতনদের ঘরের দরজার পাশ দিয়ে দুপ্‌দাপ করে লোকজনের চলাফেরা। এসব রহস্য আজ আর মোটেই ধোঁয়াটে নয় রতনের কাছে। সনাতন তাঁকে বারবার 'হিম্মৎ' কথাটা বুঝি এই কারণেই বলেছিল। দুর্গা বুকের কাছে কাপড় টানতে টানতে ভয় জড়ানো গলায় বলে, 'ওরা গাড়ির দরজা ভেঙ্গে কী করে গো?'

রতন ফিসফিস করে উত্তর দেয় 'মাল চুরি করে।'

দুর্গার গলা শুকিয়ে যায়। বলে, 'কী মাল।'

রতন পাশ ফিরে শুতে শুতে বলে, 'কত রকমের মাল থাকে জেকি

আমি জানি।'

দুর্গার কৌতূহল মেটে না। সে আবার জিজ্ঞেস করে, এখানকার সবাই ওইসব করে?'

রতন কপালের ওপর হাত রাখতে রাখতে বলে, 'ঠিক জানিনা। তুই এখন ঘুমো।'

দুর্গা রতনের বুকের ওপর একটা হাত তুলে দেয়। রতন নিজের হাত দিয়ে দুর্গার হাতটা নামিয়ে দিতে দিতে বলে, 'ঘেমো হাতটা আমার গায়ে দিচ্ছিস কেন?'

দুর্গা রতনের গলার কাছে মুখ নিয়ে এসে বলে, 'আমার ভয় করছে যে।'

রতন দুর্গার দিকে একটু কাত হয়ে শুয়ে বলল, 'তবে দে।'

দুর্গা ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গিয়েছিল। রতনের চোখ সবে জড়িয়ে আসছে। ঠিক তখনই ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। রতন কান পেতে শব্দটা শুনল। তিনবার টোকা পড়তেই বাইরে থেকে চাপা গলার ডাক এল, 'রতন, রতন।'

রতন উঠে বসল। লুঙ্গিটা ভাল করে বাঁধল। তারপর দরজার কাছে এসে বলল, 'কে?'

'আমি পল্টুদা, দরজা খোল।'

রতন দরজা খুলে দিতেই পল্টু ভেতরে চলে এল। পল্টুর হাতে দুটো বড় ব্যাগ। ব্যাগ দুটো রতনের ঘরের কোনে রেখে দিয়ে বলল, 'এ দুটো তোর ঘরে রাখ। কাল সকালে পদ্মপিসি এসে যা বলবে তাই করবি।'

রতন ব্যাগ দুটোর দিকে দেখল। ভেতরে কি আছে বোঝবার উপায় নেই দুটো ব্যাগের মুখই দড়ি দিয়ে বাঁধা। রতন বলল, 'ওতে কি আছে পল্টুদা।'

পল্টু বলল, 'তাতে তোর কি দরকার। তুই সামলে রেখে দে।'

কথা শেষ করেই পল্টু বেরিয়ে গেল। পল্টুর পেছনে পেছনে বারান্দা পর্যন্ত এসে দেখল উঠোনে আরও জনাচারেক লোক

দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে লোকগুলোর মুখ চেনা গেলনা। ঘরের দরজা বন্ধ করতে গিয়ে ব্যাগ দুটোর দিকে তাকাল রতন। কিন্তু অন্ধকারে ভালো করে কিছু দেখতে পেলনা। লম্ফ জ্বেলে দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল কিন্তু সাহসে কুললো না।

সকালবেলাতেই পদ্মপিসি এসে হাজির। পদ্মপিসি মাথা নিচু করে বারান্দায় উঠল। ঘরের মধ্যে ঢুকে রতনকে বলল, 'কালরাতে পল্টু দু'টো ব্যাগ রেখে গেছে না?'

রতন ইশারায় ব্যাগ দুটো দেখিয়ে দিল। পিসি পানের খিলি মুখে পুরে বলল, 'কাজে যাবার সময় ওই দুটো তুই নিয়ে যাবি। তোদের কারখানার মালিক দত্তবাবুকে সব বলা আছে। ব্যাগ দুটো ওর হাতে দিয়ে বলবি পল্টু পাঠিয়েছে।'

রতন একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী আছে ওতে?'

পদ্মপিসি হেলাফেলা ভাবে বলল, 'কি আর হাতি ঘোড়া থাকবে। মানুষের কাজে লাগে এমন জিনিসই আছে।'

রতন পদ্মপিসির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কত তো লোক আছে, পল্টুদা নিজেও তো আছে, তা আমাকেই দিয়ে আসতে হবে কেন?'

কোমরে হাত দিয়ে চোখ পাকিয়ে তাকাল পদ্মপিসি। বলল, 'সে বুদ্ধি যদি তোর ঘটে থাকত তাহলে কি আর উপোস করে শুকোতিস, ওই পল্টুর মতো নবাবের হালে থাকতিস। যা কিছু হচ্ছে তা জানবি তোর ভালোর জন্যেই।'

ব্যাগ দুটো দত্তবাবুর ঘরে পৌঁছে দিয়ে চলে আসছিল রতন। দত্তবাবু ডাকলেন, 'শোন।'

রতন ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল দশ টাকার দুটো নোট পকেট থেকে বার করে দত্তবাবু তার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। রতন বিব্রত বোধ করল। দত্তবাবু বললেন, 'নাও, এটা তোমার। পল্টু আমাকে বলে দিয়েছে। রতন কাজের পর বাড়ি ফিরে এল খুশ মেজাজে। পকেটে করকরে কুড়িটা টাকা। ইচ্ছে করলে আজ

দুর্গার জন্যে সে কিছু কিনেও নিয়ে যেতে পারে। দুর্গা আলুর চপ ভালবাসে। ঝালমুড়ি খাবার খুব শখ। পদ্মপিসি একদিন কলকাতার ঝালমুড়ি খাইয়ে লোভ লাগিয়ে দিয়েছে দুর্গার। রতন দুর্গার জন্যে গরম আলুর চপ আর ঝালমুড়ি কিনে বাড়ি এল। জিনিসগুলো দেখেই যেন দুর্গার জিভে জল এসে গেল। বারান্দায় বসে ওরা দু'জনে যখন খাচ্ছে তখন পদ্মপিসির গলা শোনা গেল। দুর্গা গলা বাড়িয়ে ডাক দিল, 'পিসি এসো, দেখবে এসো তোমার ভাইপো কি এনেছে?'

পদ্মপিসি বারান্দায় এসে ওদের খাওয়া দেখল। দুর্গা একটা আলুর চপ বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'খাবে পিসি?'

পিসি আঙ্গুল দিয়ে নিজের মুখের দিকে দেখিয়ে বলল, 'মুখে পান বোঝাই, তোরা খা।'

পানের পিক ফেলে রতনের দিকে তাকাল। বলল, 'দত্তবাবু কত দিয়েছে?'

রতন বলল, 'কুড়ি টাকা। আমি চাইনি, বললেন পল্টুদা বলে দিয়েছে। এটা নাকি আমারই।'

পদ্মপিসি একগাল হেসে বলল, 'তোরই তো। এটুকুতেই কুড়ি টাকা, তবেই বোঝ পল্টুরা কত কামায়?'

রতন কৃতার্থের মতো বিগলিত ভঙ্গীতে বলল, 'পল্টুদা আমায় খুব ভালবাসে তাই না পিসি।'

পদ্মপিসি ঠোঁট উল্টে বলল, 'ভালবাসার কাঁথায় আগুন। ওই শব্দটা শুনলে আমার অম্বল হয়। মেয়েমানুষ ভালবাসা পায় গতরের জন্যে, পুরুষমানুষ পায় হিম্মৎ-এর জন্যে। যদি তুই দেখাতে পারিস তাহলে তুইও অনেকের ভালবাসা পাবি।'

এরপর থেকেই রতন সব পরিষ্কার বুঝতে আরম্ভ করল। দু'টাকা চার আনা রোজের কাজ করে যেঘর ভাড়া নেওয়া-পোয়াতী বৌ নিয়ে সেই ঘরে শোওয়া যায়না, তার জন্যে হিম্মৎ দেখাতে হয়, হিম্মৎ দেখিয়ে রোজগার বাড়াতে হয় সে কথাটা সনাতন আর পদ্মপিসি

তাকে বুঝিয়ে ছাড়ল। কিন্তু এতসব বোঝবার আগেইতো না বুঝেও সে পল্টুর দলের কাজই করে দিয়েছে। বিনিময়ে হপ্তায় হপ্তায় কুড়ি টাকা করে পাওয়াটা তার প্রায় অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ঠিক তখনই আচমকা ব্যাপারটা বন্ধ করে দিল পল্টুটা। একদিন দু'দিন করে দু' দুটো হপ্তা চলে গেল, কুড়ি টাকার রোজগার বন্ধ হয়ে গেল। উসখুস করতে করতে নিজেই একদিন পদ্মপিসিকে বলল।

পদ্মপিসি সব শুনে বলল, 'তা বাপু অতই যদি টাকার দরকার তাহলে নিজে গিয়ে বলনা পল্টুকে। নাহলে চল আমার সঙ্গে, আমি তোর জন্যে পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

পিসির হাত ধরে পল্টুর আখড়ায় গিয়েই আসল হাতেখড়ি হল রতনের। মালগাড়ি ভেঙ্গে রাতের বেলা মাল নামানো আর সেই মাল পল্টুদার কথা মতো জায়গায় পৌঁছে দেওয়া এই হল রতনের নতুন কাজ। রতনের চওড়া কাঁধে চাপড় দিয়ে পল্টুদা বললেন, 'বুঝলে পিসি, রতনের মুখটা গেঁয়ো গেঁয়ো আর ভারী সরল, গায়ের জোর আছে, ওকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া যাবে। দলের অন্য ছেলেগুলোর চেহারা একেবারে মার্কামারা হয়ে গেছে। থোমা দেখলেই চরিত্রের কুষ্ঠি বোঝা যায়।'

পল্টুর পাশ থেকে একজন ফোঁড়ন কেটে বলল, 'যা বলেছ গুরু, ফেসের জিওগ্রাফি দেখলেই লাইফের হিস্ট্রি বলে দেওয়া যায়।'

সেদিন রাতে পল্টুর কাছ থেকে ফিরে আসার পর কেন জানিনা রতনের বার বার কদমগড়ের কথা মনে পড়ল। কদমগড়ের টুকরো টুকরো ছবি অনেক রাত অবধি তার বুকের মধ্যে জোনাকির আলোর মতো উড়ে উড়ে বেড়ালো।

রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল পল্লীর বিলের জলে দাঁড়িয়ে মা ডাকছে রতনকে, 'আয় রতন, স্নান করবি আয়। সারা গায়ে কাদা মেখে রতন পাড়ে দাঁড়িয়ে। মা হাত বাড়িয়ে ডাকছে, আয়, তোর কাদা ধুয়ে গা পরিস্কার করে দিচ্ছি। আয় বাবা, আমার

কাছে আয়।'

কিন্তু ঘুম ভাঙল পদ্মপিসির ডাকে। পিসি ডেকে বলছে, 'রতন তাড়াতাড়ি বাজারে যা, আজ দুগগার সাধ দেব আমি।'

রতনের মনে পড়ল, হ্যাঁ আজই তো পিসি দুর্গাকে কী সব পায়েস টায়েস খাওয়াবে বলেছিল।

রতন বাজারে গেল। দুপুরে পিসি নিজে রান্না করে খেতে বসাল দুর্গাকে। পিসির দেওয়া নতুন শাড়ি পরে দুর্গা খেতে বসল। রতন বারান্দায় বসে রইল। পিসি বলেছে, 'এসব ছেলেদের দেখতে নেই, মেয়েদের ব্যাপার।'

কিন্তু দুর্গা যখন খেতে বসার আগে পিসিকে প্রণাম করতে গেল তখন থেকেই পিসি যেন কেমন বদলে গেল। পায়েসের থালাটা দুর্গার দিকে এগিয়ে দিয়ে কথা বলতে গিয়ে তাব গলা বুঁজে এল।

অথচ কোন কাজে ফাঁক রাখল না পিসি। উলু দিল, প্রদীপ জ্বালালো এবং পাশে থেকে সারাক্ষণ দুর্গাকে খাওয়ালো। এঁটো থালা দুর্গাকে তুলতে দিল না। বলল, 'আমার খোকা বেঁচে থাকলে আজতো তার বৌয়ের সাধ হতো। আজ বাব বার ঐ শওরটার কথা মনে হচ্ছে।'

পিসির গলার স্বরে এমন বিষণ্নতা ছিল যে ঘবের আবহাওয়া বদলে গেল।

দুর্গা পেছন থেকে পিসিকে জড়িয়ে ধরে আলতো করে কাঁধে মাথা রাখল। বলল, 'খুব ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি। কাকীদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মানুষ হয়েছি। আজ তোমায় পেয়ে নিজের মায়ের শোক ভুলেছি পিসি। আমি তোমাকে 'মা' বলে ডাকব।'

হঠাৎ ছিটকে সরে গেল পদ্মপিসি। তার দুই চোখে জল ছিল, তবুও চোখ পাকিয়ে ঝামটা দিয়ে বলল, 'খবরদার বলছি মুখপড়ি, মা বলে আমায় ডাকবি না। অত সোহাগ দেখাবি না।'

দুর্গা ঘাবড়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, 'তুমি একথা বলছ কেন পিসি। তুমি আমায় ভালবাসো না? সত্যি করে

বলতো—'

পদ্মপিসির চোখফেটে জল আর আগুন দুই যেন বেরিয়ে এল। প্রায় চিৎকার করা গলায় বলল, 'ওরে হতচ্ছাড়ি, আমার ভালবাসায় যে অভিশাপ আছে। ভালবেসে কাউকে কাছে ধরে রাখতে পারিনে। তাই আর কাউকে ভালবাসতে চাইনা—কাউকে না, সবাই আমার শত্রু।'

নিজের কথা ভাল করে শেষ করতে পারল না পদ্মপিসি। দেয়ালে মুখ রেখে কেঁদে উঠল। দুর্গা অবাক চোখে দেখল, সেই পদ্মপিসি, যার জিভের সামনে গোটা বস্তি চলে, যার ধমকে রেলপাড়ের ছোকরারা ভয়ে পালায়, সেই পদ্মপিসি এখন একটা অনাথ শিশুর মতো ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। সন্ধ্যেবেলা কারখানা থেকে ফিরেই রতন দেখল গোটা বস্তি থমথমে। বটতলায় বসে ছেলেগুলো সন্ধ্যেবেলাতেও রেলইয়ার্ডের আলোতে দিব্যি তাস খেলত তারাও আজ বেপাত্তা। রেলপাড়ের চায়ের দোকানে তেমন জমজমাট আড্ডা নেই। রতন নিজের ঘরের দরজার কাছে আসতেই টের পেল ঘরের ভেতরে লম্ফ জ্বলছে। বারান্দা থেকে ডাক দিল, 'দুর্গা—'

দুর্গা দরজার বাইরে এল। রতন বারান্দায় বসতে যাচ্ছিল, দুর্গা ওকে ইশারায় ঘরে ডাকল। ঘরের ভেতরে এনে বলল, 'আজ দুপুর থেকে বড্ড ঝামেলা চলছে।'

রতন চোখের ইশারায় জানতে চাইল। দুর্গা থপথপ করে ঘরের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে রতনের লুঙ্গি আর গামছা এনে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'পল্টুদার সঙ্গে খালের ওপারের ছেলেদের কি কি নিয়ে যেন গণ্ডগোল বেঁধেছে। ওদের একটা ছেলেকে এ পাড়ের ছেলেরা সাইকেলের চেন দিয়ে নাকি খুব পিটিয়েছে।'

রতন লুঙ্গি পরতে পরতে বলল, 'তোকে কে বলল এতসব?'

দুর্গা মেঝের ওপর বসে পড়ে উত্তর দিল, 'পদ্মপিসি এসেছিল। সেই সব বলে গেল। সন্ধ্যের পর আবার গণ্ডগোল হতে পারে,

ছুটহাট বাইরে যেতে বারণ করেছে।'

এখানে দুটো দলের মধ্যে প্রায়ই দাঙ্গা লেগে যাওয়ার কথাটা রতন শুনেছিল, তবে এসে ইস্তক দেখেনি। সনাতন একদিন কথায় কথায় বলেছিল, 'দু দলেরই এক ধান্দা। তবে পল্টুর দলটা বেশি ভারী। ওদের দলের মাথা হল গোপাল, সে ব্যাটা মার্ডারের কেসে জেলে ঢুকে আছে।'

রতন কয়েকদিন আগেই শুনেছিল গোপাল নাকি খালাস পেয়ে যাচ্ছে। তবে কি গোপাল ফিরে এসেছে। গোপালকে কখনও চোখে দেখেনি রতন তবে শুনেছে সে নাকি সাংঘাতিক লোক। কিন্তু আজকে দু'পাড়ের গণ্ডগোলটা ঠিক কি নিয়ে সে কথাটা দুর্গা বলতে পারল না। পদ্মপিসির কাছে রতনের একবার যাওয়ার দরকার ছিল। দত্তবাবু বলেছেন, এহপ্তায় আর মাল পাঠাতে হবে না। উনি দেশে যাচ্ছেন। দেশ থেকে ফিরে এলে খবর দেবেন। রতন পিসির কাছে যাচ্ছে দেখে দুর্গা বারণ করল। কিন্তু রতন শুনল না। পিসির ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বাইরে থেকে রতন ডাকল, 'পদ্মপিসি ও পদ্মপিসি।'

ভেতর থেকে পদ্মপিসি আওয়াজ দিলো, 'কে র‍্যা—'

রতন বলল, 'আমি রতন।'

পদ্মপিসি দরজা খুলে দিল। ঘরে ঢুকেই রতন বোকা বনে গেল। তক্তোপোষের ওপর অচেনা দুই ভদ্রলোক বসে। নিচে পল্টুদা, জগা আর সনাতনের বন্ধুরা। পদ্মপিসি চোখের ইশারায় রতনকে বসতে বলল। ভদ্রলোক দুজনের সঙ্গে পল্টুদা নিচু গলায় কথা বলছিল। রতন সব কথা বুঝতে পারল না। শুধু তার কানে এল কয়েকটা শব্দ, যেমন, মাল, ওয়াগন, বগি নামবার, শিবপুরের গোডাউন। রতন গোটা ঘরের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখতে পেল পিসি তক্তোপোষের কোনায় বসে পান চিবুচ্ছে, নিচে পল্টুদার ছেলেরা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা কইছে আর পাশের ঘর থেকে মাছ ভাজার গন্ধ আসছে। রতনের অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল।

একটু পরেই অচেনা লোক দুটো উঠে গেল। পল্টুদাও তার এক সাকরেদকে নিয়ে পেছন পেছন গেল। পিসি পেতলের ছোট জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটতে কাটতে বলল, 'আমি তো দুগগাকে বলে এসেছিলাম আজ সন্ধ্যের পর হুটহাট বেরুবি না। আজ গোলমাল হবে। তা দুগগা বলে নি তোকে?'

রতন বলল, 'বলেছে।'

পিসি এক খাবলা সুপুরি মুখে ফেলে দিয়ে বলল, 'বলছে তো এলি কেন?'

রতন পিসির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল,'তুমিই তো বলেছিলে, বাঁচতে হলে হিম্মৎ চাই।'

পিসি অবাক হওয়ার ভান করে হাঁ করল। রতনের চিবুক নেড়ে দিয়ে বলল, 'ওরে বাপরে, ছেলে আমার হিম্মৎ দেখাতে এসেছে। খালপাড়ের দানা পেটে পড়তেই গাঁয়ের গন্ধ উবে গেছে। এ ছেলে টিঁকলে পল্টুর বরাত খুলে যাবে। তা এলি কেন? বিষয়টা কি?'

রতন দত্তবাবুর কথাটা বলল। পিসি বলল, 'ওমা, এর জন্যে ছুটে এলি। ওতো কাল বললেও হতো।'

রতনের এখানে আসার পেছনে অন্য কৌতূহল ছিল। তাই সে বলল, 'তুমি নাকি বলে এসেছ, রাতে গণ্ডগোল হতে পারে।'

পিসি ঘাড় নাড়ল।

রতন বলল, 'কেন? কাদের সঙ্গে?'

পিসির মুখে ভরে উঠেছিল পানের বাস। কথা বলতে গিয়ে পারল না। পানের পিকটা ফেলে এসে বলল, 'ওই খুনে গোপালটা ছাড়া পেয়ে ফিরে এসেছে। এসেই হাঙ্গামা শুরু করেছে। পল্টুর ছেলেদের শাসাচ্ছে। পল্টুও ছাড়বার পাত্র নয়। ওদের একটা চামচেকে ধরে ঠেঙ্গিয়ে দিয়েছে। রাতে আসবে গাড়ি ভাঙ্গতে। এ যেন মগের মল্লুক। তোদের ওদিকে তো আমরা যাই না, তোরা কেন ইদিকে আসবি। এবার খাল পেরোলেই

মজা টের পাবে।'

রতন যেন রূপকথার কোন যুদ্ধের গল্প শুনছিল পিসির মুখে এমনভাবে নিয়ে বলল, 'মজাটা কেমন হবে?'

ঘরের ভেতর থেকে একজন বলে উঠল, 'খান কয়েক পেটো ক্যালালেই মজা টের পাওয়া যাবে।'

রতন অবাক গলায় বলল, 'পেটো!'

ঘরের ভেতর একটা ব্যাগ থেকে সুতলীতে বাঁধা তুটো গোলাকার বস্তু হাতে তুলে নিয়ে দেখাতে দেখাতে একজন বলল, 'এই হচ্ছে, পেটো, লোক্যাল মেড, আমাদের কাছে এর দাম অ্যাটমের মতো।'

পেটো তুটো ব্যাগে রাখতে যাবার আগে বার তুই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল ছেলেটা। পরে তারিফ করার ভঙ্গিতে বলল, 'মাইরি তুমি আমাদের আপন পিসি, তুমি যুগ যুগ জিয়ো। যা মাল বানিয়েছ না, একেবারে ফাস্টো ক্লাস। পঞ্চা নন্দীর পর এত ভাল পেটো কেউ বানাতে পারে না। পিসির পেটো যুগ যুগ জিয়ো।'

পিসি মৃত্নু ধমক দিয়ে বলল, 'আঃ চুপ কর না মুখপোড়া। মেছুনীদের মতো চেল্লাতে লেগেছে।'

পিসির কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পল্টুদা তার সাকরেদসহ ফিরে এল। ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হাওয়া ভাল নয়। বাঞ্চোৎরা ঝামেলা করবেই। নিতাই খবর দিয়ে গেছে দোকানে।' এতক্ষণ যে পেটো দেখছিল সেই ছেলেটা বলল, 'ওদের স্টক কেমন, কিছু জেনেছ?'

পল্টু বলল, 'গোপালের কাছে একটা চেম্বার আছে। বোধহয় একটা দোনলাও ম্যানেজ করেছে।'

ছেলেটা তুড়ি মেরে বলে উঠল, 'ব্যস্, এতেই এত র‍্যালা। এতো গুরু সোয়াঘণ্টার মামলা। আমাদের তিনটে চেম্বার তো ওপন করবার দরকারই হবে না। স্রেফ পিসির মোয়া ঝেড়েই ফতুর করে দেওয়া যাবে।'

পল্টু সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'কেসটা আসলে কী

জানিস? গোপলা এসে দেখে ওর পার্টিরা সব ফুটে গেছে। ওরা আমাদের সঙ্গে কারবার করছে। তাই একটু বাজার গরম করে পার্টিদের দেখাতে চাইছে ওর হিম্মৎ কত?'

সেই ছেলেটা মেঝের ওপর কাত হয়ে শুতে শুতে বলল, 'অতসব জানিনা গুরু, তুমি সিগন্যাল দিলেই খেল শুরু হয়ে যাবে। গোপলার হিম্মৎ ওর গুষ্টির পাছায় ঢুকিয়ে দেব।'

তারপর গলাটা একটু নামিয়ে আবদারের সুরে বলল, 'গুরু পিসিকে বলনা, একটু টনিক ছাড়তে। গতরটা ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে।'

মাঝরাত থেকেই গোটা খালপাড় গরম হয়ে উঠল। বিকট শব্দে গোটা বস্তি কাঁপিয়ে এক-একটা শব্দ যেন আছড়ে পড়তে লাগল রতনের বুকের ওপর। রতনকে জড়িয়ে ধরে কাঁপছিল দুর্গা। মনে হচ্ছে গোটা ঘরটা বুঝি এখনই ঝুরঝুর করে ভেঙ্গে পড়বে। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক চলল এই বোমাযুদ্ধ! তারপর আস্তে আস্তে গোটা বস্তিটা ঝিমিয়ে এল। ঘরে বসে বসেই রাতটা শেষ হয়ে যেতে দেখল রতন। শান্ত আকাশের গায়ে ঝকঝকে চাঁদের আলো, সাদা মেঘের পাল যেন গাভীনগাইয়ের মতো মন্থর পায়ে চলে বেড়াচ্ছে আকাশে। রাতশেষ হয়ে আসছিল। ধীরে ধীরে বাতাস দিচ্ছে। রতন সন্তর্পনে দরজা খুলে বাইরে এল। কারখানার দিক থেকে বাঁশির আওয়াজ আসছিল। কে এমন আছে যে শেষরাতে বাঁশি বাজাচ্ছে। বাইরের বাতাসে তখনও বারুদের গন্ধ। নিঃস্তব্ধ আকাশের নিচে সুবোধ ছেলের মতো চুপ করে আছে বস্তিটা। রতন চারপাশ দেখে নিয়ে আবার ঘরে ফিরে এল।

হঠাৎ একটা হৈ-হট্টগোলে ঘুম ভেঙ্গে গেল রতনের। যেন তার দরজার সামনেই গণ্ডোগোলটা হচ্ছে। জিনিসপত্র টেনে ফেলার আওয়াজ, বাচ্চাছেলের কান্না, গালাগাল সব মিলে রীতিমতো একটা কোলাহল। রতন উঠে বসল। ঘুম ভেঙ্গে দুর্গা ভীত চোখে রতনের দিকে তাকিয়েছিল। রতন বাইরে যাবে কি যাবে না ভাবছে এমন সময় তার দরজায় ধাক্কা পড়ল। দুর্গার চোখ থেকে ভয় আর

আতঙ্ক যেন ছিটকে বেরুতে লাগল। বাইরের গণ্ডগোলের মধ্যে থেকে পদ্মপিসির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। বুকে খানিকটা ভরসা পেল রতন। দরজা খুলে দিতেই তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। দরজার বাইরে উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে বন্দুক হাতে একদল পুলিশ। রতন ভিড়ের মধ্যে পিসিকে খুঁজছিল। কিন্তু তার আগেই একটা সেপাই রতনের হাত ধরে এমন টান মারল যে রতন হুমড়ি খেয়ে পড়ল উঠোনের ওপর। রতনের দিকে না তাকিয়ে সিপাইটা ঘরে ঢোকবার জন্যে মাথা নিচু করে বারান্দায় উঠতেই ভিড়ের ভেতর থেকে চিৎকার করতে করতে ছুটে এসে দরজা আগলে দাঁড়াল পিসি। পিসির চুলের খোপা উঁচু করে বাঁধা, কোমরে জড়ানো আঁচল, ছুই হাত সেই কোমরে রেখে পিসি বলতে লাগল, 'ওরে খাঁকি হনুমানরা ছুমদাম ঘরে ঢুকছিস যে বড়, ঘরে মেয়েমানুষ আছে না? তোদের ঘরে বুঝি মা-বোন নেই।'

সিপাইটা একটু থমকে গিয়েছিল। পরক্ষণেই বলল, 'দরজা ছেড়ে দিন, ভেতরে তল্লাসী করতে হবে।'

পিসি ঘনঘন পান চিবুতে চিবুতে বলল, 'সে কথা মুখে বলা যায় না, না বলে ছুমদাম যে ঢুকছ, এটা কি সরকারী গড়ের মাঠ, গৃহস্থের মান-ইজ্জত নেই।'

পিসি কথা শেষ করেই হাঁক দিলেন, 'বাইরে বেরিয়ে আয় ছুগগা, ড্যাকরারা ঘরে তল্লাসী করবে, বেরিয়ে আয়!'

ছুর্গা দরজার পাশেই ছিল। পিসির ডাকে বাইরে এল। ছু'জন সিপাই ঘরের মধ্যে ঢুকে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করল। ঘরের মধ্যে যে তছনছ হচ্ছিল সেটা বেশ বোঝা যায়। কলাইয়ের থালা, এনামেলের গামলা গড়িয়ে চলে আসছিল বারান্দায়। ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে রতন। তার মুখে কথা সরছিল না। সে অবাক চোখে দেখে যাচ্ছিল তল্লাসীর নামে পুলিশ তার ঘর লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে।

ঘরের ভেতর থেকে পুলিশ ছুজন বেরিয়ে পিসির পাশে দাঁড়ানো ছুর্গাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। ছু'জনে ফিসফিস করে কথা বলল।

দুর্গা বুঝতে পারল পুলিশ দু'জন ওকে দেখছে। ভয় পেয়ে দুর্গা পিসির পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। নিজেদের মধ্যে দ্বিতীয় দফা কথাবার্তা বলে পুলিশ দু'জন ফিরে এল দুর্গার কাছে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বলল, 'আপনাকে আমাদের সঙ্গে বড়বাবুর কাছে যেতে হবে।'

পুলিশের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল পিসি, বলল, 'কেন রে ড্যাকরা, পোয়াতী বউটাকে নিয়ে টানাটানি কেন? কোন সগগ উদ্ধার হবে ওকে নিয়ে গেলে।'

পুলিশ পিসিকে বোঝাল, 'চুরি যাওয়া মাল এই বস্তিতেই আছে। তাই সন্দেহ ভাজন লোককেও সার্চ করতে হবে। এই বৌটিকে ওদের সন্দেহ হচ্ছে। ওর শরীর তল্লাসী করলে নির্ঘাৎ কিছু মাল পাওয়া যাবে।'

পিসিও হিন্দিতে বোঝাতে আরম্ভ করল। কিন্তু কোন পক্ষই বুঝছে না।

এমন সময় উঠোন থেকে লাফ দিয়ে উঠে এল আরেকজন পুলিশ। বন্দুকের সামনে লাগানো ছুরির মতো ফলাটা দুর্গার উঁচু পেটের কাছে ঠেকিয়ে বলল, 'জরুর এর ভেতরে মাল আছে। গাঁজা, আফিং জরুর আছে।' আমি বহরমপুরে এরকম কেস ধরেছি।'

পিসি একঝটকায় বন্দুকের ফলাটা সরিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'ওরে আঁটকুড়োর ব্যাটা, জন্মে কি পোয়াতী মেয়েমানুষ দেখিসনি। তোদের মা-মাসীরা কি সব্বাই বাঁজা নাকি।'

সেপাইটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, 'বহরমপুরের বৌটাও বলেছিল সে পোয়াতী। ওসব কথা আমাদের ঢের শোনা আছে।'

কথাটা বলেই সিপাই বন্দুকটা আবার তাক করে ধরতে যাচ্ছিল। পিসি মুহূর্তের মধ্যে একটা কাণ্ড করে ফেলল। দুর্গাকে ঘরের মধ্যে টেনে এক ঝটকায় তার পেটের কাপড় সরিয়ে পেটটা উদোম করে ফেলে ডাকল, 'ওরে আঁটকুড়োর ব্যাটা আয়, দেখবি আয়—।'

পুলিশ তিনজন পিসির পেছনেই ছিল। ওরা এতটা ভাবতেই

পারেনি। দুর্গার খোলা চুল, বন্ধ চোখের কোল দিয়ে অপমান আর দুঃখের জলধারা নেমে আসছে। প্রায়ান্ধকার ঘরে আসন্ন প্রসবা মায়ের নিরাবরণ পেট। পুলিশ তিনজনকে উদ্দেশ্য করে পিসি চিৎকার করে বলছিল, 'দ্যাখ, দ্যাখ, তোর মায়ের পেট দ্যাখ, এই রকম পেটেই তোর মত জন্তুরাও ছিল—।'

পুলিশ তিনজন মাথা নিচু করে বারান্দা থেকে নেমে গেল। রতন ঘরে ঢুকে দেখল পিসির কাঁধে মাথা রেখে দুর্গা যেন ঘুমিয়ে আছে। রতনকে দেখে পিসি বলল, 'ওমা এযে মূর্চ্ছা গেছে। ধর, ধর, চোখে-মুখে জল দে।'

অনেক পরে, রতন জিজ্ঞেস করবার আগেই পিসি নিজে থেকে বলেছিল, 'এমনটা না করে উপায় ছিল না। ওকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস শুরু করলে মেয়েটা ঘাবড়ে গিয়ে বেফাঁস কথা বলে দিত। তোদের গাঁয়ের কথা জানাজানি হয়ে যেত। তাছাড়া, এমন একটা কাণ্ড না ঘটালে ওই ব্যাটারা এখনও ঘরে ঘরে তল্লাসী চালাতো। পল্টুরা ধরা পড়ে যেত।'

কিন্তু পদ্মপিসি শেষ রক্ষা করতে পারল না। খালের দুই পাড়ের রেষারেষি বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় পৌঁছল যে বটতলায় রেলের পুলিশ ছাউনী ফেলল। খালের ওপারেও টহল দিতে লাগল বন্দুক-ধারী পুলিশ। পল্টু বেপাত্তা হয়ে গেল। তারই মধ্যে একরাত্রে দুর্গার পেটে ব্যথা উঠল। পদ্মপিসি আর হাসপাতালে নেবার সময় পেলো না। নিজেই ধাই হয়ে বসে গেল দুর্গার পাশে। পল্টুর দল পাড়া ছাড়া। এসময় পিসি একা কোথায় যাবে, কি করবে ভাবতে ভাবতেই ঠিক করে ফেলল, কপালে সন্তান থাকলে এমনিই হবে।

হলও তাই। শেষরাতের ক্লান্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘরের ভেতর থেকে কচি গলায় কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল রতন। রতন ডাকল, 'পিসি।'

ঘরের ভেতর থেকে পদ্মপিসি উল্লাস মাখা গলায় বলে উঠল,

'ছেলে হয়েছে, ছেলে—।'

বিশ্রী শব্দে রেলের ইঞ্জিন শান্‌টিং হচ্ছিল তখন। রতন ঘরের দিকে যেতে গিয়ে থামল। বলল, 'আমি ভেতরে যাব।'

পদ্মপিসি বলল, 'এখনই না, আমি ডাকলে তবে আসবি।'

পেটে টান পড়েছিল পণ্টুরা বেপাত্তা হবার পর থেকেই। শিশি বোতল ধুয়ে পেট চালানো যায় না। ছেলে কোলে নিয়ে আর উপোস করতে পারে না দুর্গা। তার পেটেব মধ্যে হামলে বেড়ায় খিদে নামক জন্তুটা। গোটা শরীর শুকিয়ে সাদা হয়ে আসছে। বেলাবাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর ক্ষিদের জ্বালায় ছটফট করতে থাকে। রতন বুঝতে পারে, কিন্তু কিছুতেই জোটাতে পারে না। হপ্তার টাকা দিয়ে তিনদিনও ভাল করে চলেনা। তার নিজের পেটের খিদেটাও কম নয়। পদ্মপিসির ভাড়া বাকি পড়ে আছে। রতন কাজ থেকে ফিরল এক গা জ্বর নিয়ে। ক'দিন থেকেই বিকেলে তার জ্বর আসছিল। চলতে গেলে পা টলে যেত। তবুও কাজ কামাই করেনি। আজ ঘবে ফিরেই বারান্দার ওপর শুয়ে পড়ল। দুর্গা বলল, 'কী হল, শুয়ে পড়লে যে।'

রতন চোখ তুলে দুর্গাকে একবাব দেখল, তারপর যেমন শুয়েছিল তেমন পড়ে রইল। দুর্গা রতনের গায়ে হাত দিয়ে বুঝল, তার শরীরে অনেক জ্বর। সন্ধ্যের পর জ্বরের ঘোরে ভুল বকতে আরম্ভ করল রতন। দুর্গার শরীর খিদের জ্বালায় ক্লান্ত হয়েছিল। বার দুই কোন রকমে উঠে রতনের মাথায় হাত বোলালো। কিন্তু বেশিক্ষণ পারল না। সকালবেলা পদ্মপিসি এসে দেখে গেল। কোত্থেকে চারপুরিয়া ওষুধও এনে দিল। তবুও গায়ের তাপ কমল না। তিনদিন জ্বরে বেহুঁশ রতন চারদিনের মাথায় চোখ খুলে দুর্গার দিকে তাকাল। ক্লান্ত গলায় বলল, 'বড্ড খিদে, কিছু খেতে দিতে পারিস।'

দুর্গা অসহায় চোখে রতনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মুখ নিচু করল। রতন বুঝে গেল। তার নিজের ওপর প্রবল ঘৃণা

হচ্ছিল। যেন পারলে নিজের মুখেই নিজে থুতু ছেটাতো। রতন পাশ ফিরে শুলো।

বাচ্চাটার কান্না শুনে পাশ ফিরলো রতন। ঘরে দুর্গা নেই। রতন ডাকল, কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেলনা। বাচ্চাটার গায়ে হাত বুলিয়ে কান্না থামাবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। বরং রতনের আঙ্গুল টেনে নিয়ে বাচ্চাটা মুখে দিল, চুষতে লাগল এবং একটু পরেই আবার কাঁদতে শুরু করে দিল। রতন আস্তে আস্তে উঠল। ঘটিতে জল ছিল। ঘরের দেয়ালে একখণ্ড ছেঁড়া ন্যাকড়া ঝুলছিল। রতন ন্যাকড়াটা ঘটির জলে ভিজিয়ে বাচ্চাটার মুখে দিতে লাগল। ভেজা ন্যাকড়া মুখে থাকলে কান্নাটা কমে যায়। কিন্তু ন্যাকড়াটা তুলে নিলেই আবার কাঁদতে আরম্ভ করে। রতন কান্না থামাবার জন্যে বার বার তাই করে চলল।

কলাইয়ের থালা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল দুর্গা। রতন বলল, 'কোথায় ছিলি?' দুর্গার মুখে হাসি। সে বলল, 'পদ্মপিসির কাছে গেছলাম। তার ঘরেও সব বাড়ন্ত। চাট্টি জল দেওয়া ভাত ছিল দিয়ে দিল, তুমি খাবে।'

রতন ভিজে ন্যাকড়াটা ফেলে দিয়ে বলে উঠল, 'তাই দে বড্ড খিদে।'

ভাতের থালায় একগলা জল আর সামান্য ভাত। কতদিন ভাতের চেহারা দেখেনা রতন। থালা থেকে ভাত তুলে খেতে আরম্ভ করে দিল সে। বাচ্চাটা আবার আগের মতো কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু সেদিকে রতনের কোন হুঁশ নেই। গোটা তিনেক মুঠো ভাত মুখে দিতেই থালার ভাত ফুরিয়ে গেল। অপরাধীর মতো দুর্গার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই, তুই খাবি না।'

দুর্গা ঢোক গিলে নিয়ে বলল, 'তুমি ভাতটা খেয়ে নাও, আমি জলটুকু খাব।'

রতন থালাটা দুর্গার দিকে ঠেলে দিল। দুর্গা দু'হাতে থালাটা তুলে ভাতের জলটুকু চুমুক দিয়ে খেল। তারপর থালা থেকে খুঁটে

খুটে কয়েকটা ভাতের দানা তুলে নিয়ে মুখে দিল।

খানিকপরে রতন বলল, তোর বড্ড খিদে পায় তাই নারে তুগগা।'

তুর্গা জবাব দিলনা। রতন নিজেই আবার বলল, 'তুই পলাশ-ডাঙ্গায় চলে গেলেই পারতিস। যা হোক একমুঠো খুদকুড়ো তবু জুটতো।'

তুর্গা বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বলল, 'সোয়ামীর ঘরে উপোস করাও ভাল।'

রতন অবাক গলায় বলে উঠল, 'তাই বলে এত উপোস।'

তুর্গা একটা হাত রতনের পিঠের ওপর বোলাতে বোলাতে বলল, 'চটকলের কাজ পেয়ে গেলে তখন তো আর এত উপোস থাকবে না। তখন না হয় পেট ভরে খাইও।'

রতন বলল, 'কী খাবি ?'

তুর্গা রতনের পিঠে মুখ রেখে বলল, 'পোনা মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেতে আমার বড্ড ইচ্ছে হয় গো। চটকলে কাজ পেলে একদিন খাওয়াবে ?'

সেদিন আকাশে শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ। জ্যোৎস্নায় ভিজে আছে বটগাছের পাতাগুলো। খালের দিক থেকে হু হু করে ছুটে আসছে হাওয়া। খুশির জোছনা যেন উপচে পড়ছে গোটা বস্তিটার ওপর। সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। খিদেয় কাতরাতে কাতরাতে তুর্গা ঘুমিয়ে পড়েছে মেঝের ওপর। জ্বরটা সেরে গিয়ে আজ সকাল থেকে আবার জ্বর এসেছে রতনের। মাথাটা যন্ত্রণায় দপদপ করছে তো করছেই। তু'হাতে বার বার মাথা চেপে ধরেও সোয়াস্তি পাওয়া যাচ্ছেনা। গায়ে জ্বর বাড়ছে, তার ওপর থেকে থেকে পেট কচলাচ্ছে। তু'একবার বমির মতো দমক এল। জল ছাড়া গলা দিয়ে আর কিছুই বেরুল না। কীই বা বেরুবে। দানার মুখ দেখেনা শুধু জল ছাড়া পেটে আর কোন বস্তু নেই। অসহায় রতন দরজার গোড়ায় বসেছিল। চোখ বুঁজে আসছিল ক্লান্তিতে। কিন্তু

ঘুম আসছিল না। দু'হাতে মাথা টিপে চোখ বুঁজিয়ে বসেছিল। পদ্মপিসির ডাক কানে গেল। রতন চোখ খুলে দেখল তার সামনে পিসি।

রতন বলল, 'পিসি গো, আর বাঁচবো না। না খেয়ে খেয়ে দুর্গা আর আমি শেষ হয়ে যাব।'

পিসি চাপা গলায় বলল, 'বাঁচবার খবর দিতেই এলাম। আজ রাতে চালের বগি লাগবে। চৌকিতে পুলিশ মোটে তিনজন। পল্টুরা উল্টোদিক থেকে যাবে। তুই বস্তা নামাতে পারবি?'

রতন হতাশ সুরে বলল, 'আমার গায়ে জ্বর, গতরে মোটেও বল পাই না। আমার দ্বারা আজ রাতে কিছু হবে না পিসি।'

দাঁতে সুপুরি কাটতে কাটতে পিসি ভাবল। একটু পরে বলল, 'তাহলে তোর গিয়ে কাজ নেই। দুগগাকে ভোররাতে একবার পারলে পাঠাস।'

রতন বলল 'কোথায়?'

পদ্মপিসি বলল, 'আমি এসে ডেকে নিয়ে যাব। ওদের হয়ে কিছু একটা না করলে তো ভাগ পাবিনা। তাই তুই না পারিস আমি দুর্গাকে নিয়ে যাব। পল্টুর দলের সবাই তো বেপাত্তা। শুধু পল্টু আর জগা। আমরা না থাকলে মাল আনবে কেমন করে।'

শেষরাতে দরজায় টোকা দিয়ে পদ্মপিসি দুর্গাকে ডাকল। চালের আশায় দুর্গা রাত জেগে বসেছিল। পদ্মপিসি বলল, 'মাল নেমে গেছে। জঙ্গলের মধ্যে থেকে বস্তাগুলো খালপাড়ে নিয়ে যেতে হবে। পা চালিয়ে আয়।'

পদ্মপিসির পেছন পেছন দুর্গা বেরিয়ে গেল। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে রতন দেখল বটতলার পেছনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ওরা চলে যাচ্ছে।

ঘণ্টাখানেক কাবার হবার পরই সহসা রতনের মনে হল খাল-পাড়ের দিক থেকে পরপর তিনটি গুলির শব্দে ভেসে এল। রতন কানখাড়া করে রইল। তারপর আরও দুটো গুলির শব্দ, মানুষের

চিৎকার, দৌড়ঝাঁপ, কিন্তু কোনটাই ভাল করে বোঝবার আগেই রতন বাচ্চাটাকে ঘরে শুইয়ে খালপাড়ের দিকে দৌড়ে গেল। শরীরে শক্তি ছিলনা, দৌড়বার ক্ষমতাও নেই, তবুও কি একটা সর্বনাশা ভয় তাকে অসুরের শক্তি জোগাল। বটতলার গোপন পথটা রতনের জানা ছিল। সেই জঙ্গলের পথটা পেরিয়ে যেতেই সামনে পড়বে উঁচু জমি। মাটি, পোড়া কয়লার ছাই, রাজ্যের জঞ্জাল জমে জমে এ জায়গাটা দু'মানুষ সমান উঁচু খাড়াই। খাড়াই থেকে নিচে নামলেই খালপাড়।

রতন জঙ্গলটা পেরিয়ে খাড়াইয়ের নিচে যেতেই পেছন থেকে কে একজন তার হাত ধরে টানল। রতন মুখ ফেরাবার আগেই পণ্টুদা কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'পালিয়ে যা, দুর্গার পেটে গুলি লেগেছে, লাশ নিতে পুলিশ আসবে, ধরা পড়লে মরবি।'

রতনের হৃদপিণ্ড যেন থেমে গেল। সে শুধু বলল, 'কে ?'

পণ্টু বলল, 'দুর্গা, তোর বৌ, ওই দ্যাখ।'

চাঁদের আলোর কী দয়া, রতন দিব্যি দেখতে পেল, খাড়াইয়ের ওপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়তে পড়তে বুনো জঙ্গলের সঙ্গে আটকে আছে শাড়ি পরা একটা দেহ। স্থির চোখে ওই দৃশ্যটা দেখেই রতন 'দুর্গা' বলে চিৎকার করে দৌড়তে গিয়েছিল, কিন্তু পণ্টু তৎপর ছিল, সে জানত এ সময় এরকমই ঘটে। তাই ওর মুখ থেকে শব্দ বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই রতনের মুখ চেপে ধরে টানতে টানতে জঙ্গলের মধ্যে নামিয়ে নিয়ে গেল।

পাক্কা দু'দিন পরে মড়াকাটা ঘর থেকে দুর্গার কাটা ছেঁড়া করা শরীরটা রতন ফেরত পেল। ঘাটে নিয়ে গিয়ে দাহ করতে অনেক খরচ। একজন এসে রতনকে বোঝাল, 'যে যাবার সে তো চলেই গেছে। শুধু শুধু গুচ্ছের টাকা খরচ করে পোড়ানোর কী দরকার। তার চেয়ে লাশ আমায় দিয়ে দ্যান, উল্টে আমি বরং কুড়িটা টাকা দিচ্ছি। রতন লোকটার কথায় রাজী হয়নি। বাঁশের খাটিয়ায় দুর্গাকে নিয়ে এসে বস্তির ছেলেরা বড় রাস্তার বাজারের সামনে

নামাল। বলল, 'রতনদা, আপনি খাটিয়া ধরে বসে থাকুন, পারলে কাঁদুন। আমরা আশে-পাশে আছি।'

রতন বলল, 'কেন?'

বিশু বলল, 'খরচা তুলতে হবেনা। চাঁদা তুলে তো বিশ টাকাও হয়নি। ঘাট খরচ আছে, শ্মশান যাত্রীদের মালের খরচ আছে, ওখানে গিয়ে খাওয়া খরচ আছে।'

রতন কিছু বুঝতে পারল না। তবে এটুকু বুঝল দুর্গা মরে তাকে রেহাই দেয়নি। সে শুধু বলল, 'এত টাকা কোথায় পাব?'

বিশু বলল, 'আপনাকে দিতে হবে না, পাবলিক দেবে। শুধু মরা ধরে বসে বসে কাঁদুন।'

রতন ওদের কথামতো তাই করল। বাজারের পথ চলতি মানুষ যেতে যেতে সিকিটা, আধুলিটা ছুঁড়ে দিতে লাগল সাদা থান কাপড় ঢাকা দুর্গার শরীরের ওপর। বিশু শুধু হাত জোড় করে করে লোককে ডাকতে লাগল। রতন মনে মনে ভাবল, একমুটো ভাতের জন্য দুর্গা মরল, বেঁচে থেকে জানতে পারেনি তাকে ভালবাসবার জন্যে এ রাজ্যে এত লোক ছিল, এত দয়া মজুত ছিল।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা শরীর থেকে পচা গন্ধ বেরুতে লাগল। রতন ছেলেদের তাড়া দিল। গোটা রাস্তা ওরা দুর্গাকে নিয়ে গেল নানা জায়গায় নামাতে নামাতে। খানিকক্ষণ করে থামায় আর কিছু কিছু রোজগার বাড়ে। সন্ধ্যের মুখে ওরা শ্মশানে পৌঁছল।

শ্মশান থেকে রতন ফিরল একা। বারান্দায় ছেলে কোলে পদ্মপিসি দাঁড়িয়ে। বলল, 'চল, আমার ঘরে চল। পল্টুরা তোর জন্যে বসে আছে। পুলিশের চোখ বাঁচিয়ে লুকিয়ে এসেছে।'

পদ্মপিসির ঘরে এল রতন। ঘরের সবাই রতনের দিকে তাকাল। পল্টু বলল, 'রতন বোস।'

রতন বসে রইল। ওরা নানা কথা আলোচনা করল, রতনকে

বোঝাল, পুলিশকে খিস্তি দিল তারপর অন্ধকার হতেই একে একে চলে গেল। পিসি রতনের ছেলেটাকে ঘুম পাড়িয়ে তক্তোপোষে শুইয়ে দিয়ে পাশের ঘরে গেল। খানিক পরে এক থালা ভাত আর বাটিতে করে মাছের ঝোল এনে রতনের সামনে রেখে বলল, 'কদিন থেকে পেটে দানা পড়েনি। এটুকু তুই খেয়ে নে। বৌ মরলে সোয়ামাদের কোন নিয়ম মানতে হয়না।'

সাদা ভাতের থালা, পাতের ওপর বেগুন ভাজা, বাটিতে মাছের ঝোল—রতনের পেটের মধ্যে খিদে নামক জন্তুটা যেন প্রবল বেগে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ভাত আর মাছের গন্ধটা ঝড়ের বেগে যেন তার নাকে ঢুকছে। রতন এক মুহূর্ত দেরী করল না। ক্ষুধার্ত বাঘ যেমন করে হরিণ ছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমন করেই সে ভাতের থালাটা সামনে টেনে নিল। মাছের বাটিটা ভাতের ওপর ঢেলে দিল। ঝোল দিয়ে ভাতটা মাখতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময়ও দিতে চাইছিল না। প্রথম গ্রাসটা মুখে দিয়ে মাছের খণ্ডটা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে লাগল। কতদিন এই বস্তুটা সে দেখেনি। পদ্মপিসি বলল, 'দেখছিস কি? ওটা পোনা মাছ। তোরই শ্মশান খরচের চাঁদা থেকে কিনেছি।'

রতনের বুকের মধ্যে বাজ পড়ল। মনে হল জ্বলন্ত একটা কয়লার টুকরো কেউ যেন চেপে ধরে আছে তাব হৃদপিণ্ডের মধ্যে। পুড়ে যাচ্ছে, গোটা বুক দাউ দাউ করে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে।

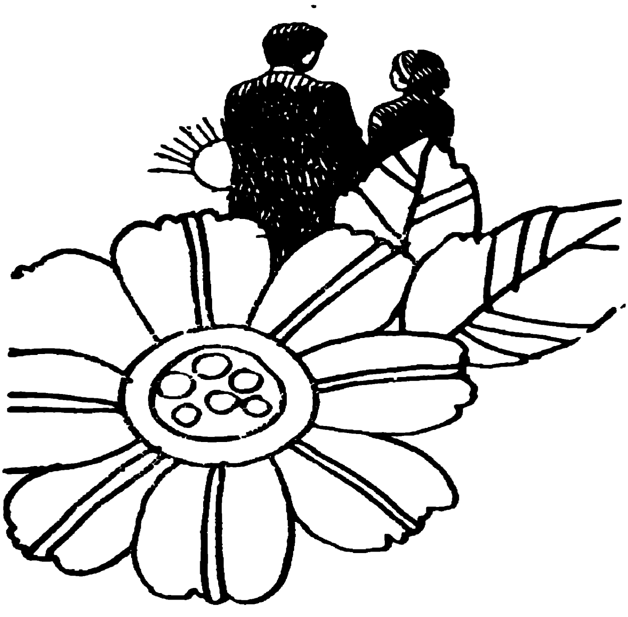
'পোনা মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেতে আমার বড্ড ইচ্ছে হয় গো। চটকলে কাজ পেলে একদিন খাওয়াবে।'

জীবনে এই একটি জিনিসই চেয়েছিল দুর্গা। অথচ ···

রতন আর পারল না। দু' হাতে ভাতের থালাটা মুখেব সামনে ধরে সহসা শিশুর মতো হাউ হাউ করে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

পদ্মপিসি জানল, গোটা বস্তির লোক জানল ছেলে কোলে নিয়ে রতন ফিরে গেছে তার গাঁয়ে। কিন্তু কদমগড়ে রতন ফিরে আসেনি। ছেলেকে নিয়ে পথে বার হয়েছিল। চেনা-অচেনা নানা পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে সে তার ছেলের জন্যে এমন একটা গ্রাম কিংবা শহর খুঁজছিল যে গ্রামে মধু গোঁসাই নেই, কিংবা যে শহরে পল্টুদের দল নেই। পদ্মপিসি বলে, ছেলে মানেই বাপের ভবিষ্যৎ। রতন জানেনা, তার এই ভবিষ্যৎকে সে কোথায় নিয়ে যাবে, কোথায় রাখবে, রেখে নিশ্চিন্ত হবে। এমন দেশ কোথায় যে দেশে ক্ষুধা নেই, গরীব নেই, গরীবদের ওপর জুলুম নেই—যেখানে দুর্গাদের জন্যে অকাল মৃত্যু নেই।

রতন সেই অচেনা স্বপ্নের দেশে যাবার জন্যে ছেলেকে কোলে নিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল।



ছোট গল্প

থানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হাঁটু ধরে এল দুর্গার। লোকটাকে একবার চোখের দেখাও দেখতে পেল না। বড়বাবু সেই কোন সকালে একবার বলেছিল 'যা যা, বাইরে দাঁড়া, ডাকবো। ডাকলে আসিস।'

সেই ডাকের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে কোমর ধরে এল।

ছ'মাসের ছেলেটাও নেতিয়ে পড়ে বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে গেছে। সকালের রোদে এখন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চেহারা বদলে ফেলেছে। এই রোদ মাথায় করে তাকে ঘরে ফিরতে হবে দেড় ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে। দুর্গার মধ্যে অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কী করবে সেটা বুঝে উঠতে না পেরে অসহায় দৃষ্টিতে আবার বড়বাবুর ঘরের দিকে তাকাল। এখান থেকে শুধু দরজার পর্দাটাই দেখা যায়। পর্দা না থাকলে হয়তো বড়বাবুকেও দেখা যেত। দুর্গা ভেতরে ভেতরে মরিয়া হয়ে উঠল। সিঁড়ির নিচের ধাপে দাঁড়িয়েছিল। এবার উঠে এসে বড়বাবুর দরজার দিকে এগোল। একটা সেপাই বন্দুক হাতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। দুর্গাকে হাগোড়ের মতো দেখছিল সেপাইটা। দুর্গা সেপাইটার দিকে তাকিয়ে ফিক করে একবার হাসল। সেপাইটার চোখ জোড়া ভাগাড়ের শকুনের মতো জ্বলে উঠল। দুর্গা সেপাইটার দিকে আর একবার তাকিয়ে হাসল এবং ওকে কিছু বুঝতে দেবার আগেই ঝপ করে বড়বাবুর ঘরে ঢুকে গেল।

কাজ করতে করতে বড়বাবু চোখ তুলে তাকাল। নাকের নিচে শুঁয়োপোকার মতো গোঁফ। হাসলে কালো-কালো দাঁত বেরিয়ে আসে। সেই দাঁত বার করে বড়বাবু, মানে বিপিন হাজরা একবার হাসল।

দুর্গা ঘুমন্ত ছেলেটাকে ঝটকা মেরে কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে বলল, 'কী গো, ডাকবে বলে সকাল থেকেই বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন? তা বেত্তান্তটা কি?'

বিপিন হাজরা গম্ভীর মুখে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'বেত্তান্ত খুব খারাপ দুগগা। তোর স্বামী ডাকাতির কেসে ধরা পড়েছে। খুব গণ্ড-গোলের ব্যাপার।'

দুর্গা তীক্ষ্ণ চোখে বড়বাবুর দিকে তাকাল। বড়বাবুর চোখ আটকে রইল দুর্গা বাউরীর বুকের দিকে। দুর্গা বুঝতে পারল, একটা শকুনের চোখ তার বুকে খোঁচা মারছে। কিন্তু গায়ে মাখল না। সে জিজ্ঞেস করল, 'ডাকাতিটা হোল ক্যামনে?

বড়বাবু চোখ সরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'ওই তো পাঁচঘরায়, মল্লিকদের চালের গো-ডাউনে।'

দুর্গা এবার সামনে চেয়ারে বসে পড়তে পড়তে বলল, 'পাঁচ ক্রোশ দূরে ডাকাতি হল, আর তুমি এসে ধরলে আমার মরদরে। কাল রেতের বেলা তো ও আমার সঙ্গে শুয়ে ছিল।'

বড়বাবু সহানুভূতি মেশানো গলায় বলল, 'সে সব তো কোরটে গিয়ে প্রমাণ হবে। আমরা যেমন যেমন খবর পেয়েছি তেমন তেমন ধরেছি! তবে তুই ভাবিস না, তোর স্বামী নির্দোষী হলে নিশ্চয়ই খালাস পেয়ে যাবে। আমি নিজে খালাস করে দেব, তুই কিছু ভাবিস না।'

দুর্গার বুকের মধ্যে আগুন জ্বলছিল। নিজেকে শান্ত করতে করতে বলল, 'তা আজই কেনে খালাস করে দাও না।'

বড়বাবু হেসে ফেলল। টেবিলের ওপর থেকে রুলটা তুলে নিয়ে আলতো করে দুর্গাকে একটা খোঁচা দিয়ে বলল, 'এসব আইনের ব্যাপার। এখান থেকে বেরুতে হলে অনেক ফন্দি ফিকির করতে হয়, অনেক ভেবে চিন্তে উপায় বার করতে হয়। তুই এখন ঘর যা, আমি বিকেলে বাগদী পাড়ার হাটে যাবো, তখন তোর ঘরে গিয়ে তোকে উপায় বাতলে দেব।'

দুর্গা উঠে দাঁড়িয়েছিল। বড়বাবু পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার করে দুর্গার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'সোয়ামী-তো এখন লক-আপে। রোজগারও বন্ধ। এই টাকাটা দিয়ে কিছু কিনে নিয়ে যা। আমি বিকেলে যাবো।'

টাকা পাঁচটা আঁচলে বেঁধে ফিরে আসছিল দুর্গা। পাথুরে পথে রোদ বাড়লে হাঁটতে বেজায় কষ্ট হয়। কোলের ছেলেটা রোদের তাপে জেগে উঠে কান্না জুড়ে দিয়েছে। ওকে নিয়ে পথ চলতে আরও বেশি কষ্ট হচ্ছিল দুর্গার। তবুও থেমে থাকবার উপায় নেই। মাথার ওপরে সূর্যের কড়া চোখ থেকে যেন আগুন ঝরে পড়ছে। হাঁটতে হাঁটতে তার স্বামীর কথা ভাবছিল। লোকটাকে একবার চোখের দেখাও দেখতে পেল না সে। লোকটা গোঁয়ার, খুব জেদি সে কথা বাউরী পাড়ার সবাই জানে। তাই বলে পাঁচঘরায় ডাকাতি করতে সে যাবে না। চুরি-ডাকাতি কোন কালেই করেনি। ফরেসটের মধ্যে ঢুকে মাঝে-সাঝে কাঠ কেটে আনে। সেতো পেটের দায়ে। বাউরীদের ঘরের সব মরদরাই সেটা করে। ওটাকে চুরি বলে না। আর যায় জঙ্গলে শুয়োর ধরতে, বুনো শুয়োর ধরা হিম্মতের ব্যাপার। যে সে মরদের কাজ নয় সেটা। এ তল্লাটের সবাই জানে, তার সোয়ামীর মতো শুয়োর ধরতে পারার হিম্মত কারো নেই। সেটাও তো রোজ-রোজ হয় না। বছরে দু' তিনবার শুয়োর ধরা পড়ে। সেটা তো একটা উৎসবের মতো। শুয়োরের মাংস বিক্রি করে নগদ টাকা পাওয়া যায়। সেই টাকায় চাল আর হাঁড়িয়া কেনে সীতারাম। গরম গরম ভাতের সঙ্গে শুয়োরের মাংস, আহা, জিভে জল এসে যায় দুর্গার। ঢোক গিলে জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটে। জিভে ঘামের নোনতা স্বাদ লাগে।

তার মনে পড়ে, হিম্মতটা একটু বেশিই সীতারামের। গরীব লোকের অত দেমাক ভালো নয়। কিন্তু কথা কানে নেবার মানুষ নয় সীতারাম। কিছু বললেই সাথে সাথে ঘাড় ফুলিয়ে বাঘের মতো চোখ পাকিয়ে [illegible] কারে রে শালা। গতর খাটিয়ে

রোজগার করি। অন্যায় বললে শুনবো কেন? সেদিন শালা দারোগাবাবু মুফতে মাংস নিতে এলো। আমি বললুম দিবো নি। আমাকে ভয় দেখাল। আমার অবার ভয় কিসেব? আমার কুনো ধান্দা নেই।'

দুর্গা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলে, তোর বাপু কথাবার্তার ঢং ভালো না। জোতদারবাবুরে সেদিন কত কথা বললি।'

সীতারাম আগের মতোই বলে ওঠে, 'বলবোনি কেন? বেগার খাটাতে চায়। আমি ওর মধ্যি নেই। গাযে খাটব, খাটনীব পর পয়সা দিতে হবে। মিঠে কথায পেট ভরে না।'

দুর্গা ভয়ের গলায় বলে, 'ওরা ধনী মানুষ, মানী লোক।'

সীতারাম বিড়ি খায় না। সিগাবেট খাওয়া তার অভ্যাস। সে সিগারেট ধরিয়ে বলে, 'তাতে আমাব কী। তার টাকা তাব কাছে। রোয়াব ছাখাবে কেন? আমি কারো রোয়াব সইবো না। আমার সাফ-সুফ কথা ব্যস্!

ন্যাড়া পাহাড়ের পাশ দিযে হাঁটতে হাঁটতে দুর্গার মনটা উথাল-পাথাল হয়। এই পাহাড়েব ভেতবে অনেকটা ফাঁকা জাযগা আছে। একটা বিশাল গর্তের মতো। জায়গাটা খুব ঠাণ্ডা। সীতারাম বিয়ের পর দুর্গাকে নিয়ে একবার এসেছিল ওখানে। না এসে করবে কি! মেলা থেকে ফেরাব পথে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এল। এই উদোম মাঠে তারা তখন যায় কোথায়। অগত্যা মাথা বাঁচাতে এখানে। চারপাশে কালো পাথরের দেওয়াল। যেন রূপকথার কারাগার। ভেতরে ঢুকলে দিনমানেও আঁধার আঁধার লাগে। এখানে এসে চারপাশে তাকিয়ে ভয় করছিল দুর্গার। সীতারামের গায়ের সঙ্গে লেপটে দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটা আস্তে আস্তে যেন তেতে উঠল। এখনও বুকের মধ্যে রক্ত ছলছল করে ঢেউ তোলে। বেহায়া মরদটার যেন কোন ভয়-ডর নেই। পাহাড়ের গর্তের মধ্যেই দুর্গাকে জাপটে ধরে দুস্যিপনা করতে শুরু করে দিল। মন ভেসে গেল দুর্গার। পাথরের বিছানাও যে এত সুখের হয়, সে কথা দুর্গা সেদিনই প্রথম

জানল।

পাহাড়টা পেরিয়ে এসেছিল। পেছন ফিরে তাকাতে গিয়ে বুঝল তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। রোদের তাপে বাবুয়াটা গলা চিরে কাঁদতে আরম্ভ করে দিয়েছে। আঁচলের আড়াল দিয়ে বাবুয়াকে ঢেকে ঘরে ফিরে এল দুর্গা।

বিকেলে বড়বাবু এল না। সন্ধ্যের মুখে মুখে উঠোনে বলাফল-তলায় লম্বা ছায়া পড়ল। দুর্গা দেখল বাড়বাবু আসছে। দুর্গা চাটাইয়ের ওপর বাবুয়াকে শুইয়ে দিয়ে বাইরে এল। বড়বাবু পিক করে পানের পিক ফেলল। বলল, 'আসতে দেরী হয়ে গেল রে।'

দুর্গা বলল, 'তবুতো এলেন। আসেন কেনে, ভিতরে আসেন।' বড়বাবু ঘরে ঢুকতে যাবার আগে বারান্দার চাটাইয়ের দিকে তাকাল। ছেলেটা হাত-পা নেড়ে কাঁদছে। তীক্ষ্ণ গলা। বুকে বোধ হয় সর্দি জমেছে। ঘড়ঘড় আওয়াজ উঠছে। বড়বাবু ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'তোর ছেলেটাতো বড্ড চ্যাচায়।'

দুর্গা বাবুয়াকে কোলে তুলে নিল। বড়বাবু ঘরে ঢুকে চৌকির ওপর পা ঝুলিয়ে বসেছে। চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলল, 'সীতারাম, মানে তোর মরদ তো বেশ সৌখিন। ঘরে শোবার জন্যে তক্তোপোষও রেখেছে।

দুর্গা জবাব দিল না। বড়বাবু সিগারেট বার করে ধরাল। নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর বলল, 'টাকাটা যে দিলাম, তা দিয়ে কিছু কিনেছিস তো?'

দুর্গা বলল, 'কিনব না কেন। না কিনলে খাব কি?'

বড়বাবু সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'সারাদিন যা ধকল যাচ্ছে সীতারামকে নিয়ে। তা, তোর ঘরে হাঁড়িয়া আছে? একটু চাঙ্গা হওয়া যায় তাহলে।'

দুর্গা ঠোঁট বাঁকাল। মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, 'ঘরে দানা-পানি নেই উনি হাঁড়িয়া খুঁজছেন। আসল কথাটা বল না, ওকে কবে ছাড়বে।'

বড়বাবু পা দোলাতে দোলাতে বলল, 'ব্যবস্থা প্রায় সবই করে ফেলেছি। দেখি কত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া যায়।'

দুর্গা বড়বাবুর পায়ের কাছে বসল। বুট জুতোর তলায় ধুলো আর কাদার শুকনো দাগ, পা দুটো দুলছে দুর্গার থুতনীর কাছে। দুর্গা দু'হাতে পা দুটো ধরল। বলল, 'ও না এলে আমাদের উপোস করে মরতে হবে। তুমি ওরে ছেইড়ে দেবাব ব্যবস্থা করো।' বড়বাবু স্থির চোখে তাকাল। পায়ের নিচে দুর্গা বাউবির ভরা বুক। মেদহীন নিভাঁজ শবীর। চওড়া পিঠ আর চকচকে চোখ। সব মিলিয়ে একটা আদিম আকর্ষণ। বিপিন হাজরার বুকের মধ্যে রক্ত ঢেউ আছড়ে পড়তে থাকে। নিজের বৌটা দু'বছর হল বাতের ব্যাধিতে পঙ্গু। দেয়াল ধরে ধরে চলাফেরা করে। বরফ চাপা ইলিশ মাছের মতো ফ্যাকাসে চোখ-মুখ। বিপিন হাজরার শরীর থেকে আগুন ঝরতে থাকে। তক্তোপোষ থেকে লাফ দিয়ে নেমে দুর্গার পাশে বসে ওর কাঁধে হাত রেখে বলে, 'তোর ভয় নেই। আমি একটা ব্যবস্থা করবই। তুই আরও পাঁচটা টাকা রাখ।'

দুর্গার চোখেব ওপর চোখ রাখে বড়বাবু। টাকাটা ধীরে ধীরে বার করে। ওর হাতে গুঁজে দিয়ে আস্তে আস্তে চলে যায়।

বড়বাবুর দয়া দেখে দুর্গা মনে মনে অবাক হয়। এতটা সে আশা করেনি।

কিন্তু পাঁচ টাকার পরমায়ু বেশি নয়। টাকা ফুরিয়ে যেতেই পেটে টান পড়ে। ফরেসটের ধারে চোরের মতো ঘোরে দুর্গা, যদি কিছু হাতিয়ে আনা যায়। ভোররাতে শুয়োর মেরে ফেরে লখিয়ারা। বাজারে মাংস বেচে হাঁড়িয়া খেয়ে নাচতে নাচতে ফিরে আসে লখিয়া আর লখিয়ার বৌ। বলাফলতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুর্গা ওদের ছাখে। বুকের মধ্যে একটা কষ্ট টনটন করে ওঠে। দুর্গাকে দেখতে পেয়ে লখিয়া এগিয়ে এসে বলে, 'তোর বড়বাবু শালা হারামজাদা। সীতারামকে সদরে চালান করে দিয়েছে। ও আর আসছে না।'

বুকের মধ্যে বজ্রপাত হয় দুর্গার। মনে হয় এখনই ছুটে বড়বাবুর কাছে যায়। কিন্তু বাবুয়ার কথা ভেবে দমে যায়। ছেলেটার বুকে সর্দি জমেছে। গায়ে জ্বর। বাকস পাতার রস ছেঁকে খাইয়েছে কিন্তু জ্বর কমছে না। ওকে নিয়ে থানায় যাওয়া চলে না। রোদের তাপে ছেলেটা মাঝপথেই মরে যাবে। বারান্দায় বসে বসে আকাশ পাতাল ভেবে চলে দুর্গা। বলাফলতলায় সাইকেলের ঘন্টি বাজে। মুখ ফেরাতেই সে দেখতে পায় রাংচিতার বেড়ার ধারে সাইকেল থেকে বড়বাবু নামছে। দুর্গা ছুটে যায়। বড়বাবুর মুখ দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। দুর্গা দু'হাতে সাইকেল চেপে ধরে বলে, 'এই বড়বাবু, তুমি নাকি আমার মরদরে সদরে চালান করে দিয়েছ?'

বড়বাবু সাইকেলটা বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে বাঁ হাতটা দুর্গার কাঁধে রাখে। দুর্গা এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলে, 'সত্যি করে বল. আমার সোয়ামীরে কোথায় পাঠিয়েছ?'

বড়বাবু সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে, 'আজে বাজে কথা শুনে আমায় দুষছিস কেন? ব্যাপারটা শোন।'

দুর্গা কোমরে হাত দিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। বলল, 'বল কি বলবে?' ঘরের ভেতর থেকে বাবুয়া চিৎকার করে কেঁদে চলেছে। বড়বাবু বিরক্ত মুখে সেই দিকে তাকিয়ে বলল, 'সদর থেকে তোর ঘরে তোর মরদকে এনে দিতে আমার দু'ঘণ্টাও সময় লাগবে না। তবে সামান্য কিছু ঝামেলা আছে।'

দুর্গা চোখ পাকিয়ে বলল, 'কী ঝামেলা?'

বড়বাবু দুর্গার কাছে সরে এসে পরামর্শ করার ভঙ্গিতে বলল, 'ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে তো, তাই কয়েকজনকে কিছু টাকা খাওয়াতে হবে। টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে তোর মরদকে ছাড়িয়ে আনতে হবে।'

দুর্গা একই ভঙ্গিতে বলল, 'কত টাকা?'

বড়বাবু দুর্গার সারা গায়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'তা হাজার টাকা তো লাগবেই।'

দুর্গা নিস্তেজ হয়ে এল। হাজার টাকা সে সারা জীবনে চোখেও দেখেনি। কোমর থেকে তার হাত খসে পড়ল। বেড়ার গায়ে শরীরটা এলিয়ে দিতে গিয়ে সে হঠাৎ কেঁদে ফেলল।

বড়বাবু ওর পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলল 'কাঁদিস না, টাকার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। ও জোগাড় হয়ে যাবে।'

ভেজা চোখে দুর্গা মুখ ফেরাল। বলল, 'ক্যামনে হবে।'

বড়বাবু নিজের বুকে ঘুঁসি মেরে বলল, 'আমি দেব। তোর সুখের জন্যে আমি হাজার টাকা দেব।'

দুর্গা অবিশ্বাসের চোখে বড়বাবুর দিকে তাকাল। বলল, 'তোমার টাকা আমি শুধবো কেমন করে।'

বড়বাবুর মধ্যে একটা ছটফটানি হচ্ছিল। মনে মনে বলল, 'তোর এত শোধের চিন্তা কেন। আমিই তো শোধ তুলে নেব।'

কিন্তু মুখে বলল, 'সে সব পরে ভাবা যাবে। এখন ঘরে চল আরও কথা আছে।'

চৌকির ওপর পা ঝুলিয়ে বসল বড়বাবু। ডাকাতি কী জিনিস সেটা বোঝাল। সদরে বিচার হলে কী হবে সেটা বলল। তাবপর বলল যদি ফাঁসী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী, কেননা মল্লিকদের দরোয়ানটা ডাকাতদের হাতে মারা পড়েছে, তাহলে কী কী হবে সব খুঁটিযে খুঁটিয়ে বড়বাবু বোঝাল।

দুর্গা নিশ্বাস বন্ধ করে সব শুনল। হাজারটা টাকা পেলে তার সোয়ামী বেঁচে যাবে। বড়বাবু নিজে হাজার টাকা দেবে। টাকাটা পরে শোধ দিলেও হবে। আগে তো সোয়ামী বাঁচুক। বড়বাবু প্যাণ্টের পকেট থেকে বোতল বার করে মদ খেল। দুর্গাকে কাছে ডেকে বলল, 'হাজারটা টাকা অমনি অমনি দেওয়া যায় না। কিছু একটা বাঁধা রাখ।

দুর্গা অসহায় ভাবে বড়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাদের এমন কী আছে যা বাঁধা রাখব।'

বড়বাবু আরও খানিকটা মদ গিলে বলল, 'তাহলে তুই বাঁধা থাক।'

দুর্গা বলল, 'বেশ আমি তোমার বাড়িতে গায়ে খেটে টাকা শোধ দেব।'

বড়বাবু দুর্গার হাতটা টেনে নিয়ে বলল, 'পাগলামো করিস না। স্বামীর এতবড় বিপদে যা বলছি তাই কর। কেউ জানতে পারবে না। এতে পাপ নেই। এতে পুণ্যি হয়। যা করছিস সব স্বামীর জন্যে। হাজারটা টাকা কি চাট্টিখানি কথা। আয়, ওপরে আয়।'

দুর্গা ভেতরে ভেতরে কাঁপছিল। যেন ফাঁসীর দড়ির সামনে সীতারাম দাঁড়িয়ে। দুর্গার দু' দণ্ড দাঁড়াবার সময় নেই। বড়বাবুর হাত তার শরীরে আতিপাতি করছে। চোখের সামনে ফাঁসির দড়ি ঝুলছে। দড়ির সামনে সীতারাম। দুর্গা চৌকির ওপর উঠে এলো। বাবুয়া তারস্বরে কাঁদছে। ফুঁ দিয়ে পিদিম নেভাল বাড়বাবু। ঘর জুড়ে অন্ধকার থই থই করছে। অন্ধকারে চাবুকের মতো বাবুয়ার কান্না। বড়বাবু বুনো শুয়োরের মতো ঘোঁত ঘোঁত করে বলল, 'তোর ছেলেটাতো বড্ড জ্বালাচ্ছে। ওটাকে নিচে নামিয়ে দি।'

বড়বাবু বেড়াল ছানার মতো অন্ধকারে বাবুয়াকে চৌকির নিচে নামিয়ে দিল। একটা তেলচিটে বালিশ এগিয়ে দিয়ে দুর্গা বলল, 'এইটা ওর মাথায় দাও।'

বড়বাবু বালিশটা নিয়ে অন্ধকারে চৌকির নিচে ছুঁড়ে দিল।

দুর্গা অন্ধকারে সীতারামকে ভাবতে ভাবতে চোখ বুজল।

খানিক বাদেই চৌকির ওপর উঠে বসল বড়বাবু। সিগারেট ধরাবার জন্য দেশলাই জ্বালাল। সেই আলো দিয়ে পিদিমটাও জ্বেলে দিল। দুর্গা লাফ দিয়ে নিচে নামল। বাবুয়ার কান্না থেমে আছে অনেকক্ষণ। নিচে নামতেই তার বুক কেঁপে উঠল। বাবুয়ার মুখের ওপর একটা বালিশ। শরীরটা এলিয়ে পড়ে আছে। মুখের বালিশ সরাতেই তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। বাবুয়ার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে নেতিয়ে গেছে। চোখ দুটো তখনও খোলা।

চৌকির নিচে বাবুয়ার শরীরটা ছ'হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে দুর্গা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

ব্যাপারটা বুঝতে কয়েক মিনিট সময় গেল বিপিন হাজরার। রাতের বেলা কান্না শুনে যদি বাউরী পাড়ার লোকেরা ছুটে আসে তাহলে···বড়বাবু ভেতরে ভেতরে ঘামতে আরম্ভ করল। দুর্গার মুখে হাত চাপা দিয়ে কান্নাটা থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এখন আর কেঁদে কী করবি। সবই ঠাকুরের লীলা! যা ওকে এখনই মাটি চাপা দিয়ে আয়!'

দুর্গা বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি ওর মুখে বালিশ চাপা দিয়েছ।'

বড়বাবু ঢোক গিলে বলল, 'এখন এই সব নিয়ে একদম গোল করিস না। লোকজন এলে আমিই তোকে থানায় নিবে যাব ছেলে খুন করেছিল বলে। দেখবি পয়সার লোভে সবাই তোর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। যা ভালয় ভালয় ওকে মাটি চাপা দিয়ে আয়!'

দুর্গা চোখের জল মুছে বড়বাবুর দিকে তাকাল। বলল, 'আমার হাজার টাকা কোথায়?'

বড়বাবু দুর্গার থুত্‌নী নেড়ে বলল, 'যখন কথা দিয়েছি তখন কথা মতো কাজ হবে। তবে একবারেই কি হাজার টাকার শোধ হয়রে পাগলি। আরো কয়েক রাতে আসতে হবে।'

দুর্গার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। তবুও ঠোঁট টিপে সুন্দর করে হাসল, বলল, 'যতবার খুশি এসো। আজ রাতটাও থেকে যাও না কেনে। আমি তোমার জন্যে হাড়িয়া নিয়ে আসি।'

বিপিন হাজরা আবেগে আর আহ্লাদে দুর্গাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'হাঁড়িয়া আছে?'

দুর্গা ভেজা চোখ নাচিয়ে বলল, 'একটু বসো কেনে। আমি বলাফলতলায় বাবুয়াটাকে মাটি দিয়ে আসি।'

বলাফলতলায় মলিন জ্যোৎস্নার আলো। জঙ্গলের ওদিক থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে আসছে। দূরে কোথাও মাদল বাজাচ্ছে

সাঁওতালরা। শিব পাহাড়ের ওপাশে লোহা কলের চিমনীর লাল আগুন। বলাফলতলায় বাবুয়াকে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল দুর্গা। বারান্দার বেড়ার গায়ে শুয়োরের মাংস কাটার অস্ত্রটা। বেড়ার গা থেকে ওটা তুলে নিতে নিতে দুর্গা একবার বাবুয়ার দিকে তাকাল তারপর সোজা ঘরে এসে চৌকির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা বিপিন হাজরার গলার ওপর সজোরে আঘাত করল।

একটা থ্যাতলানো কণ্ঠস্বর ঘরের মধ্যে চিৎকার করে উঠে পরক্ষণেই চিরতরে থেমে গেল। দুর্গা স্থির চোখে দাঁড়িয়ে থেকে দৃশ্যটা দেখল। বাইরে এসে নিজের কাপড়টা খুলে বাবুয়াকে ভাল করে ঢেকে দিয়ে বলল, তুই ঘুমা বাবা, ঘুমা, আমি আজ হাটে শুয়োরের মাংস বেচে আসি—

আকাশে প্রথম আলো ফোটার মুহূর্তটি বাউরী পাড়ার হৃদপিণ্ডকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। সবাই দূরে দাঁড়িয়ে সভয়ে দেখল সীতারাম বাউরীর বউ দুর্গা বাউরী আদুল গায়ে একটা মুণ্ডহীন মানুষের দেহ টানতে টানতে বাউরী পাড়ার হাটের দিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করছে। গোটা পাড়ার মানুষজন ঘুম ভাঙা চোখে তাকিয়ে দেখছে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য। যেন গোটা গ্রামটি সমস্ত মানুষের হৃদপিণ্ডকে কাঁপিয়ে দিয়ে থেকে থেকে দুর্গা বাউরীর উন্মত্ত কণ্ঠস্বর হেঁকে উঠছিল, শুয়োরের মাংস নেবেগো, শুয়োরের মাংস— ।'

ঘড়ির অ্যালার্ম বেজে উঠল।

শব্দটা থেমে থেমে বেজে উঠছিল। জলের তলায় ডুব দিয়ে থাকলে নদীর পাড়ের কোলাহল যেমন ফিকে শোনায় ঠিক তেমন ভাবেই শব্দটা শুনল অতনু। নোনা জলের তলা থেকে ওপরে ভেসে ওঠার মতো আস্তে আস্তে ঘুমের ভেতর থেকে সে জেগে উঠল। জেগে উঠেই মনে পড়ল আজ রবিবার এবং আজই সকালে তার জগন্নাথ বড়ালের বাড়িতে যাওয়ার কথা।

অতনু প্রথমে বাঁ হাত দিয়ে ঘড়ির শব্দটা থামাল। বিছানায় উঠে বসতে টের পেল পাশের ঘরের দরজা খুলে মা বেরোচ্ছেন। রবিবারে এত সকালে মা'র ওঠার কথা নয়, তবুও মা ঘুম থেকে উঠেছে শুধু তারই জন্য। তার মানে মা মনে রেখেছে অতনু আজ ভোরে জগন্নাথ বড়ালের কাছে যাবে।

সকালের নরম রোদ, মায়ের সদ্য ঘুম ভাঙা ফোলা-ফোলা মুখ আর নিমগাছের মাথায় এক দঙ্গল পাখির কলরব শুনতে শুনতে অতনু ভাবল, আজকের সকালটা ভারী সুন্দর। মুখ ধুতে গিয়ে সে টের পেল তার চোখ জ্বালা করছে, জল সহ্য করতে পারছে না। পুরো ঘুম না হলে অতনুর এরকম হয়। আরও অন্তত ঘণ্টা খানেক যদি অঘোরে ঘুমনো যেত তাহলে শরীরটা বেশ ঝরঝরে বোধ হতো। কিন্তু আজ আর সে উপায় নেই। আজ সাত সকালে গিয়ে জগন্নাথ বড়ালকে ধরতেই হবে। বড়মামা অনেক কষ্টে একটা চাকরীর ব্যবস্থা করেছে, জগন্নাথ বড়ালের কাছে প্রথমে কাজটুকু করিয়ে আনতে না পারলে শেষ পর্যন্ত সেটাও হাতছাড়া হয়ে যাবে।

রাস্তায় বেরিয়ে অতনু দেখল গোটা ষ্টেশন রোডটা তখনও আধভাঙা ঘুমে। দোকানপাট বিলকুল বন্ধ, জনকয়েক লোক

হেঁটে যাচ্ছে সকালের ট্রেন ধরবে বলে। দু'চারজন ভ্রমণবিলাসী রাস্তায় হেঁটে চলেছে উদাসীনভাবে। চারপাশে কোথাও কোন ব্যস্ততা নেই। শুধু অতনুর মধ্যেই একটা ব্যস্ততা টকবগ করে ফুটছিল। বড় রাস্তায় এসে বাসের জন্য দাঁড়াল। বাসে গেলেই সুবিধে। তেঁতুলতলা স্টপেজে নেমে মিনিট তিনেক হাঁটলেই জগাদার বাড়ি। সাত সকালে জগাদাকে ধরে কাজটুকু করিয়ে নিতে পারলে কালই বড়মামার অফিসে গিয়ে জমা দিয়ে আসতে হবে। তারপর দিন সাতেকের মধ্যেই হাতে-হাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। কথাটা ভেবেও সুখ পায় অতনু। গত পাঁচ-পাঁচটা বছর ধরে দরখাস্ত লিখে আঙ্গুলে কড়া পড়ে গেল অথচ একটা যেমন তেমন চাকরীও জুটল না। আর বছর দেড়েকের মধ্যেই বাবা রিটায়ার করে ঘরে আসবেন অথচ এখনও অতনু নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারল না। বাবা মুখে কিছু বলেন না, কিন্তু তার মুখ দেখলে বোঝা যায়, তিনিও অতনুর মতো কেবল ভেবে যাচ্ছেন। ভেবে যাওয়া আর চিন্তায় চিন্তায় ঘেমে ওঠা ছাড়া কিই বা করবার আছে অতনুর। গায়ের জোরে কিংবা বুদ্ধিতে চাকরী মেলে কিনা সে কথা অতনু জানে না। মুরুব্বির জোর থাকলে হয়তো মিলিতে পারে, কিন্তু সে জোর অতনুর নেই। মা প্রায়ই তাগাদা দিত অতনুকে, বলত, 'বাড়িতে বসে না থেকে একবার যা না বড়দার কাছে, মুখ ফুটে বল না নিজের অবস্থার কথা। নিজে না পারিস আমায় নিয়ে চল, আমি বলব। আমার কথা বড়দা ফেলতে পারবে না।'

বাবা মনে মনে চাইতেন না চাকরীর উমেদারী করতে আমি বড়মামার কাছে যাই। কিন্তু বাবা না চাইলেও মা'র জন্য একদিন যেতেই হল। ট্যাংরার কাছে শীল লেনে বড়মামার ফ্ল্যাট। দিব্যি সাজানো গোছানো ঝকঝকে ঘর-দোর। রিকসা থেকে নেমে সরাসরি যাবার উপায় নেই। দরজার গায়ে বেল লাগানো। বেল টিপলে চাকর এল। মা চাকরকে উপেক্ষা করার ভঙ্গিতে ওপরে উঠে গেল। পেছন পেছন অতনু। ছোটবেলায় কখনও এ বাড়িতে

এসেছে কিনা অতনুর মনে পড়ল না। কিন্তু খানিকক্ষণের মধ্যে সে টের পেল অতনুদের জন্যে একটা শীতল উপেক্ষা ছড়ানো রয়েছে। বড়লোক আত্মীয়দের কাছে গরীব বা নিম্নবিত্তরা যেমন ঠাণ্ডা আতিথেয়তা পায়, ওরাও তেমন পেল। মা ভেতরে ভেতরে অস্থিরবোধ করছিল, কিন্তু অতনুকে সেটা পেতে দিল না। পুরো পাছা ডুবে যায় এমনই নরম সোফা। অতনু সন্তর্পনে বসল। মায়ের হাতে মিষ্টির বাক্স। মা 'বৌদি বৌদি' বলে রান্নাঘরের দিকে গেল। আর বড়মামীমা বেরোলেন বাথরুম থেকে। মাকে দেখে বড়মামী হাসলেন। খুবই সংক্ষিপ্ত হাসি। শীতের দিনে ঠোঁট ফাটলে যেমন করে মানুষ হাসে, বড়মামীর হাসিটা সেই রকম দেখাল। বড়মামা দাড়ি কামাতে কামাতে ডাকলেন, 'কে, বুড়ি এসেছিস নাকি?'

মার ডাক নাম বুড়ি। বড়মামা এখনও সেই নামেই ডাকে। বড়দার ডাক শুনে মা মিষ্টির প্যাকেটটা বড় মামীমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বৌদি ধর। বড়দা ডাকছে শুনে আসি।'

বড়মামী মিষ্টির প্যাকেটটা নিয়ে ফ্রিজের মাথায় রেখে দিল। অতনু যে ঘরের মধ্যে বসে আছে সেটা তার নজরেই এল না। একটু পরে সাদা ধবধবে একটা কুকুরছানা বুকে নিয়ে রুবি এল। বড়মামার মেয়ে। পরনে জিনের প্যাণ্ট, গায়ে গোলাপী রঙের গেঞ্জি। গেঞ্জির বুকে কী সব লেখা। অতনুকে দেখে রুবি 'হাই' বলে ডেকে উঠল। অতনু ভেবেছিল 'হাই' বলার পর রুবি আরও কিছু বলবে টলবে, কিন্তু রুবি তার কুকুর নিয়ে বেজায় ব্যস্ত বলে অতনুকে আর কিছু বলার সুযোগই পেলনা। এক পলকের জন্যে ঝড়ের মতো ঘরে এল দীপঙ্কর, অর্থাৎ দীপু। বড়মামার বড়ছেলে, অতনুর চাইতে বছর তিনেকের বড়। বার চারেক কলেজ পাল্টে এখন সিটি কলেজে স্থির হয়েছে। অনেককাল থেকে অতনু জানে দীপু বি এ পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু পাশটা করে উঠতে পারছে না কেন কে জানে। দীপু ঘরে ঢুকে অতনুকে দেখে অবাক হবার

ভান করে বলল, 'আরে তুমি, কতক্ষণ এসেছ।'

অতনু জবাব দিল, 'এই এলাম।'

দীপু হাতের রেকর্ডটা দেখিয়ে বলল 'বিটলদের গান শুনবে নাকি, ফ্যানটাসটিক।'

অতনু ঘাড় নেড়ে 'না' করল। দীপু রেকর্ডটা অতনুর মুখের সামনে তুলে ধরে বলল, 'দারুণ জিনিস মিস করলে।'

রেকর্ডটা নিয়ে দীপু পাশের ঘরে ঢুকে গেল। রুবির কুকুর ওর বুকের আশ্রয় ছেড়ে ছুটে চলে এসেছে এই ঘরে। ঘরে ঢুকেই অতনুর পা শুঁকতে লাগল। অতনু ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। কুকুর দেখলেই ওর বড় ভয়। কুকুরটা লাফিয়ে সোফার ওপর উঠল আর অতনুর বুক দুরদুর করতে করতে মনে হল, কামড়ালেই তলপেটে চোদ্দটা ইনজেকশন। বে আদব কুকুরটা অতনুর সর্বাঙ্গ শুঁকছে। যেন অতনু রাস্তায় পড়ে থাকা একটা বেওয়ারিশ মাল। মামার বাড়ির কুকুর তাই অত্যাচার আর আবদারটা একটু বেশি। দুটো ফলন্ত বুক নাচাতে নাচাতে রুবি ঘরে এল। গেঞ্জিটা এমন কায়দায় পরা, যেন হাঁটলেই বুক দুটো নাচতে থাকে। মামাতো বোন, নইলে অতনু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত। রুবি ঘরে এসেই আদেশের ভঙ্গিতে ডাকলো, জিমি, জিমি কাম হিয়ার—।'

জিমি খুব একটা বাধ্য বলে মনে হল না। রুবির ডাকে শুধু তাকাল. পরক্ষণেই সে তার শোঁকাশুকির মহৎ দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। থাকতে না পেরে অতনু বলল, 'তোমার জিমিকে ডাকো, কামড়ে টামড়ে দেবে বলে মনে হচ্ছে।'

সারা শরীর দুলিয়ে রুবি হাসল—যেন ভীষণ হাসির কথা বলে ফেলেছে অতনু। কুকুরটাকে নিজের কোলে তুলে নিতে নিতে বলল, 'দূর, জিমি কখনও কামড়ায় নাকি, বড়জোর জিভ দিয়ে একটু চেটে দিতে পারে। ও বড় ভাল।'

সবার কুকুরই তার কাছে বড় ভাল। কেউ কামড়ায় না, আঁচড়ায় না, শুধু গজরায়। কিন্তু কামড়ে দিলে রুবি তো 'সরি' বলেই

খালাস, বড় জোর তার আদরের জিমিকে 'নটি' বলে ঈষৎ গাল দেবে। এদিকে যাকে কামড়াবে তাকে তো চোদ্দবার তলপেট ফুঁড়তে হবে।

বড়মামার সঙ্গে কথা বলে ওরা যখন বেরিয়ে এল তখন এগারোটা। এ সময় কাউকে না খাইয়ে কেউ ছাড়ে না। অন্তত মধ্য-বিত্তরা ছাড়ে না। বড়মামারা এখন আর মধ্যবিত্ত নন। সুতরাং তাঁরা অনায়াসে ছেড়ে দিতে পারলেন। ব্যাপারটা অতনুর চাইতে মার কাছে বেশি খারাপ লাগার কথা। বোধহয় খারাপ লাগছিল তাই মা নিজেই বলল, 'দাদা-বৌদি খেয়ে যেতে বলেছিল আমি রাজী হলাম না।'

মাকে আশ্বস্ত করার জন্যে অতনু বলল, 'ভালই করেছ।'

মা বলল 'দাদা বলল একদিন আমাদের বাড়ি যাবে। যাহোক একটা ব্যবস্থা করে দেবে।'

অতনু মার হাত ধরে রাস্তা পার করাতে করাতে বলল 'কবে যাবে?'

মা বলল 'কিছু একটা খোঁজ পেলেই যাবে। দাদা আমাকে কথা দিয়েছে।'

বড়মামা সেই কথা রেখেছেন। দিন কুড়ি বাদেই একদিন অফিস ফেরত এসে উপস্থিত হলেন অতনুদের বাড়িতে। হঠাৎ আলো নিভে যাওয়ায় মা তখন হ্যারিকেন ধরাতে ব্যস্ত। বড়দার ডাকে হ্যারিকেন হাতে ছুটে এল মা। বড়মামা এসে বেতের চেয়ারে বসলেন। আমাদের নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বড়মামাই মোটামুটি বড়লোক। অতএব এবাড়িতে তাঁর আদর-যত্ন আলাদা। দাদার চাকরীর খবর এসেছে শুনে শান্তাও পাখা হাতে ছুটে এল। বড়-মামাকে হাওয়া করতে। বাবা ছুটলেন মিষ্টির দোকানে। মুহূর্তের মধ্যেই জনতা ধরিয়ে মা চা বানালেন আর শান্তা বড় প্লেটে মিষ্টি সাজাতে আরম্ভ করল। বড়দার সামনে প্লেটটা এগিয়ে দিতে দিতে মা বলল, 'অফিস থেকে সোজা এলি, এটুকু খেয়ে নে।'

বড়মামা আপত্তি করার ভঙ্গিতে বললেন, 'তাই বলে এত সব খাব কেমন করে। আমার আবার সুগারের দোষ দেখা দিয়েছে। মিষ্টি খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি। চা-এ চিনি খাই না।'

চায়ে চিনি না খেলেও চারখানা রাজভোগ বড়মামা অনায়াসেই খেয়ে ফেললেন। জল খেয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। অতনুরা সবাই বড়মামার মুখের দিকে তাকিয়ে। চা শেষ করতে করতে বড়মামা বললেন, "লোডশেডিং-এ তো তোদের বেজায় কষ্ট। তা, তোরা একটা ইনভারটার কিনে নিচ্ছিস না কেন?'

চায়ের কাপ টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতে রাখতে বড়মামা বললেন, 'যাক যে জন্যে আসা সেটা বলি। অতনুর একটা চাকরীর ব্যবস্থা মোটামুটি হয়েছে, এখন শ' চারেক টাকা পাবে। আমাদেরই এক ক্লায়েন্ট। তোদের লোকাল এম. পি.-র একটা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট নিয়ে এ্যাপলিকেশনের সঙ্গে এ্যাটাচ করে আগামী বুধবারের মধ্যে আমার অফিসে জমা দিয়ে আসতে হবে। তারপর যা করবার আমি করব। কিন্তু বুধবারের ওদিক হয় না যেন, আর ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটটা মাস্ট।'

বড়মামা চলে যেতেই বাড়িতে যেন উৎসব লেগে গেল। মা বলল, 'আমি নিজে গিয়ে বড়দাকে বলেছি বড়দা কি আমার কথা না রেখে পারে।'

শান্তা অতনুর কাছে এসে এমন ভাবে বায়না ধরল, যেন চাকরীটা সে পেয়েই গেছে। বলল, 'দাদা, মাইনে পেয়ে আমাকে একটা সাউথ ইণ্ডিয়ান সাড়ি কিনে দিতেই হবে। আমার কলেজের সবারই আছে।

অতনুর মাথায় তখন ঘুরছিল এম পির মুখ। অতনু বলল, 'আমাদের এম পি কেরে?'

শান্তা জবাব দিল, 'ঐ তো জগন্নাথ বড়াল?'

অতনু বুঝল, এম পিরা দিল্লীতে থাকে, তার নাগাল পাওয়া মুশকিল। তার চাইতে এম. এল. এ হলে ভাল হতো। কিন্তু

মামা শুধু এম. পি'র কথাই বলে গেছেন। কিন্তু জগন্নাথ বড়ালতো অতনুকে চেনেই না। তাহলে ?

বুদ্ধিটা শেষ পর্যন্ত বাতলে দিলেন বাবাই। লোকাল কমিটির সেক্রেটারী তুষার রায়কে ধরতে হবে। তুষারদার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে যেতে হবে জগাদার কাছে। পারটি অফিসে গিয়ে তুষারদাকে পাওয়া গেল। সব শুনে টুনে তুষারদা বললেন, 'ঠিক আছে বাড়িতে এসো, চিঠি লিখে দেব।'

সাবধানের মার নেই ভেবে অতনু তুষারদার বাড়িতে যাবার সময় গোপালকে সঙ্গে নিয়ে গেল। গোপাল তুষারদাদের দলের হয়ে মিছিলে টিছিলে যায়, বনধ ডাকলে দোকানপাট বন্ধ রাখতে হুমকি টুমকি দেয়। গোপালকে সঙ্গে দেখে তুষারদা আর বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। 'প্রিয় জগাদা' বলে পারটির প্যাডে একটা চিঠি লিখে দিলেন।

সেই চিঠি পকেটে নিয়ে অতনু এখন তেঁতুলতলা স্টপেজে নামল। 'দাদা' ডাকটা একালে বেশ চালু ব্যাপার। অতনু ঠিক জানে না, এই 'দাদা গিরি' টা কবে থেকে এমন চালু হয়েছে। আগেও কি এমন ছিল ? স্বাধীনতার আগে ? তখন কি কেউ বলত, সুভাষদা, জহরদা, কিংবা গান্ধীদা। সি. আর. দাশকে কি তার অনুগামীরা 'চিত্তদা' বলে ডাকতো ? কিংবা রাসবিহারী বসুকে 'রাসুদা'। অনুগামী অনুজের সংখ্যা বোধহয় এই প্রজন্মেই বেশি, আর সেই কারণেই এত 'দাদা-দাদা' ডাক। অতনু বড়রাস্তা থেকে বাঁ দিকে ঘুরল। এবার তিনখানা বাড়ির পরেই জগন্নাথ বড়ালের বাড়ি।

সদর দরজা তখনও বন্ধ। ছ'টা বেজে গেছে। রোদ ফুটেছে চারপাশে। এবার আস্তে আস্তে ভীড় বাড়বে। একটু ইতস্তত করে অতনু দরজার কড়া নাড়ল। শব্দটা উঠল এবং থেমে গেল, কিন্তু কেউ দরজা খুলল না। অতনু বাড়ির সামনে পায়চারি করতে থাকল। সময় যেন আর কাটতে চায় না। রাস্তায় লোক চলাচল বাড়তে আরম্ভ করেছে। অতনু আবার কড়া নাড়ল। একবার,

ছু'বার এবং তিনবার কড়া নাড়ার পর সদর দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। দরজা খুলে মুখ বাড়াল একজন। অতনুকে সামনে দেখে বিরক্ত মুখে জানতে চাইল, 'কাকে চাই ?'

অতনু লোকটার চেহারা দেখে ধরতে পারল না লোকটা কে ? হাতের দিকে নজর পড়তে দেখা গেল ছুহাতে গোবর মাখা। বোধহয় ঘুঁটে দিচ্ছিল। অতনু বলল, 'জগন্নাথদা আছেন ?'

লোকটা বিরক্ত মুখে জবাব দিল, 'আছেন। এখন ঘুমোচ্ছেন।'

অতনু বলল, 'আমার ভীষণ দরকার একটু দেখা করব।'

লোকটা ছড়া মুখস্থ বলার মতো বলে গেল, 'আটটার সময় আসবেন। তখন উনি অফিস ঘরে থাকবেন।'

দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছিল। অতনু তবুও বলল, 'তার আগে বুঝি হয়না ?'

লোকটা তার গোবরমাখা হাত ছুটো অতনুর মুখের সামনে নেড়ে বলল, 'না, তার আগে হবে না।'

অতনু আবার অপেক্ষা করতে লাগল। সামনের চায়ের দোকানে বসল, চা খেল। চা খেয়ে আবার পায়চারি করতে লাগল বাড়ির সামনে। কিন্তু আটটা বাজার আগেই একজন ছুজন করে বেশ কয়েকজন লোক জমে গেল বাড়ির সামনে। অতনু যখন ঘরে ঢুকতে পেল তখন ঘরের মধ্যে অনুজদের ভীড়ই বেশি। সবাই দাদা-দাদা ডাক ছাড়ছে। জগন্নাথ বড়াল অতনুকে খেয়ালই করল না, করার কথাও নয়। তিনি এত ব্যস্ত যে মুখ তোলার ফুরসৎই পাচ্ছেন না। অনেকক্ষণ পরে অতনু কথা বলবার সুযোগ পেল। জগন্নাথ বড়াল প্রথমে তুষার রায়ের চিঠিটা পড়লেন, তারপর অতনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, হয়ে যাবে। তুমি ভাই সন্ধ্যেবেলা পারটি অফিসে এসো, লিখে দেব।'

এরপর থেকেই জগন্নাথ বড়াল বনাম অতনুর লুকোচুরি খেলা আরম্ভ হয়ে গেল। সন্ধ্যের পর পারটি অফিসে গিয়ে শোনা গেল, জগাদা এই মাত্র চলে গেছেন। কোথায় গেছেন তা বলে যাননি।

বাড়ি গিয়ে জানা গেল বাড়ি ফেরেন নি। ফিরবেন কিনা বলা মুশকিল। মাঝে-মধ্যে কাজে আটকে যান বাড়ি ফেরা হয় না। রাইটার্সে গেলে ধরা যাবে।

রাইটার্সে গিয়ে খুঁজতে খবর মিলল জগন্নাথ বড়াল রাইটার্সে এসেছিলেন এবং সেখান থেকেই জিপে করে কোলাঘাট চলে গেছেন। আবার সকালে বাসে করে তেঁতুলতলায় গেল অতনু। আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখল জগাদার অফিস খুলছে না। দরজায় কড়া নাড়তেই প্রথম দিনের লোকটা এল। অতনুকে দেখে বলল, 'বাবু বাড়ি নেই, বর্ধমান গেছেন।'

'কবে ফিরবেন?'

লোকটা নিজের পাছা চুলকোতে চুলকোতে জবাব দিল, 'আজ বিকেলে ফেরার কথা। পারটি অফিসে সন্ধ্যেবেলা যাবেন।'

অতনু পারটি অফিসে সন্ধ্যে থেকে হত্যে দিয়ে পড়ে রইল। আস্তে আস্তে একজন দুজন করে প্রায় সব লোক চলে গেল। অবশেষে শেষ লোকটিও অফিসে তালা দিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে অতনু ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'জগাদা আজ আসবেন না?'

লোকটা দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে বলল, 'এলে এতক্ষণে এসে যেত। আজ আর আসবেন না।'

দেখতে দেখতে রবি সোম এবং মঙ্গলবারের সকালটা চলে গেল। আগামীকাল বেলা পাঁচটার মধ্যে বড়মামার অফিসে জগাদার দেওয়া ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটটা জমা দিতে না পারলে অতনুর সর্বনাশ হয়ে যাবে, অথচ জগাদাকে আজও ধরা গেল না। শুধু একবারই তার দেখা মিলেছিল তারপর থেকে আর কিছুতেই অতনু জগাদাকে ধরতে পারছে না। দুপুরবেলা কলকাতার পারটি অফিস অবশেষে রাইটার্স ঘুরে হতাশ হয়ে অতনু ফিরে এল নিজের স্টেশনে। স্টেশনের চত্বরে পাকা কামরাঙার মতো পড়ন্ত বিকেলের আলোর রঙ, কৃষ্ণচূড়া গাছের ধুলো মাখা পাতায় হাওয়ার উদ্দাম উল্লাস, অফিস ফেরৎ

মানুষদের ব্যস্ততা অথচ সব কিছুই অতনুর কাছে বিষাদ লাগছে। সারাদিন হাঁটাহাঁটিতে শরীর যত ক্লান্ত, মন তার চাইতেও বেশি ক্লান্ত হয়ে গেছে অতনুর। যেন নির্মম এক বিষণ্ণতা তার সারা শরীর আর মনটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে থেমে গেল অতনু। সে জানে বাড়ি গেলেই আশ্চর্য সেই সব প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হবে। মা বলবে 'দেখা পেলি ?' বাবা বলবেন 'আজ পেয়েছিস তো ?' শান্তা জানতে চাইবে 'দেখি দেখি কী লিখেছে ?' অথচ কোনটারই জবাব তার কাছ থেকে মিলবে না। মা বাবা এবং শান্তার সব কটি মুখ রোজই যেমন অন্ধকার হয়ে যায় আজও তেমন হবে। অতএব বাড়ি ফেরার কোন মুখ নেই।

অতনু উল্টো দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল। এলোমেলো হাঁটা, আসলে আজ আর তার কোথাও যাবার নেই। অথচ বাড়ি ফেরারও মুখ নেই। হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার দিকে চলে এল অতনু। এদিকটায় লোকজনের বসতি কম। রাস্তার পাশে জলাজমি আর ফাঁকা মাঠ। দূরে দূরে কয়েকটা ইঁটের ভাঁটি। গঙ্গা থেকে একটা চওড়া খাল চলে গেছে এখান দিয়ে। খালের ওপর নতুন ব্রীজ। গত বছর পূজোর আগে শান্তা আর ওর বন্ধু গোপাকে নিয়ে এদিকটায় বেড়াতে এসেছিল অতনু। তখনও এখানে কাঠের ব্রীজের কাজ চলছিল। গোপা বলেছিল, 'নতুন ব্রীজ হলে একদিন নিয়ে আসবেন আমাদের ?'

অতনু উত্তর দেবার আগেই শান্তা বলে দিয়েছিল, 'আমি বাপু তোদের সঙ্গে আসবো না। তোরা আসিস।'

গোপা মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করেছিল 'কেন ? আসবি না কেন ?'

শান্তা ভীষণ পাকা মেয়ে। ফিক ফিক করে হেসে বলেছিল, 'আমি এলে তোদের ডিসটার্ব হবে।'

শান্তার কথায় গোপা আলতো করে অতনুর হাতে চিমটি কেটে দিয়েছিল।

নতুন ব্রিজের সামনে দাঁড়িয়ে পুরনো কথা মনে পড়ল অতনুর।

শান্তার মুখ থেকে গোপাও জানে তার চাকরী ঠিক হয়ে আছে। শান্তার হাত দিয়ে চিরকুট পাঠিয়েছে গোপা, চাকরী হবে বলে এখনই দর্শন পাওয়া দুর্লভ হয়ে উঠেছে। চাকরী হয়ে গেলে মনে থাকবে তো?

অতনুর বুকের মধ্যে একটা অচেনা কষ্ট হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগল। তার মনে হল তার মাথার মধ্যে, হয়তো বা গোটা রক্তস্রোতে একটা নাগরদোলা ঘুরে চলেছে। মা, বাবা, শান্তা, গোপা, এরা সবাই তার শরীরের ভেতর থেকে কথা কয়ে উঠছে।

ব্রিজের মাঝামাঝি এসে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অতনু। সামনে থেকে একটা লালরঙের মোটর-বাইক ঝড়ের গতিতে ছুটে এসে আচমকা তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অতনু ঘাবড়ে গিয়েছিল। এবার দেখল মোটর বাইকে বসে একটা পা মাটিতে ঠেকিয়ে হাসছে কানু ঘোষ, অর্থাৎ কানাই ঘোষ। কানাই এখন এ তল্লাটের রাজা। ওকে দেখলে নাকি থানার ওসি পর্যন্ত সেলাম করে, বাবু, বাছা, বলে আপ্যায়ন জানায়। অতনু জানতো ব্যাঙ্কে ডাকাতি করতে গিয়ে নাকি কোথায় মারদাঙ্গা বাধিয়ে জেলে গিয়েছিল। জেল থেকে কবে ফিরল কে জানে। স্কুলে পড়ার সময় কানাই ছিল অতনুর ক্লাস মেট। ক্লাস ফাইভ থেকে টেন পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছে ওরা, তারপর আর কানাইকে পড়তে হয়নি। কানাই স্কুল ছেড়ে মারদাঙ্গায় ভিড়ে গেছে। আর মারদাঙ্গায় নাম করার পর কানাইকে ভিড়িয়ে নেওয়া হয়েছে পার্টিতে। এই সব করেই কানাই দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। অতনুকে ঘাবড়ে যেতে দেখে কানাই বলল, 'কী রে ভয় পেয়েছিস নাকি?'

অতনু একটু হাসল। বলল, 'পাবো না, এমন আচমকা এসে দাঁড়ালি, ভাবলাম বুঝি চাপা দিয়ে দিবি।

কানাই হাসতে হাসতে বলল, 'দূর শালা, চাপা দিতে হলে তুই কেন, কত লোক রয়েছে। তা এদিকে কোথায় যাচ্ছিস।'

অতনু বলল, 'এই এমনি ঘুরছিলাম।'

কানাই চোখ কুঁচকে অতনুকে দেখল। বলল, 'কেসটা কী? তোর চেহারাটা দেখে মনে হচ্ছে কিছু কেস আছে।'

অতনু ইতস্তত করছিল। কানাই বাইক থেকে নেমে ওর পিঠে চাপড় দিয়ে বলল, 'কী হয়েছে শালা, বলবি তো।'

অতনু রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বলল, 'বাড়ির অবস্থাতো জানিস। একটা চাকরী না পেলে খুব মুশকিল। বড়মামা একটা চাকরীর ব্যবস্থা করেছে কিন্তু—

অতনু থেমে গেল। কানাই সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'কিন্তু কী?'

অতনু বলল, 'কিন্তু চাকরীটার জন্যে আমাদের এম. পি জগন্নাথ বড়ালের একটা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট লাগবে। জগন্নাথদা বললেন দেবেন, কিন্তু তারপর থেকে তাকে আর ধরতেই পারছি না। সব জায়গায় খোঁজ করে করে এখন আশা ছেড়ে দিয়েছি।'

সিগারেট টেনে কানাই বলল, 'ওই সার্টিফিকেট কবে দরকার?'

অতনু হতাশ গলায় উত্তর দিল, 'কাল ছুটোয় বড়মামার অফিসে পৌঁছে দিতে হবে, নইলে চাকরীটা পাবো না।'

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কানাই বাইকে চেপে বসল। বলল, 'পেছনে ওঠ।'

অতনু পিছনে উঠতেই বাইক চালিয়ে দিল কানাই। ঝড়ের গতিতে বাইক চলল বড় রাস্তা ধরে। অতনু জানে না কানাই তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে। কানাইয়ের বাইক এসে থামল মদের দোকানের সামনে। কানাই নেমে গেল। অতনু দেখল কানাই দোকানের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। বড় রাস্তা দিয়ে বাস চলে যাচ্ছে। অতনু ভেতরে ভেতরে ঘামতে আরম্ভ করল। এসময় চলন্ত বাস থেকে কিংবা পথ চলতি কোন চেনা মানুষ যদি অতনুকে মদের দোকানের সামনে দেখতে পায় তাহলে সে কি ভাববে? কথাটা বাবার কানে গেলে বাবা কী বলবেন। অতনু ভেতরে ভেতরে কাঁপতে লাগল।

কানাই ফিরে এল বীয়ারের বোতল নিয়ে। দাঁত দিয়ে বোতলের ছিপিটা খুলে নিয়ে বাইকে উঠে বসল। মুখ থেকে

ছিপিটা ফু করে শূন্যে ফেলে দিয়ে বাইকে স্টার্ট দিল। একহাতে বাইক চালাচ্ছে অন্য হাতে বোতল থেকে বীয়ার খাচ্ছে কানাই, একবার বোতলটা পেছনে দিয়ে বলল, 'খাবি নাকি একটু।'

অতনু মাথা নেড়ে জানাল, 'না-না, আমি খাই না, তুই খা।

কানাই নিমেষের মধ্যে বোতলটা শেষ করে চলন্ত বাইকের ওপর থেকেই সেটাকে শূণ্যে ছুঁড়ে দিল। বোতলটা উড়ে গিয়ে শব্দ করে রাস্তার ওপর পড়ে ফেটে গেল। অতনু জিজ্ঞেস করল, "মর কোথায় যাচ্ছি কানাই?'

কানাই বাইকের স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকে, ঢুকতে বলল, 'তোর ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট আনতে! জগাদ কোথায় পাওয়া যায় সেটা আমি জানি।'

বাইকটা এসে থমাল একটা উঠোনের মধ্যে। উঠোনটাকে ঘি চারপাশে ঘর। কানাই অতনুর হাতটা ধরে বলল, 'আয়।' কানাইকে যেন নিজেরই ঘর বাড়ি এমনই স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে কানাই সিঁ দিয়ে দোতালায় উঠে গেল। দোতালার বারান্দার পর কয়েকটা ঘর। খোঁপায় ফুল গুঁজে থলথলে চেহারার একজন মহিলা কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে গেল। কানাই ঘরগুলো পেরিয়ে পেছনের দিকে এল। এখানে ছাদের পাশে আরো একখানা ঘর। বন্ধ দরজার গায়ে ধাক্কা দিল কানাই। দরজা খুলে দিয়ে সামনে দাঁড়াল কা মত একটি মেয়ে, তার মুখে বসন্তের দাগ। মেয়েটি দাঁড়া- সঙ্গে সঙ্গে তার পেছনে এসে দাঁড়ালেন একজন প্রৌঢ়া। চোখ দু গোলগোল, মাথায় চুল কমে গিয়ে টাক দেখা দিয়েছে। মুখ ভ করে পান চিবুচ্ছিলেন। কানাইকে দেখে বিগলিত হবার মে হাসলেন। অবিরত পান দোক্তা খাওয়ায় দাঁতগুলো তেঁতুল বি মতো কালো।

কানাই ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'বাবু এসেছে?'

প্রৌঢ়া সেই বিগলিত ভঙ্গিতে বললেন, 'এয়েছে বাবা, এবার।

ুরো তিন হপ্তা বাদে এলো। কাজের মানুষ এখানে এলে তবু কটু বিশ্রাম হয়, সেবা যত্ন পায়।'

কানাই কালোপানা মেয়েটার পাশ কাটিয়ে ঘরের মধ্যে এল। সামনে আরও একটা দরজা। কানাই ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল।

ভূত দেখলেও বুঝি অতনু এতখানি চমকাতো না। ঘরের মধ্যে সাবেক আমলের একখানা খাট। খাটের ওপর খালিগায়ে লুঙ্গিপরে শোয়া হয়ে আছেন মাননীয় জগন্নাথ বড়াল, তার হাতে মদের গ্লাস। মাথার চুল আলুথালু। আর শুধুমাত্র ব্রা পরে, চুলে ফুলের মালা ঝুলিয়ে একজন যুবতী জগন্নাথ বড়ালের বুকের কাছে উপটি মেরে শুয়ে আছে।

কানাইকে আচমকা ঘরে ঢুকতে দেখেই মেয়েটি উঠে বসল। জগন্নাথ বড়াল কানাইয়ের পেছনে দাঁড়ানো অতনুকে দেখতে পেয়ে বিরক্ত গলায় বলে উঠলেন, 'এখানে কী চাই?'

কানাই একটা টুল টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলল, 'ওকে আমিই নিয়ে এলাম। ওর জন্যে কোন ভাবনা নেই, ও খুব রিলায়েবল।'

জগন্নাথ বড়াল বিরক্ত গলায় আবার বললেন, 'কিন্তু এখানে কেন? এখানে কী চাই?'

অতনু হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেলল, 'একটা ক্যারেকটার সার্টিফিকেট স্যার।'

কানাই খাটের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিতে নিতে বলল, 'বেচারী কদ্দিন থেকে ঘুরছে। কাল দশটার মধ্যে জমা দিতে হবে। আপনি এখনই করে দিন—এজন্যেই ওকে ধরে নিয়ে এলাম।'

জগন্নাথ বড়াল চাপা গলায় বললেন, 'তাই বলে এখানে?'

কানাইও চাপা গলায় বলল, ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। বলছি না অতনু রিলায়েবল, আমার জিগরী দোস্ত! নিন নিন ছেড়ে দিন।'

জগন্নাথ বড়াল ইশারা করতেই ব্রা পরা সেই মেয়েটি এম, পি, সাহেবের ব্যাগটা নিয়ে এল। ব্যাগের ভেতর থেকে প্যাড বেরুল। বড়াল সাহেব সেই বাঁধা গতে অতনুর ক্যারেকটার সার্টিফিকেট লিখতে লাগলেন। দিস ইজ টু সার্টিফাই দ্যাট মিস্টার অতনু মজুমদার সন অফ মিস্টার গোবিন্দ মজুমদার অফ চাঁপাতলা ইজ নোন টু মি।

হি কামস অফ এ রেসপেকটেবল ফ্যামিলী। হি ইজ এ্যানর-জিটিক ইয়ংম্যান অফ অ্যাকটিভ হ্যাবিটস। অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নোন হি বেয়ারস এ গুড মরাল ক্যারেকটার। আই উইস হিম সাকসেস ইন লাইফ।

কানাই ব্যাগের ভেতর হাত ঢুকিয়ে রাবার স্ট্যাম্পটা টেনে আনল। কিন্তু প্যাডে কালি নেই। শুকনো খটখটে। কানু দমবার পাত্র নয়। সে জগাদার হুইস্কির গ্লাস থেকে দু'ফোটা হুইস্কি ঢালল ইঙ্ক প্যাডে। হুইস্কিতে ভিজিয়ে নিয়ে স্ট্যাম্পটা প্যাডে চেপে ধরল। তারপর জগন্নাথ বড়ালের সই-এর নিচে স্ট্যাম্পটা মেরে সার্টিফিকেটটা অতনুর দিকে বাড়িয়ে বলল, 'যা কাল সকালে গিয়ে মামার অফিসে জমা দিয়ে দে—এখন কেটে পড়।'

অতনু প্রায় ছুটতে ছুটতে গলিতে এল, গলি থেকে বড় রাস্তায়। সে তখনও বুঝতে পারছিল না, তার ভেতরে এখনও যে ব্যাপারটা চলছে সেটা কী? আনন্দ না অন্যকিছু।

এই সার্টিফিকেট নিয়ে এখন সে কী করবে? তার স্কুল শিক্ষক বাবার হাতে তুলে দিয়ে সে কি বলবে বাবাকে? কাগজটা থেকে বোধহয় এখনও হুইস্কির গন্ধ আসছে। চিঠিটা পকেটে রাখতে গিয়ে তার হাত থেমে গেল। চোখ ফেটে জল আসছে। বুকের ভেতর থমথম করছে একটা চাপা আক্রোশ।

ঝাপসা চোখে পথ হাঁটতে হাঁটতে সে এই প্রথম বুঝল, মানুষ শুধু দুঃখেই কাঁদে না—অন্যতর কোন বোধেও তার চোখে জল এসে যেতে পারে। কিন্তু অতনুর চোখে জল কেন?

চোয়াল শক্ত করে অতনু সামনের দিকে তাকাল।